ফোয়ারা

বঙ্গবাসী কলেজের প্রোফেসার

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন

এম্ এ প্রণীত।

"পরিহাসবিজল্পিতং সখে
পরমার্থেন ন গৃহ্যতাং বচঃ।"

তৃতীয় সংস্করণ (পরিবর্দ্ধিত)

মূল্য পাঁচ শিকা।

কলিকাতা

৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট্, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্‌এর

পুস্তকালয় হইতে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ও

১০৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্, স্বর্ণপ্রেসে

শ্রীকরুণাময় আচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

প্রথম সংস্করণ, ১০০০, মাঘ ১৩১৭

দ্বিতীয় সংস্করণ, ১০০০, ভাদ্র ১৩২৩

তৃতীয় সংস্করণ, ১০০০, পৌষ ১৩২৬

যাঁহার আর্য্যচরিত্রে
শিশুর সরলতা, মধুরতা ও প্রেমপ্রবণতা,
যুবার উদ্যম, উৎসাহ ও রসিকতা
এবং বৃদ্ধের জ্ঞান, ধীরতা ও সংযম
একত্র সম্মিলিত হইয়াছে;
যাঁহার মার্জ্জিতচিত্তে
প্রাচী ও প্রতীচীর অপূর্ব্ব সমাবেশ ঘটিয়াছে;
যাঁহার প্রতিভাপ্রভাবে
শুষ্ক বিজ্ঞান-দর্শন কাব্যের সরসতা লাভ করিয়া
বঙ্গসাহিত্যে একটি নূতন ধারার সৃষ্টি করিয়াছে;
এবং যাঁহার
লিপিকুশলতায় মুগ্ধ ও উৎসাহবাক্যে প্রণোদিত হইয়া
বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশার্থী হইতে সাহসী হইয়াছি,
সেই পরমশ্রদ্ধাভাজন, বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন
পবিত্রকুলসম্ভব ব্রাহ্মণোত্তম
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ
(প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ ষ্টুডেণ্ট্)
মহোদয়ের করকমলে
এই অকিঞ্চিৎকর গ্রন্থখানি
সাদরে উপহার দিলাম। ইতি—
মাঘ ১৩১৭

নিবেদন

বালুকাকঙ্করময় মরুভূমিতেও স্থানে স্থানে ফোয়ারা আছে। শিক্ষকের শুষ্কজীবনেও মাঝে মাঝে ভাবের ফোয়ারা খেলে। এই ‘ফোয়ারা’য় আধিব্যাধিশোকতাপাক্লিষ্ট সংসারপথিকের একদণ্ডের তরেও কি শ্রান্তিক্লান্তি দূর হইবে না?

সচরাচর দুইটি কারণে আমাদের দেশে পুস্তক প্রকাশিত হয়:—“সুকুমারমতি বালকবালিকাগণের শিক্ষাসৌকর্য্যার্থে’, অথবা ‘বন্ধুবর্গের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে।’ কিন্তু এই পুস্তকসম্বন্ধে উক্ত দুইটি কারণের যেটিই নির্দ্দেশ করিব সেইটিতেই সত্যের অপলাপ হইবে। প্রবন্ধগুলি কোন না কোন মাসিক পত্রে বা পত্রিকায় পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল; সেগুলি একত্রনিবদ্ধ দেখিলে লেখকের একটু মনস্তৃপ্তি হয়, এই কারণে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। এরূপ ক্ষণপ্রীতিকর রচনাবলি স্থায়ী সাহিত্যে স্থানলাভ করিবে এমন দুরাশা করি না। তবে প্রাণিজগতের ন্যায় সাহিত্যজগতেও অপত্যস্নেহ অন্ধ। তাহার বশবর্ত্তী হইয়া গ্রন্থ-প্রকাশে প্রবৃত্ত হইলাম। দোষগুণ-বিচারের ভার ‘ক্ষীরগ্রাহী নীরত্যাগী’ পাঠকসমাজের উপর।

‘মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা’র দাপটে পুস্তকপ্রকাশে অযথা বিলম্ব ঘটিল। যত্ন করিয়া প্রুফ দেখিয়াও বর্ণাশুদ্ধির হাত এড়াইতে পারি নাই। ইহাতে বর্ণমালার আর এক দফা নূতন অভিযোগের আমলে আসিতে না হয় ত বাঁচি। শুদ্ধিপত্রে যে অশুদ্ধির ‘জড়’ মরিবে সে আশাও নাই; হয় ত শুদ্ধিপত্রের আবার একটা বিশুদ্ধিপত্র যুড়িতে হইবে। এই

বিবেচনায় বাঙ্গালা সাহিত্যের সর্ব্বাংশই পাঠকের উপর ভ্রমশোধনের ভার দিয়াই নিশ্চিন্ত রহিলাম। কিমধিকমিতি—

কলিকাতা, মাঘ ১৩১৭ গ্রন্থকার

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

এবারে সমস্ত মুদ্রাকরপ্রমাদ সংশোধন করিতে সচেষ্ট হইয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে, যে 'ব্যাকরণ-বিভীষিকা'গুলি চোখে পড়িয়াছে সেগুলিও দূর করিয়াছি। তথাপি পুস্তকখানি যে সম্পূর্ণ ভ্রমশূন্য হইয়াছে, একথা সাহস করিয়া বলিতে পারি না।

এই সংস্করণে অন্যান্য অনেক পরিবর্জ্জন ও পরিবর্ত্তনও হইয়াছে। "দ্বিতীয় সংস্করণে টিপ্পনী" গুলি ত নূতন বটেই, তাহা ছাড়াও স্থানে স্থানে কিছু পরিবর্দ্ধন হইয়াছে। কয়েকটি প্রবন্ধের স্থানপরিবর্ত্তনও ঘটিয়াছে। আশা করি, পাঠকবর্গ পূর্ব্বের ন্যায় এবারেও পুস্তকখানিকে প্রীতির চক্ষে দেখিবেন। ইতি—

কলিকাতা, ভাদ্র ১৩২৩ গ্রন্থকার

তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

এই সংস্করণে সামান্য সামান্য পরিবর্ত্তন ছাড়া কয়েকটি নূতন চুটকী ও তিনটি নূতন প্রবন্ধ, 'সাহিত্যের নেশা' 'আলো' ও 'ব্যর্থ প্রয়াস' সংযোজিত হইয়াছে। এগুলি 'পাগলা ঝোরা' প্রকাশিত হইবার পর সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে এই পুস্তকে পুনর্মুদ্রিত হইল। ইতি—

কলিকাতা, পৌষ ১৩২৬ গ্রন্থকার

ফোয়ারা।
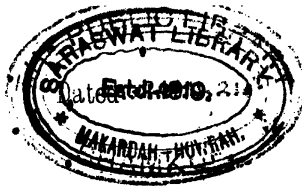
গরুর গাড়ী।

(সাহিত্য, কার্ত্তিক ১৩১১)

গ্রীষ্মের ছুটীতে দেশে আসিয়া দেখিলাম, আমাদের গ্রামের পাশ দিয়া রেলের রাস্তা প্রস্তুত হইতেছে, ছোট ছোট মালগাড়ী রেলের মালমশলা সাজসরঞ্জাম আনিয়া ফেলিতেছে। দেশের ইতরভদ্র স্ত্রীপুরুষ সকলেরই মনে উৎসাহ ও উল্লাস, বিদেশে যাতায়াতের সুবিধা হইবে, 'ছয় দিনে উত্তরিবে ছ' মাসের পথ!' অনেকে উৎসাহভরে আমাকে বলিয়া ফেলিলেন, "এ বছর যা' কষ্ট পেলে, আস্‌ছে বছর আর গরুর গাড়ীর কর্ম্মভোগ ভুগ্‌তে হ'বে না, একেবারে রেলগাড়ীতে আমাদের গ্রামের মাঠে এসে নাম্‌বে।"

কথাটায় আমার কিন্তু আশ্বাস না হইয়া কেমন একটা আপ্‌শোষ হইল; প্রাণটা কেমন ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। মনে হইল, হায়! বিলাতী সভ্যতার হিড়িকে আমাদের দেশের প্রাচীন প্রথাগুলি একে একে লোপ পাইতেছে; সহমরণ বহুবিবাহ উঠিয়াছে, অবরোধপ্রথা জাতিভেদপ্রথা একান্নবর্ত্তি-পরিবারপ্রথা যায় যায় হইয়াছে, আমাদের সনাতন চক্‌মকির

স্থান 'বিলাতী অগ্নি দেশলাইরূপী' দখল করিয়াছে, নবাবী আমলের অম্বুরী খাম্বিরা ছাড়িয়া আজ ভারতবাসী মার্কিনের বার্ডসাই ফুঁকিতেছে; আবার বুঝি বিধিবিড়ম্বনায় আমাদের সনাতন ঋষিগণের উদ্ভাবিত অপূর্ব্ব যান গরুর গাড়ীও বিলয় প্রাপ্ত হয়!

বাস্তবিকপক্ষে, গরুর গাড়ী যেন আমাদের ভারতের নিতান্তই অন্তরঙ্গ, 'আত্মীয় হ'তে পরমাত্মীয়'। আমাদের শাস্ত্রে বলে, 'যাদৃশী দেবতা তস্যাস্তাদৃগ্ ভূষণবাহনম্'। কথাটা বড় পাকা। প্রকাণ্ডকায় মন্থরগতি গম্ভীরবেদী হস্তী, মাংসপিণ্ড স্থূলোদর জড়ভরত জমীদারশ্রেণীর উপযুক্ত বাহন। নরস্কন্ধবাহিত আবৃতদ্বার শিবিকা, সুভগপুরুষহৃদিবাসিনী ব্রীড়া-সঙ্কুচিতা অবগুণ্ঠনবতী কুলনারীর উপযুক্ত বাহন। কঙ্কালসার অশ্বিনী-কুমারযুগল-সংযোজিত কেরাঞ্চী গাড়ী, কলিকাতার কর্ম্মক্লিষ্ট কৃশকায় কেরাণীকুলের উপযুক্ত বাহন। অল্পপরিসর কর্ণজ্বালাকরধ্বনি-সঙ্কুল ধাক্কাকারী একাগাড়ী, কষ্টসহিষ্ণু স্বল্পে সন্তুষ্ট 'খোট্টা'-জাতির উপযুক্ত বাহন। অবিরতঘূর্ণিতনেমি দ্বিচক্রযান, আত্মনির্ভরক্ষম 'হস্তপাদাদিসংযুক্ত' উষ্ণশোণিত নব্যসম্প্রদায়ের উপযুক্ত বাহন। রেলগাড়ী, ট্র্যামগাড়ী, বাষ্পের জোরে, তাড়িতের বলে, প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে, বায়ুবেগে ছুটে; এ সকল যান, প্রাকৃতিক শক্তিপুঞ্জের উপর প্রভুত্বপ্রয়াসী অবিশ্রান্তকর্ম্মা ধরা-বিদ্রাবকারী তামসিক ইউরোপীয় জাতির উপযুক্ত বাহন। * তেজীয়ান্ ত্বরিতগতি তুরঙ্গম, বীরবিক্রান্ত যুদ্ধব্যবসায়ী রাজসিক রাজপুত জাতির উপযুক্ত বাহন; 'হঠধর্ম্মে হর্ষ অতি, হঠ হঠ সদা গতি, সদাগতি পরাভূত

---

* প্রবন্ধ-রচনাকালে মোটর গাড়ীর রেওয়াজ ছিল না। এক্ষণে ডাকাতীর ডঙ্কা বাজাইয়া মোটরের যে নামডাক হইয়াছে, তাহাতে উহার নাম উহ্য রাখাই উচিত।—(দ্বিতীয় সংস্করণের টিপ্পনী।)

তায়'। আর শমদমাদিগুণালঙ্কৃত সাত্ত্বিক ভারতীয় ব্রাহ্মণপ্রকৃতির উপযুক্ত বাহনই গোযান। যেন দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা 'গোব্রাহ্মণহিতায় চ' এই অপূর্ব্ব যান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। হিন্দুর আরাধ্য দেবদেব মহাদেব পরমযোগী কর্ম্মমুক্ত, বৃষভাসনে সমারূঢ়। 'শিব্যিবিদ্যা গরীয়সী'; ভক্ত দেবতার উপরও এক কাঠী চড়িয়াছেন। বৃষভপৃষ্ঠে বীরাসনে উপবিষ্ট হইয়া লগুড়দণ্ডে বারংবার বৃষভরাজকে তাড়না করিলে সমাধিভঙ্গের ভয় আছে, নির্ব্বিকার নিষ্ক্রিয় বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ হইবার পথে বিঘ্ন আছে। তাই বলীবর্দ্দযুগলের পশ্চাতে যষ্টিহস্ত সারথি ও অপূর্ব্ব বংশময় যান স্থাপিত করিয়া সাত্ত্বিক আরোহী দারুব্রহ্মের ন্যায় নিশ্চল, সাংখ্যের পুরুষের ন্যায় নির্লিপ্ত, যেন জগৎসংস্থিতিকারণ নারায়ণ ক্ষীরোদশয্যায় অনন্ত শয়নে কোটিকল্প ধরিয়া যোগনিদ্রায় বিভোর।

যতই চিন্তা করি, ততই দেখি, গরুর গাড়ী আমাদের জাতীয় প্রকৃতির সহিত বড় পরিষ্কাররূপে খাপ খায়। রেলগাড়ীর সব দিকেই আঁটাআঁটি বাঁধাবাঁধি। রেলগাড়ী চলিবে, তাহার জন্য রেল পাতিতে হইবে, রাস্তা তৈয়ার করিতে হইবে। সেই রেল হইতে রেখামাত্র বিচ্যুত হইলেই প্রাণসংশয়, রেলের উপর কোনও কিছু থাকিলে তখনই বোঝাই ট্রেন পড়িয়া চুরমার, রাস্তা বেমেরামত থাকিলে তৎক্ষণাৎ ট্রেনের গমনাগমন বন্ধ। তাহার পরে, রেলের গাড়ীর গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে, তাহাকে হুঁসিয়ার করিতে, তাহার জলকয়লা সরবরাহ করিতে, অসংখ্য লোক ও অবিরত বন্দোবস্তের দরকার। রেলগাড়ী নির্দ্দিষ্ট স্থানে নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য থামিবে, নির্দ্দিষ্ট পথে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যাইবে? কঠোর ব্যবস্থা, 'পদে পদে নিয়ম-অধীন'। ঠিক ইউরোপীয় সমাজের সভ্যতার অনুরূপ, সেই পোষাক-পরিচ্ছদের কড়াকড়ি, সেই কলার নেক্‌টাই বেল্‌ট্‌ গার্টারের কসাকসি, সেই ডিনারটেব্‌লের ড্রয়িংরুমের এটিকেটের আঁটাআঁটি, সেই

ধর্ম্মানুষ্ঠান ও সামাজিক রীতিনীতির বাঁধাবাঁধি, এক পাও স্বাধীনভাবে ইচ্ছাসুখে এগোবার যো নাই।

গরুর গাড়ী হিন্দুসমাজের ন্যায় উদার সার্ব্বভৌমিক; জলে জঙ্গলে, বনে বাদাড়ে, পথে অপথে, ইহার অপ্রতিহত গতি; 'হাট-বাট-ঘাট-মাঠ ফিরি ফিরিছে বহুদেশ'। ইহা বাঁধা নিয়মের, কড়া আইনের, নাগপাশে আবদ্ধ নহে। ধীরে ধীরে নীরবে নির্ব্বিকারে নির্ব্বিচারে ইহা সর্ব্বস্থানে গতায়াত করিতেছে। বিশাল বিরাট্ হিন্দুসমাজ যেমন 'গুঁড়িকাষ্ঠ নুড়িশিলা', ঘেঁটু, মনসা, শীতলা, ওলাবিবি, ষষ্ঠীবুড়ী, কলাবৌ হইতে নিগুর্ণ ব্রহ্ম পর্য্যন্ত ছোট বড় সকল দেবতা নির্ব্বিবাদে নির্ব্বিশেষে অঙ্কে স্থান দিয়া ধীর স্থির গতিতে ধ্রুব লক্ষ্য অভিমুখে চলিয়াছে, শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই, সেইরূপ গরুর গাড়ীও শ্যামল শস্যক্ষেত্রে, বালুকাময় নদী-পুলিনে, তুঙ্গ শৈলশিখরে, বন্ধুর পার্ব্বত্য পথে, গভীর খাঁতে, পঙ্কিল জলা-ভূমিতে, সমান প্রীতির সহিত ধীর সংযত গতিতে গন্তব্য পথে চলিয়াছে। সমাজ ও যান উভয়ই শান্তি ও প্রীতির লীলাস্থল। পক্ষান্তরে, ইউরোপীয় সমাজ বাষ্পীয় এঞ্জিনের ন্যায় রক্তনেত্রে উদ্দাম উন্মত্ত বেগে ছুটিয়াছে; আর অণুমাত্র লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলেই ধ্বংসমুখে উপনীত হইতেছে। কলুষিত প্রবৃত্তি, উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা, বিজাতীয় উৎসাহ, মর্ম্মবেদনাকর অতৃপ্তি, ইউরোপীয় প্রকৃতির ভালে কলঙ্কের কালী লেপিয়া দিতেছে, এঞ্জিনের কৃষ্ণাঙ্গার অবিশ্রান্ত ধূমোদ্গার করিয়া আকাশমণ্ডল কালিমাবৃত করিয়া দিতেছে। যান ও সমাজ উভয়েই অশান্তি ও অপ্রীতি স্পষ্ট প্রতীয়মান। তাই বলিতেছিলাম, গরুর গাড়ী শুদ্ধশীল সাত্ত্বিক ভারতীয় প্রকৃতির সুসদৃশ।

যাক্, ও নব অধ্যাত্মতত্ত্ব ছাড়িয়া দিয়া একবার রেলগাড়ী ও গরুর গাড়ীর সুবিধা-অসুবিধার কথাটা বিচার করি। রেলগাড়ীতে বারমাস

ত্রিশদিন সমান লোকের ভিড়। একটু পা ছড়াইয়া বসি, বা গা মেলিয়া শুই, তাহার যো নাই। গরুড়পক্ষীর মত হাঁটু উঁচু করিয়া বসিয়া আছি; হাঁটু নামাইলেই সহযাত্রীদের পেট্‌রার খোঁচায় কাপড় ছিঁড়িয়া বা গা ছড়িয়া যাইবে। আশে পাশে গাদা-করা বস্তা, সম্মুখে কয়েক জন 'দেশওয়ালী' দাঁড়াইয়া আছে, শ্বাসরোধের উপক্রম হইতেছে। বেঞ্চিতে পিছনে ছাতা লাঠি ছিঁচকে প্রভৃতি শাণিত অস্ত্র, একটু পিছাইলেই 'শূলে' যাইবার আশঙ্কা। ডাহিনে 'চাচাসাহেব' থাকিয়া থাকিয়া জৃম্ভণ করিতেছেন, পিঁয়াজ-রশুনের গন্ধে নাক জ্বলিয়া যাইতেছে। বামে মাড়োয়ারী মহাজনের কাঁইমাই চীৎকারে কাণ ঝালাপালা হইতেছে। বায়ুবেগে কয়লার গুঁড়া উড়িয়া আসিয়া চোখে পড়িতেছে। কাঠের বেঞ্চের কোমল পরশে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠিতেছে, অথবা শতরঞ্জি-মোড়া গদীর কেল্লা হইতে ছারপোকাকুল অঙ্গে শেল হানিতেছে। যদি বা একটু তন্দ্রা আসিল, অমনই কাঠের দেওয়ালে মাথা ঠুকিয়া চৈতন্যলাভ হইতেছে, অথবা সাম্‌নে ঝুঁকিয়া পড়িবামাত্র 'চাচাসাহেবে'র কোমলামন্ত্রণে কুলিজা ঠাণ্ডা হইতেছে! কোনও কোনও গাড়ীতে নিদ্রার সুবিধার জন্য ঝুলান বেঞ্চি আছে, কিন্তু উঠিতে নামিতে মাথাফাটার ভয় বিলক্ষণ আছে, অসহিষ্ণু সহযাত্রিবর্গের উত্তমাঙ্গে পাদুকাসঞ্চারের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, জীব-নাষ্টিক না জানিলে উঠানামা অসাধ্য। ইহার উপর আবার ষ্টেশনে ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে যাত্রীদের উঠানামার ভিড়, পেট্‌রা টানাটানির হিড়িক; নবাগত যাত্রী তাড়াতাড়িতে গায়ের উপর দিয়া জুতা চালাইলেন, মাথার উপর পেট্‌রা নামাইলেন; এ সব তো ফাউ, বোঝার উপর শাক আঁটিটা। যতক্ষণ থাকিব, নবদ্বারনিরুদ্ধবৃত্তি হইয়া থাকিতে হইবে, স্থান ছাড়িবার সাহস নাই, পাছে বেদখল হই, ষ্টেশনে নামিবার অবসর নাই, পাছে গাড়ী ছাড়িয়া দেয়, আমাকে ফেলিয়া যায়, 'সদা মনে হারাই হারাই'।

গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়াও স্বস্তি নাই, নামিবার সময় অসাবধানতার জন্য সহযাত্রীদের ভ্রূকুটি, তাঁহাদের নিকট সবিনয় (apology) ক্ষমাপ্রার্থনা, মুটে ডাকাডাকি, পেট্‌রা বাক্স নামাইবার তাড়াহুড়া, সেই উপলক্ষে সহযাত্রী মহাশয়দিগের নিকট আর এক প্রস্থ ক্ষমাপ্রার্থনা। গাড়ী হইতে নামিয়াই অর্দ্ধাঙ্গর সম্পত্তি নামাইবার জন্য মেয়েকামরায় ছুটাছুটি, অবগুণ্ঠিতাদের ভিতর হইতে নিজের মাল সনাক্ত করা, এবং পরিশেষে রোরুদ্যমান শিশুকে চুপ করাইতে করাইতে ক্যাশবাক্সধারিণী অর্দ্ধাঙ্গিনীকে খালাস করা। চকিতের মধ্যে এই কায সম্পন্ন করিতে হইবে। নতুবা দাম্পত্য-বন্ধনে চিরবিচ্ছেদ!

আর গরুর গাড়ী? 'হেথা সুবিমল শান্তি অনন্ত বিশ্রাম'। লোকের ভিড় নাই, কোনও হাঙ্গামা নাই, কাহারও সহিত সঙ্ঘর্ষ হইবার আশঙ্কা নাই। 'I am monarch of all I survey, My right there is none to dispute'; পরমুখপ্রেক্ষী হইয়া ব্যক্তিসাধারণের সুবিধার জন্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিতে হইবে না। পুরু বিচালীর উপর তোষোক ও চাদর পাতিয়া তোফা লম্বা হইয়া গা-পা ছড়াইয়া দিয়া পড়িয়া আছি। উঠিলে মাথা ঘুরিবে, বসিলে বমনোদ্রেক হইবে, দাঁড়াইলে পতন অবশ্যম্ভাবী, এ স্থলে 'শয়নে পদ্মনাভ' ভিন্ন গত্যন্তর নাই। সূত্রকার ভবিষ্যৎ অভিধানে লিখিবেন, 'যে যানে চড়িলে শয়ন করিয়া থাকা অনিবার্য্য, তাহারই নাম গোযান'। পেট্‌রা বাক্স সব গাড়ীর পিছনে, যানের ভারকেন্দ্র ঠিক রাখিতেছে। তাহার উপর পা তুলিয়া দিয়া শরীরের ভার লঘু করিতেছি। গাড়ীর মন্থরগতিতে ঈষদান্দোলিত চ্যাঙ্গারী মৃদু বায়ুহিল্লোল তুলিয়া টানাপাখার কায করিতেছে। বামপাশে তেলের চোঙ্গা অবিরাম এধার ওধার দুলিয়া পেণ্ডুলমের ন্যায় সময় নিরূপণ করিতেছে। ডাহিনে ছইয়ে গোঁজা কাস্তে Feudal castleএর

ভিত্তিলম্বিত যুদ্ধাস্ত্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে। উপরে বিচিত্র বাকারী-নির্ম্মিত ছই চন্দ্রালোকে অট্টালিকার কড়িবরগার ভ্রান্তি জন্মাইয়া দিতেছে। নীচে ঝুলান ছালাবন্দী থালা-ঘটী-বাটি দুন্দুভিনিনাদ করিতে করিতে চলিয়াছে। গাড়ীর মৃদুমন্থর গতি ও তজ্জনিত মৃদুমন্দ শব্দ, 'শ্রোণীভারাদলসগমনা' নূপুরচরণা বরাঙ্গনার কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। মুহুর্মুহুঃ আন্দোলিত কর্দ্দমগোময়লিপ্ত গোপুচ্ছ কপোলদেশে হরিচন্দনের ছিটা দিতেছে। গাড়োয়ানরূপী সচ্চিদানন্দ হুঙ্কাররবে প্রণব উচ্চারণ করিতেছেন, আর আমি 'বাঁশের দোলাতে উঠে' 'শেষের সে দিন ভয়ঙ্করে'র কথা ভাবিয়া পরমার্থ-তত্ত্বে মগ্ন হইয়া পড়িয়াছি। কি ভূমা আনন্দ, কি বিমল শান্তি, কি প্রগাঢ় যোগাভ্যাস! স্থানে অস্থানে আপন এক্তিয়ারমত যেখানে সেখানে যতক্ষণের জন্য ইচ্ছা থামাইতে পারি, যেখানে সেখানে যতক্ষণের জন্য ইচ্ছা চালাইতে পারি। সাধ পুরিয়া প্রাণ ভরিয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে চলিয়াছি; রেলগাড়ীর ন্যায় নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া দর্শন ও উপভোগের বিঘ্ন জন্মাইতেছে না; 'যথাবিধো মে মনসোঽভিলাষঃ প্রবর্ত্ততে পশ্য তথা বিমানম্।' এ যেন ঠিক মনোরথগতি পুষ্পকরথ।

আর যদি এই শকটে যুগলমূর্ত্তিতে বিরাজ কর, তবে ত সে মণি-কাঞ্চনযোগ। স্থানের পরিসর, শরীরের অবস্থান ও যানের গতি, এই তিনের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে এ স্থলে অনন্ত অবিচ্ছিন্ন মিলন অবশ্যম্ভাবী, মান অভিমান বিরাগ বিরহের অবসরমাত্র নাই। ভীরুস্বভাবা সীতাদেবী দণ্ডকারণ্যে মেঘগর্জ্জন শুনিয়া রামচন্দ্রকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, সেই 'কম্পোত্তরং ভীরু তবোপগূঢ়ম্', সেই 'নিবিড়বন্ধ পরিচয়' প্রেমিক রামচন্দ্র অনেক দিন ভুলিতে পারেন নাই। আমরা বাঙ্গালী, কাপুরুষ, মেঘগর্জ্জন শুনিলে আমরাই আগে আতঙ্কে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িব, তা'

প্রিয়াসুখস্পর্শ অনুভব করিব কি? কিন্তু গরুর গাড়ী যখন বন্ধুরভূমিতে উচ্চ হইতে নীচে হঠাৎ অবতরণ করে, তখন পতনভীতা ব্রীড়াশীলা কুলবধূ, কতক জড়জগতের গতিবিজ্ঞানের অমোঘ নিয়মে, আর কতক নারীহৃদয়ের সলজ্জ সশঙ্ক অনুরাগভরে পার্শ্বস্থিত পতিকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার মনে রামচন্দ্রের 'দণ্ডকারণ্যবাসপ্রিয়সহচরী'র কথা উদয় করাইয়া দেন; অবসরজ্ঞ পতিও পতননিবারণের জন্য অব্যর্থ উপায় অবলম্বন করেন। ধন্য রে গরুর গাড়ী, পবিত্র প্রণয়ের এমন মধুর রস তোমার প্রসাদেই বাঙ্গালী উপভোগ করিতে পারে!

এই প্রসঙ্গে, আমার একজন অভিন্নহৃদয় বাল্যবন্ধু তাঁহার অতীত জীবনের যে একটি সুখস্মৃতির পট উদঘাটন করিয়াছেন, এখানে তাহার উল্লেখ করিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। বন্ধুবর লিখিয়াছেন—

"নূতন চাকরীতে প্রবৃত্ত হইয়া 'সস্ত্রীক শকটারোহণে' প্রবাসযাত্রা করিয়াছি। জ্যোৎস্না-রাত্রিতে আহারাদির পর আমরা দু'জনে দুর্গা বলিয়া চড়িয়া পড়িলাম। গ্রাম্য পথ ধরিয়া কিছুদূর গিয়া গাড়ী বাঁধা রাস্তায় উঠিল। দুই ধারে অনন্তবিস্তৃত প্রান্তর। আকাশে চাঁদ সুষুপ্ত জগতে কৌমুদীধারা ঢালিতেছে। নিশার নিস্তব্ধ প্রকৃতি মনে স্বপ্নদৃশ্যের সঞ্চার করিতেছে; আধ ঘুম আধ জাগরণে দীর্ঘ পথ বাহিয়া, প্রশান্তমনে চলিয়াছি। অন্তরে বিমল শান্তি ও পরিপূর্ণ সুখের উৎস খেলিতেছে। ক্রমে পূর্ব্বদিক্ ফরসা হইল, তরুশাখায় পাখীরা প্রভাতী গাহিল, দেখিতে দেখিতে প্রাচীদিগ্‌বধূর 'ভালে বালার্ক-সিন্দূরফোঁটা' শোভা পাইল, আর দিবালোকে আলজ্জবদনা প্রিয়ার ঘোমটায় তাঁহার কপালের সিন্দূর-ফোঁটা ঢাকা পড়িল। স্নিগ্ধ প্রভাতবাত-সংস্পর্শে নিদ্রাকর্ষণ হইল। নিদ্রাভঙ্গে দেখিলাম, একটি নদী পার হইতেছি। নদীতীর হইতে গ্রাম্যসুন্দরীরা বামকক্ষে কলসী লইয়া দক্ষিণ করপল্লব আন্দোলিত

করিতে করিতে গ্রামের দিকে যাইতেছে, আর ঘরকন্নার সুখের দুঃখের কথা বলিতেছে; সরলপ্রকৃতি গ্রাম্যনারী, কোনও বিলাসচাঞ্চল্য নাই, কোনও হাবভাব নাই। মাঠে কৃষকেরা লাঙ্গল দিতেছে ও বলদের লাঙ্গুল মোচ্‌ড়াইতেছে, রাখালবালকেরা গরু চরাইতেছে ও মনের আনন্দে মেঠোসুরে গান ধরিয়াছে 'ওরে রামশশী, হ'বি বনবাসী, কে আমারে ডাক্‌বে মা ব'লে'। বড় মিঠে লাগিল। ক্রমে বেলা হইল, ক্ষুধাতৃষ্ণার বেশ উদ্রেক হইয়াছে, এমন সময় এক আড্ডায় পৌঁছিলাম। পথের ধারে অশ্বত্থগাছের ছায়ায় গাড়ী রাখিয়া একখানি দোকানঘরে ঢুকিলাম। দোকানী বাড়ীর ভিতরে একটী ঘর নিকাইয়া চুকাইয়া আমাদিগকে ছাড়িয়া দিল। আমি পুঁটুলি-বাঁধা চাল ডাল নুন লঙ্কা হলুদ খুলিতে লাগিলাম ও যে সব জিনিশের অভাব আছে, তাহা দোকানীকে সরবরাহ করিতে বলিলাম। এ দিকে গৃহিণী দোকানীর ছোট মেয়েটিকে সঙ্গে লইয়া পুকুরঘাটে স্নানে গেলেন ও আর্দ্রবস্ত্রে পূর্ণকুম্ভকক্ষে মঙ্গলময়ীবেশে আবির্ভূতা হইলেন। যথাসময়ে রন্ধন সম্পন্ন হইলে স্নানান্তে আহারে বসিলাম। কি সুন্দর রন্ধন, কি সুন্দর পরিবেষণ! গৃহে কতদিন গৃহিণী রন্ধন করিয়াছেন, কিন্তু সে অন্নব্যঞ্জন পাঁচমিশালি, কোন্‌টুকু তাঁহার স্পর্শে অমৃতায়মান, তাহা কেহ জানিতে দেয় নাই। আজ আর দ্বিধাসংশয় করিবার যো নাই। বুঝিলাম, নূতন সংসার পাতিয়া প্রবাসে ভালই কাটিবে। আর পরিবেষণকালে, নূতন গৃহিণীপনার আনন্দে ও গুরুজনের অসাক্ষাতেও সসঙ্কোচ লজ্জায় জড়াইয়া কি এক অপূর্ব্ব মুখশ্রী! 'ভয় নাই তবু আঁখি সতত চঞ্চল'। রৌদ্রের তেজ কমিলে আবার গাড়ী যুড়িল, দুই চারি ক্রোশ যাইতেই গোধূলি আসিল; পশ্চিম গগনে সূর্য্যদেব পাটে বসিলেন; একবার আকাশের লোহিতরাগ আর একবার প্রিয়ার লজ্জারুণ মুখশ্রী দেখিলাম, বুঝিলাম

না কোন্ শোভা অধিক মনোলোভা। রাত্রি এক প্রহর হইলে আবার এক আড্ডায় পৌঁছিয়া বিশ্রাম করিলাম, এবং শেষরাত্রে নূতন উদ্যমে যাত্রা করিলাম। সে রাত্রি আর রাঁধাবাড়া হইল না, এক চাষাবাড়ী হইতে খাঁটি দুধ লইয়া ক্ষুৎপিপাসার শান্তি করিলাম। পরদিন প্রদোষকালে প্রবাসস্থিত নূতন গৃহে পৌঁছিয়া সাদরে সংসার-সঙ্গিনীকে গৃহলক্ষ্মীর পদে বরণ করিলাম। সে সুখের স্মৃতি আজও গরুর গাড়ীর সঙ্গে বিজড়িত রহিয়াছে। কিন্তু রেলগাড়ীর এই বিরাম-বিশ্রামহীন সময়সংক্ষেপকারী বেগে সেই প্রাকৃতিক দৃশ্যের সৌন্দর্য্য, সেই পথের বিচিত্র সুখ দুঃখ আনন্দ আবেগ, সবই ভাসিয়া যাইবে। দেশভ্রমণের কবিত্বরস উঠিয়া যাইবে।" "The poetry of travelling is gone."

সুহৃদ্‌বরের ব্যক্তিগত সুখস্মৃতির কথা ছাড়িয়া দিয়া সাধারণভাবে দেখিতে গেলেও বুঝা যায়, গরুর গাড়ীর সঙ্গে যে কবিত্বরস বিজড়িত আছে, তাহা রেলগাড়ীতে নাই। রেলগাড়ীর কথা পড়িলেই টিকিটঘরে লোকের ভিড় ও পকেটকাটার কথা, মালপত্র লইয়া কুলীর হাঙ্গামা ও ওজনদারের কারচুপীর কথা, ট্রেনফেলের কথা, গলাধাক্কার কথা, গাড়ীতে গাড়ীতে ঠোকাঠুকির কথা, চলন্তট্রেনে চুরী ডাকাতী ও পাশবিক অত্যাচারের কথাই মনে পড়ে। ইহাতে কবিত্ব নাই, রস নাই, প্রেমপ্রীতির অবসর নাই; ইহার সার কবিত্ব—Iron horse, আয়স অশ্ব!

আর গরুর গাড়ী? গরুর গাড়ী প্রাচীন ভারতের সুদূর অতীতের সহিত বর্ত্তমানের কি মধুর বন্ধন, কি অখণ্ড সংযোগ, স্থাপন করে; ম্লেচ্ছ যবন, শক হূণ, মোগল পাঠান, ফরাসী ইংরেজ প্রভৃতি বিদেশী জাতি কর্ত্তৃক সংঘটিত রাষ্ট্রবিপ্লবের বাস্তব সত্য লুপ্ত করিয়া অতীতের

সহিত বর্ত্তমানের অবিচ্ছিন্ন ঐক্য স্মরণ করাইয়া দেয়। গরুর গাড়ীর নাম শুনিলেই স্মৃতিপটে ভারতের অতীতের কত বিচিত্র চিত্র ফুটিয়া উঠে।

ঐ দেখিতেছি, বর্দ্ধমানক-নামক বণিক্‌পুত্র দাক্ষিণাত্যে মহিলারোপ্য-নামিক নগর হইতে গোশকটে দ্রব্যসম্ভার সাজাইয়া, গৃহপালিত সঞ্জীবক ও নন্দক-নামক দুই বলদ যুড়িয়া বাণিজ্যার্থ মথুরায় যাত্রা করিয়াছেন। শকট মন্থরগতিতে স্নিগ্ধবায়ুসঞ্চালিত যমুনাকচ্ছ বাহিয়া চলিতেছে, আর বণিক্‌পুত্র শুইয়া শুইয়া পণ্যবিক্রয়লাভের স্বপ্ন দেখিতেছেন।

আবার কি দেখিতেছি? এ যে উজ্জয়িনীর রাজপথ। মানসপটে একে একে তিনটী দৃশ্য ফুটিয়া উঠিতেছে। এক দিকে দেখিতেছি, শর্ব্বিলক নামক ব্রাহ্মণতনয় প্রেমের মহিমায় বারাঙ্গনার ক্রীতদাসী মদনিকার 'বিনামূলে' নিষ্ক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন, এবং হর্ষগদগদচিত্তে প্রেমপ্রতিমাকে লইয়া গোযানে চড়িয়া সুখের জীবন আরম্ভ করিতেছেন।

অন্য দিকে দেখিতেছি, অকলঙ্কচরিত্রা বসন্তসেনা চারুদত্তে সমর্পিত-প্রাণা হইয়া গোযানে চড়িয়া চারুদত্তের উদ্দেশে অভিসারে যাইতেছেন, কিন্তু 'প্রবহণবিপর্য্যয়ে' দুষ্ট শকারের হস্তে পড়িয়া অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছেন।

ও দিকে আবার গোপালদারক আর্য্যক সিদ্ধপুরুষের ভবিষ্যদ্-বাণীতে সিংহাসনলাভ করিবেন এই আশঙ্কায়, রাজা পালক তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছেন; তিনি কারাগার হইতে পলায়নানন্তর 'বধূযানে' আরোহণ করিয়া আত্মসংগোপন করিতেছেন, এবং রাজপুরুষ চন্দনক ও দ্বিজ চারুদত্তের নিকট অভয়প্রার্থনা করিতেছেন।

এই দৃশ্যগুলি বিলীন হইতে না হইতেই মানসপটে এক পবিত্র দৃশ্য ফুটিয়া উঠিল। কৌণ্ডিন্যনামক মুনিসত্তম সদ্যঃপরিণীতা শীলানাম্নী সুশীলা ভার্য্যাকে লইয়া গোযানে চড়িয়া গৃহাভিমুখে যাইতেছেন। মধ্যাহ্নসময়ে

নদীপুলিনে ব্রতধারিণী বহু কুলনারী অনন্তের ডোর ধারণ করিয়া তাঁহার পূজা করিতেছেন, আর দেখিয়া বিমাতার নির্য্যাতন হইতে সদ্যোনির্ম্মুক্তা বালিকাবধূ স্বামীর সৌভাগ্যকামনায় ঐ ব্রত গ্রহণ করিতেছেন এবং ব্রতসিদ্ধি ও ভবিষ্য সুখের ঘরকন্নার স্বপ্ন দেখিতেছেন।

ও দিক্ হইতে নয়ন অপসারিত করিয়া দেখিতেছি, সম্মুখে বিরাট্ দৃশ্য। পুণ্যভূমি আর্য্যাবর্ত্তে বৈদিক ঋষিগণ অশেষভূতিলাভার্থ সোমযাগ করিতেছেন; রাজা 'সোম'কে গোযানে স্থাপন করিয়া ছদি (ছই) দ্বারা আবৃত করিয়া 'হবির্ধান-প্রবর্ত্তন' প্রক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছেন, এবং উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত ক্রমে স্নিগ্ধগম্ভীর-নির্ঘোষে ঋক্ উচ্চারণ করিতেছেন।

তাই বলিতেছিলাম, প্রাচীন ভারতের সহিত আধুনিক ভারতের, অতীতের সহিত বর্ত্তমানের, ঐক্যশৃঙ্খল এই গরুর গাড়ী। হিন্দুর ব্যবসায় বাণিজ্য, হিন্দুর রাজনীতি রাষ্ট্রবিপ্লব, হিন্দুর প্রমোদ প্রমদাপ্রীতি, হিন্দুর ব্রতাচার ধর্ম্মাচার, সকল প্রথার মধ্যেই এই গরুর গাড়ী পরিস্ফুটভাবে বিরাজ করিতেছে। আজ দৈববিড়ম্বনায় বিলাতী সভ্যতার কুহকে অন্ধ হইয়া আমরা সেই জাতীয় জীবনের চিরসহচর গরুর গাড়ীকে হারাইতে বসিয়াছি। হায় আর্য্যসন্তান!

* * * *

আর না। ঐ মাঠের ধারে রেলের রাস্তায় ট্রেনের বাঁশী বাজিল। শ্যামরায়ের বাঁশীতে একদিন ব্রজবালা কুলত্যাগ করিয়াছিল। ইংরাজ-রাজের এই বাঁশীতে গ্রাম্যসুন্দরীদের কি দশা হইবে, কে জানে?

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

তীর্থদর্শন

—:*:—

(বঙ্গদর্শন, ফাল্গুন ১৩১৩)

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্‌।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপো দানং নবধা কুললক্ষণম্‌॥

কুলীন পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে পরম্পরাগত এই শ্লোকটি বাল্যকালেই মুখে মুখে শিখিয়াছিলাম। পূর্ব্বপুরুষগণের কুলীনত্বের সঙ্গে সঙ্গেই কুলীনের লক্ষণগুলি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম, ইহাই বরাবর বিশ্বাস। তবে তীর্থদর্শনটা ঠিক সহজাত সংস্কারের কোঠায় পড়ে না,—ইহা পুরুষকার-সাপেক্ষ, এইটা বুঝিয়া নিজের কুলীনত্ব পাকা করিবার অভিপ্রায়ে—'to make assurance double sure'—তীর্থযাত্রা করা মনঃস্থ করিলাম এবং বিষয়কর্ম্ম হইতে কিয়ৎকালের জন্য অবসর পাইয়া শারদীয়া পূজার ছুটীতে সেই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে উদ্‌যোগী হইলাম। সঙ্কল্প—পবিত্র বারাণসীধামে প্রয়াণ। এই তীর্থযাত্রার কিঞ্চিৎ বিবরণ দিলে বোধ হয় পাঠকগণের বিশেষ অপ্রীতিকর হইবে না। তীর্থ করিয়া নিজমুখে তাহার শ্লাঘা করিতে নাই, এইরূপ একটা শিষ্টাচারের কথা শুনা যায় বটে। কিন্তু এখনকার দিনে নিজের ঢাক নিজে না পিটাইলে সে ভার আর কে লইবে, এই ভাবিয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়ম ভঙ্গ করিতে বাধ্য হইলাম।

* * * * * *

এককালে খ্রীষ্টীয়জগতে বিশ্বাস ছিল যে, তীর্থদর্শনে পুণ্যসঞ্চয় হয় ও আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটে। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া সহস্র সহস্র লোক নানা ক্লেশ সহ্য করিয়া পরিত্রাতা যীশুর জন্মস্থান, লীলাক্ষেত্র ও সমাধিস্তম্ভ দর্শন করিয়া আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিয়াছেন, ইউরোপের তামসযুগের (Dark Ages) ইতিহাসে এরূপ উদাহরণ বিরল নহে। বিখ্যাত ধর্ম্মযুদ্ধ Crusade-গুলি এই ধর্ম্মপ্রবৃত্তির তাড়নাতেই ঘটিয়াছিল, ইহা অবশ্য ইতিহাসজ্ঞ পাঠকের অবিদিত নহে। এখন খ্রীষ্টীয় প্রকৃতি ও আদর্শ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; ইউরোপীয় জগতে আর বড় কেহ তীর্থ-ভ্রমণের উপকারিতা উপলব্ধি করেন না। ইউরোপ এখন সভ্য! আর ইউরোপের নিকট শিক্ষাদীক্ষা লাভ করিয়া ইউরোপের মন্ত্রশিষ্য উচ্চ-শিক্ষাভিমানী আমরাই বা কি বলিয়া এই বিংশশতাব্দীতে ঘোরতর কুসংস্কারের প্রশ্রয় দিব, এ ভাবনাটা যে একবারও মনে আসে নাই, ইহা বলিলে সত্যের মর্য্যাদারক্ষা হইবে না। অতএব এস্থলে একটা কৈফিয়ত আবশ্যক হইয়া পড়িল।

আপাততঃ যাত্রা বন্ধ করিয়া নজির খুঁজিতে বসিলাম। অল্পে অল্পে মনে পড়িল, একখানি ইংরেজী কেতাবে এইরূপ একটা কথা পড়িয়াছিলাম, ম্যারাথন-থার্ম্মপলীর বীরমাটীতে দাঁড়াইয়া যে পাষণ্ডের মন বীররসে আপ্লুত হয় না, সে প্রকৃতই কৃপার পাত্র। ঠিক কথা। এই কথাটাই ত একটু বদ্‌লাইয়া বেশ বলা চলে,—তীর্থক্ষেত্রের স্থানমাহাত্ম্যে, সভ্যভাষায় বলিতে গেলে genius loci এর প্রভাবে, মনে ধর্ম্মভাবের সজীবতা সঞ্চারিত হয়। তখন বুঝিলাম, তীর্থযাত্রাটা ঘোরতর কুসংস্কার নহে, pure reason এর কষ্টিপাথরে কষিলেও ইহার মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ থাকে। এতক্ষণে মনের বোঝা নামিল, (conscience) হিতাহিত-জ্ঞানের মৃদুভর্ৎসনা বন্ধ হইল, Rationalist এর চাপাহাসি ও নাসিকা-

কুঞ্চনের ভয় থাকিল না। এইবার হাঁক ছাড়িয়া যাত্রা করি। বোম্বাই-মেল ছাড়িতে আর বড় বিলম্ব নাই।

* * * * * * *

আধুনিক বিজ্ঞান ভৌতিকশক্তির প্রভাবে দেশকাল লোপ করিতে বসিয়াছে। বাষ্পীয় যান, বৈদ্যুতিক তার, জগতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। ইহার ফলে সহস্র সুবিধা ঘটিয়াছে, স্বীকার করি। কিন্তু সেটা যে পূরা লাভ, তাহা ঠিক হলপ করিয়া বলিতে পারি না। রেলের বাবুরা 'অনুগ্রহ-বিদায়' ও ফ্রী-পাশ্ পাইয়া দশাহের মধ্যে বৃদ্ধা মাতা বা পিসিমাকে লইয়া গয়ায় পিণ্ডদান করিয়া আসিতেছেন; উকীল মুন্‌সেফ প্রভৃতি পদস্থ ব্যক্তিরা ৺ পূজার দীর্ঘ অবকাশে 'সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ' এই শাস্ত্রবচন অনুসরণ করিয়া হাঁফ ছাড়িতেছেন; শীঘ্র, সস্তা ও সুবিধার কল্যাণে রাজা-মজুর সকলেই কাশী-গয়া-প্রয়াগ-মথুরা-বৃন্দাবন-শ্রীক্ষেত্র ঘুরিয়া শারীর ও মানস চক্ষুঃ সার্থক করিতেছেন। কিন্তু সেকালে তীর্থ-দর্শনে যে সাত্ত্বিক ভাবটি ছিল, তাহা কি একালের এই ট্রেনষ্টীমারের আমলে দেখিতে পাওয়া যায়?

তখনকার দিনে লোকে সুদূর বঙ্গদেশ হইতে শতশতক্রোশ দূরবর্ত্তী কাশী-গয়া-প্রয়াগ করিতে যাইত;—কতক পথ নৌকাযোগে, কতক বা গরুর গাড়ীতে, আবার কতক পদব্রজে ছয়মাস নয়মাসে পৌঁছিত। ইহাতে সময় অনেক লাগিত, অর্থব্যয় বিলক্ষণ হইত, শারীরিক কষ্টের ত কথাই নাই, পথে বিপদাশঙ্কাও যোল-আনা ছিল। কিন্তু সে কষ্ট, সে উদ্‌বেগ, সে সহস্র অসুবিধার একটা আধ্যাত্মিক উপকারিতা ছিল। তীর্থযাত্রার দিন হইতেই যাত্রীরা সংযম অভ্যাস করিত, সকলেই তদ্গতচিত্তে এক মহান্ উদ্দেশ্যে দীর্ঘপথ বাহিয়া মনের আনন্দে চলিত। তখনকার দিনে লোকে সঙ্গী খুঁজিত, দশজনে একত্র হইয়া এক উদ্দেশ্যে এক পথে বাহির

হইয়া পড়িত। তাহাতে সকলেরই প্রাণ একটা মধুর অথচ গম্ভীর সুরে বাঁধা হইত। পরস্পরের মধ্যে একটা অন্তরঙ্গভাব জন্মিয়া যাইত, পরের সুখে-দুঃখে সমবেদনা জন্মিত, সকলেই পরস্পরের সাহায্য করিত। এই মানবপ্রীতি হইতে চিত্তশুদ্ধি ঘটিত, নীচ স্বার্থপরতা সঙ্কীর্ণহৃদয়তা ঈর্ষ্যা-দ্বেষ হৃদয় হইতে বিদায় লইত এবং তাহার ফলে তীর্থদর্শনের প্রকৃত ফল সহজেই সকলের করায়ত্ত হইত।

আর এখনকার দিনে—রেলগাড়ীতে উঠিয়াই কেহ দরজায় চোরা-চাবি লাগাইতেছেন; কেহ পোঁট্লাপুঁটলি চারিদিকে ছড়াইয়া সমস্ত জায়গা অধিকার করিয়া লইতেছেন,—যেন গাড়ী-খানি তাঁহার পৈতৃক মৌরুশী সম্পত্তি; কেহ পা ছড়াইয়া বসিয়া প্রবেশদ্বার আটক করিয়া বিশ্বম্ভরমূর্ত্তিতে বসিয়া আছেন,—কাহার সাধ্য, বীর হনুমানের লাঙ্গুলের ন্যায় সেই চরণযুগল ঠেলিয়া সরায় নড়ায়? আবার কেহ বা পেট্রা বাক্স গাদা করিয়া কৃত্রিম barricadeএর সৃষ্টিতে রণচাতুর্য্যের বাহাদুরি লইতেছেন, আর কেহ বা রীতিমত সম্মুখযুদ্ধ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া আস্তিন গুটাইয়া প্রবেশদ্বার আগুলিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, ও 'কে তোরা রে নিশাকালে আইলি মরিতে, জাগে এ দুয়ারে হনু' বলিয়া মধ্যে মধ্যে সাড়া দিতেছেন, অন্য লোকে প্রবেশ করিতে গেলেই যমদ্বারের প্রহরী (Cerberus) সারমেয়ের ন্যায় বিকট হুঙ্কার করিয়া উঠিতে-ছেন। সোজা কথায় বলিতে গেলে, আজকালকার লোক স্বার্থপর, স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় ও সঙ্কীর্ণহৃদয়, পাঁচজনের সঙ্গে মিলিয়া-মিশিয়া থাকিতে চাহে না; সকলেই আত্মসুখতৎপর; আপন-আপন সুবিধা খুঁজিয়া বেড়ায়, পরকে ফাঁকি দিয়া নিজে সুখী হইব, ইহাই তাহাদের ধ্যানজ্ঞান। হায়, ইহারা আবার পুণ্যার্জ্জনের জন্য তীর্থযাত্রা করিয়াছে! যাহারা ধর্ম্মের মূলসূত্র বিশ্বপ্রেম শেখে নাই, তাহারাই আবার বিশ্বনাথের মস্তক স্পর্শ করিয়া

কৈবল্য-লাভ করিবে? কি দুরাশা! পরকে আপদে-বিপদে সাহায্য করা দূরে থাকুক; যদি কোন সরলপ্রকৃতির যাত্রী কাহারও নিকট রেল-সংক্রান্ত একটা সংবাদ চাহে, তবে সকলেই সেই নিরীহ ব্যক্তিটিকে অবজ্ঞামিশ্রিত কৃপার চক্ষে দেখেন। কেননা, তাঁহারা সকলেই চারচার পয়সা খরচ করিয়া একএকখানি টাইম্‌-টেবল্‌ কিনিয়াছেন, হিল্লীদিল্লীর খবর তাঁহাদের করতলন্যস্ত আমলকবৎ; তাঁহারা কাহারও নিকট কোন খবর চাহেনও না, কাহাকেও কোন খবর দিতেও প্রস্তুত নহেন, ছিপি-আঁটা কর্পূরের শিশির মত গ্যাট হইয়া বসিয়া আছেন, পাছে বুদ্ধিশুদ্ধি উবিয়া যায়।

* * * * *

এই ত গেল পথের সুখ। এখন ধানভানা ছাড়িয়া শিবের গীত ধরা যাউক। তীর্থক্ষেত্রে প্রবেশমাত্র যমদূতের ন্যায় পাণ্ডাগণের আক্রমণ,—কেবল পয়সার জন্য খিটিমিটি। এই অর্থগৃধ্নু শকুনিগৃধ্রের দল আবার দেবালয়ের সেবায়ত! এই পাপিষ্ঠগণের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডায় হৃদয়মন কলুষিত হয়, ইহাতে কোথায় বা থাকে ধর্ম্মভাব, কোথায় বা থাকে চিত্ত-শুদ্ধি! শুনিয়াছিলাম, দেবদেব বিশ্বেশ্বরের আ তি দেখিলে হৃদয়ে উদাত্ত (sublime) ভাবের উদয় হয়, পাষণ্ডের মনও গলিয়া যায়। সেখানে গিয়া কি দেখিলাম? প্রাণ ভরিয়া দেবদর্শন করিতে চাও, তবে ঘুষ বা ঘুষি চাই। তীর্থযাত্রাকালে রেলগাড়ীতেও তাই, তীর্থদর্শনকালে দেবালয়েও তাই। ভিড় ঠেলিয়া শ্বাস রুদ্ধ করিয়া ঘুষ বা ঘুষির সাহায্যে স্থান করিয়া লওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহাতে ভক্তিরসের আবির্ভাব হইবার ত কথা নহে। তবে যিনি 'সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা' ভক্তি-বিভোর হইয়া থাকেন, তিনি অবশ্য সেই ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কিতে মহাকালের ত্রিশূলাস্ফালনের ছায়া দেখিয়া রোমাঞ্চিত হইয়া উঠেন! যাঁহার মন সর্ব্বদাই ভক্তিরসে আর্দ্র, তাঁহার পক্ষে সকল

স্থলেই সাত্ত্বিকভাবের উদয় হওয়া স্বাভাবিক। সেরূপ সিদ্ধ পুরুষের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু,বিজাতীয় শিক্ষাদীক্ষায় যাহাদের ভক্তির উৎস শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, তাহাদের সেই উৎস উৎসারিত হইলে বুঝিতাম যে, প্রকৃতই বিশ্বেশ্বর-মাহাত্ম্য অসীম—'তন্মহত্ত্বং মহত্ত্বম্'।

আজকাল ইংরেজনিন্দা ও স্বদেশানুরাগ সমার্থবোধক হইয়া উঠিয়াছে। এই ইংরেজবিদ্বেষ ও স্বজাত্যনুরাগের দিনে খ্রীষ্টান ইংরেজের প্রশংসা ও হিন্দুসমাজের নিন্দা করিলে পাঠকগণের বিরাগভাজন হইতে হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু সত্যের ও ন্যায়ের অনুরোধে বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, খ্রীষ্টান ইংরেজের গির্জ্জায় কি সুশৃঙ্খলা, নিরুপদ্রবতা ও প্রগাঢ় শান্তি বিরাজমান আর হিন্দুর দেবমন্দিরে কি ঠেলাঠেলি, কি চেঁচামেঁচি, কি ভিড়, কি হট্টগোল! এই মূর্ত্ত শব্দকল্লোলও সাকারোপাসনার একটা অঙ্গ নাকি? আমরাই আবার হিন্দুধর্ম্মের আধ্যাত্মিকত্ব লইয়া আস্ফালন করি ও খ্রীষ্টান-জগতের ঘোর (materialism) জড়বাদ লইয়া টিট্‌কারী দিই। মহান্ত ও সেবায়তগণের কলুষিত চরিত্র ও বিকট তাণ্ডবলীলা দেখিয়া আমাদের চৈতন্য হয় না, আর সরকার-বাহাদুর Religious Endowment Act পাশ করিতে গেলে আমরা 'জাতি গেল, ধর্ম্ম গেল, সমাজ-বন্ধন টুটিল' বলিয়া চীৎকার করিতে লজ্জিত হই না। তাই বলি, এই উৎকট স্বদেশীয়তার দিনে পরমুখপ্রেক্ষী না হইয়া ঘরের গলদ সারিয়া লইতে, তীর্থকলঙ্ক দূর করিতে, হিন্দুসাধারণের সজীব ও সচেষ্ট হওয়া উচিত। আর যদি আমরা এই সামাজিক সংস্কার সাধন করিতে অপটু হই, তবে অভিমান ত্যাগ করিয়া সরকার-বাহাদুরের হাতে এই ভার সরাসরিভাবে সঁপিয়া দিয়া আমাদের জাতীয় অক্ষমতা স্বীকার করাই শ্রেয়ঃ নহে কি? সতীদাহ, গঙ্গাসাগরে সন্তানবিসর্জ্জন প্রভৃতি নৃশংস প্রথা উৎসাদন করিতে আমাদিগকে বিধর্ম্মী রাজার শরণাপন্ন হইতে

হইয়াছিল, এ কথা ভুলিলে চলিবে না। হাজারও চীৎকার করি আর স্বদেশী ভান করি, আজও তাহাই আমাদের জাতির উপযুক্ত পথ। স্বাবলম্বন এ জাতির কোষ্ঠীতে লেখে নাই।

* * * *

স্নানের ঘাটগুলির মধ্যে দশাশ্বমেধঘাট সর্ব্বপ্রধান। এই ঘাটে যত স্ত্রীপুরুষ স্নান করে, এত বোধ হয় আর কোন ঘাটেই নহে। তন্মধ্যে বাঙ্গালীর সংখ্যাই বেশী। প্রাতে ও সন্ধ্যায় সারি সারি স্ত্রীপুরুষ ঘাটে আসনে বসিয়া সন্ধ্যা-আহ্নিক করিতেছেন, কেহ কেহ বা সাধুসন্ন্যাসী-দিগের সহিত ধর্ম্মালাপ করিতেছেন, এ দৃশ্যটি অতি পবিত্র। বিজয়া-দশমীর দিন বৈকালে বিসর্জ্জনের জন্য প্রায় সমস্ত প্রতিমা এই ঘাটে আনীত হয়। তখনকার দৃশ্য অপূর্ব্ব, একবার দেখিলে সারাজীবনে ভুলিতে পারা যায় না। শত শত বালক-বৃদ্ধ-যুবা নিজ দশাশ্বমেধ ঘাট ও তৎসংলগ্ন ঘাটগুলিতে কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া আছে, সমস্ত সহর উজাড় হইয়া একত্র সমবেত হইয়াছে, শিশুজনের লোভনীয় নানা বিক্রেয় বস্তুর মেলা বসিয়াছে, অনেকে 'ভাসান' দেখিবার জন্য নৌকায়ও আশ্রয় লইয়াছেন, আর গঙ্গাতীরবর্ত্তী অট্টালিকাসমূহের ছাদ ও বাতায়নে অসংখ্য বালিকা-বৃদ্ধা-যুবতীর সমাবেশ কালিদাসের 'কুবলয়িতগবাক্ষাং লোচনৈরঙ্গনানাম্' বর্ণনা অক্ষরে অক্ষরে সত্য সপ্রমাণ করিতেছে। সকলেরই মনে সেই সন্ধিক্ষণে উল্লাস ও বিষাদের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। ভোগের পর ত্যাগ, জীবনের অন্তে মরণ, প্রবৃত্তির অবসানে নিবৃত্তি—বিজয়া-ব্যাপার যেন এই মহাসত্য শিক্ষা দিতেছে। মাটীর দেহের ন্যায় মৃন্ময়ী প্রতিমার বিসর্জ্জন হইতেছে, সকলেই দৃশ্যদর্শনে ও গঙ্গাজলস্পর্শনে উৎসুক। দূরে বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা, শিব ও শক্তি, বিরাজমান, আর অদূরে জীবনের পরিণতিজ্ঞাপক মণিকর্ণিকার শ্মশানঘাট।

এখানকার গঙ্গাজল সুস্নিগ্ধ, স্নানে শরীর জুড়ায় এবং চিত্তে অভূতপূর্ব্ব শান্তি ও পবিত্রতার উদয় হয়; তাই মনে
কথাটা নিতান্ত পৌরাণিক উপকথা না হইতেও পারে। ঘাটের অবস্থা দেখিয়া কিন্তু ব্যথিত হইতে হয়। ঘাটের উপরিভাগ ও সোপানশ্রেণী মনুষ্যমূত্রের গন্ধে ও কুক্কুরবিষ্ঠায় (ইহার মধ্যে মনুষ্যকুক্কুরও আছে) অশ্রদ্ধা ও বিতৃষ্ণা জন্মাইয়া দেয়। গঙ্গাস্নানে যাতায়াতের গলিগুলিরও এই দুর্দ্দশা। ইহা হিন্দুসমাজের নিতান্ত লজ্জার বিষয়। মিউনিসিপ্যালিটির ত দেখিতেছি এদিকে যত্ন নাই। শুনিয়াছি, কাশীস্থ হিন্দুসমাজ নিষ্ঠাবান্; বাঙ্গালীকে অনাচারী বলিয়া আমাদের 'পশ্চিমা' জ্ঞাতিগণ টিট্‌কারী দেন, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের কেন্দ্রস্থল সুপবিত্র বারাণসী-ধামের অপরিচ্ছন্নতা-বিষয়ে তাঁহারা এত নিশ্চেষ্ট কেন? এই সকল স্থলেই হিন্দু-জাতি ও খ্রীষ্টান ইংরেজ জাতির মধ্যে প্রভেদ বেশ বুঝিতে পারা যায়।

কাশীতে নানারূপ অনাচার-ব্যভিচার অহরহ আচরিত হইতেছে। অনেক কলুষিতচরিত্র নরনারী এখানে আশ্রয় লইতেছে ও 'যেষাং কাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ' এই বাণীর সার্থকতা সম্পাদন করিতেছে। এই কারণে অনেক ইংরেজীশিক্ষিত লোকের এই স্থানের উপর একটা বিষম অশ্রদ্ধা আছে। কিন্তু আমার মনে একদিনের তরেও সেরূপ অশ্রদ্ধার উদ্রেক হয় নাই। পবিত্র জাহ্নবীসলিলে বিষ্ঠামূত্র-আবর্জ্জনাদি পড়িতেছে, তাহাতে কি জাহ্নবীবারির পবিত্রতা নষ্ট হয়? পতিতপাবনী সুরধুনীর ন্যায় বিশ্বনাথের পুরীও পাপীর সংস্পর্শে কলঙ্কিত হয় নাই, বরং পাপীদিগকে নিজক্রোড়ে স্থান দিয়া তাহাদের পাপক্ষালনের পথ দেখাইতেছে।

* তখন নব অনুরাগে এইরূপ লিখিয়াছিলাম। এখন অতি-পরিচয়ে কাশীর প্রতি অবজ্ঞা না হইলেও ক্রমে বুঝিতেছি, এক শ্রেণীর কাশীবাসী ও কাশীবাসিনীর

হিন্দুজাতির অন্যতম কীর্ত্তি মানমন্দিরের দুর্দ্দশা দেখিলে চক্ষে জল আসে,—হিন্দুজাতি যে সত্যসত্যই অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িয়াছে, তাহার আর দ্বিতীয় প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। হিন্দুজাতি অন্যনিরপেক্ষ হইয়া জ্যোতিষে কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহার অকাট্য প্রমাণ এই মানমন্দিরে স্থাপিত যন্ত্রনিচয়। কিন্তু মানমন্দিরের নিম্নতল এখন গোশালায় পরিণত হইয়াছে; গোমূত্র ও গোময়ের গন্ধে সমস্ত পুরী আমোদিত। এই সকল দেখিলেই হৃদয়ঙ্গম হয় যে, প্রাচীন হিন্দুজাতি সকল বিষয়েরই ধর্ম্মের সহিত সংযোগ রাখিয়া কি দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন। এই মানমন্দিরের যদি ধর্ম্মের সঙ্গে সামান্যমাত্রও সংযোগ থাকিত, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির মধ্যে যদি একটি পাষাণবিগ্রহ দেবতারূপে প্রতিষ্ঠিত হইতেন, তাহা হইলে এই মানমন্দিরের চেহারা ফিরিয়া যাইত। Pure intellectএর ব্যাপারে সাধারণ লোকের মন কখনই আকৃষ্ট হয় না। তাই আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ গ্রহণ, তিথি, নক্ষত্র, ঋতুপরিবর্ত্তন প্রভৃতি প্রাকৃতিক ঘটনার সঙ্গে ধর্ম্মের সূত্র গাঁথিয়া দিয়া সেগুলির দিকে সাধারণের দৃষ্টি-আকর্ষণের অমোঘ উপায় বিধান করিয়া গিয়াছেন। আমরা অদূরদর্শী হইয়া পড়িয়াছি, তাই আধুনিক সভ্যতার প্রসাদে সেগুলিকে কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দিই।

দেবদর্শন হৃদয় বিমল আনন্দ, বিস্ময় ও ভক্তিরসে আপ্লুত হয় নাই।

চরিত্র বাস্তবিকই কাশীর কলঙ্ক। তবে 'কাশীর কিঞ্চিৎ'-নামক নব-প্রকাশিত সুপাঠ্য পুস্তকখানির ভাষায় বলা যায়—

'কাশী সেই কাশীই আছে, থাকবেও চিরদিন,
মানুষই স্বভাব-দোষে, হচ্ছে ক্রমে হীন।
সে দোষ কাশীর নয়—মানুষেরই সেটা,
হেথাও সে বিষয় খুঁজে বাধিয়েছে এই লেঠা।'

—(দ্বিতীয় সংস্করণের টিপ্পনী।)

এখানকার পনর আনা দেববিগ্রহই পাষাণময় শিবলিঙ্গ। বিশ্বেশ্বর, কেদারেশ্বর, নকুলেশ্বর, তিলভাণ্ডেশ্বর, পাতালেশ্বর, পুষ্পদন্তেশ্বর সকলেরই সেই এক ধাঁচা; গঠনে কোন কারিকুরির চিহ্ন নাই, মন্দির-গুলির ভিতরেও কোন কারুকার্য্য বা গঠন-পারিপাট্য নাই, সহজ মানবমনে কোন বিরাট্‌ভাবের উদ্রেক করিবার শক্তি এই পাষাণখণ্ডের ও পাষাণস্তূপের নাই। মানবজাতির ইতিহাসে এমন এক দিন ছিল যখন "গুঁড়িকাষ্ঠ নুড়িশিলা ভক্তিপথে নেয়ে" হইলেই মানবমন কৃতার্থ হইত। এ সমস্ত সেই প্রাচীন কালের নিদর্শন (relic)-হিসাবে মূল্যবান্ সন্দেহ নাই; কিন্তু আধুনিক মানবের মনে এতই পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে, এই পাষাণবিগ্রহে তাহার তৃপ্তি হয় না। তাহার উপর আবার এই লিঙ্গমূর্ত্তিতে শরীরতত্ত্বের যে ব্যাপারটি রূপিত হইয়াছে বলিয়া ইংরেজগুরুর নিকট শিখিয়া রাখিয়াছি, তাহাতে আধুনিক মানবমনে জুগুপ্সা ও লজ্জার উদয় হয়, ধর্ম্মসাধনের কোনও সহায়তা হয় না। কবিত্বপ্রবণ হৃদয়ে বড় জোর ল্যাটিন্‌কবি Lucretiusএর ভীনস্-স্তোত্র স্মরণ করাইয়া দেয়, এই পর্য্যন্ত। Phallus-worshipএর দিনকাল চলিয়া গিয়াছে; তবে বিশাল হিন্দুধর্ম্মে নাকি ধর্ম্মের সকল স্তরই অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশ্রিত; বৈদিক ঋকের প্রকৃতিপূজা, উপনিষদের নির্গুণব্রহ্মোপাসনা, পৌরাণিক বিগ্রহসেবা, অবতারবাদ, apotheosis, anthropomorphism, প্রেতপূজা, পিতৃগণের প্রেতাত্মার পূজা, গাছপাথরের পূজা ইত্যাদি সকল তত্ত্বই ইহার অন্তর্নিবিষ্ট, সকল শ্রেণীর অধিকারীর জন্যই ইহা সৃষ্ট, 'ভাবনা যাদৃশী যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী' ইহার মূলমন্ত্র, তাই আধ্যাত্মিক জীবনে চরম উন্নতি লাভ করিয়াও হিন্দুজাতি ধর্ম্মসাধনায় লিঙ্গপূজার জন্যও স্থান রাখিয়াছেন; আধুনিক হিসাবে ইহা অবশ্য কুরুচি-ব্যঞ্জক বলিয়াই বিবেচিত হইবে।

যাহা হউক, ইংরেজী শিক্ষার গ্যাসের আলোকে এসকল পরমতত্ত্বের রহস্যোদ্ভেদে প্রযত্নশীল না হইয়া সোজাসুজি মনের কথাটা বলিয়া ফেলি। কল্পনায় আঁকিয়াছিলাম যে, বিশ্বজীবের প্রতিনিধিস্বরূপ দেবদেব বিশ্বেশ্বর ভিখারীবেশে অন্নপূর্ণার দ্বারে দণ্ডায়মান, আর বিশ্বজীবের অন্নদাত্রী মহামায়া অন্নপূর্ণা স্বর্ণহাতা দিয়া স্বর্ণস্থালী হইতে অমৃতস্বাদু পায়সান্ন দিতেছেন, মুখশ্রীতে অনন্ত করুণা; সেই পায়সভোজনে অনন্ত-জীবের অনন্তক্ষুধা অনন্তকালের জন্য প্রশমিত হয়—'Whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst.'

আর এখানে আসিয়া দেখিলাম, সম্পূর্ণ অন্যরূপ। তখন Wordsworthএর "And is this—Yarrow?" শীর্ষক কবিতাটি মনে পড়িল। তবে শুনিলাম সুবর্ণময় বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা আছেন, তাঁহারা কেবল উৎসব-বিশেষে লোকলোচনের বিষয়ীভূত হন।* অন্য যে দুই চারিটি অন্য-প্রকারের দেবমূর্ত্তি দেখিলাম, সেগুলিরও গঠনপ্রণালীতে মনের তৃপ্তি হইল না। আমাদের প্রদেশে (নবদ্বীপে) কুম্ভকারেরা সামান্য মৃত্তিকাদ্বারা যে সুঠাম দেবদেবীমূর্ত্তি গড়ে, তাহার তুলনায় এ সমস্ত মূর্ত্তিকে নিতান্ত crude ও পারিপাট্যবিহীন না বলিয়া থাকা যায় না। আর যাঁহারা ইউরোপীয় শিক্ষাদীক্ষা লাভ করিয়া প্রাচীন গ্রীক্ জাতির ও মধ্যযুগের ইতালীয় জাতির ভাস্কর্য্য ও চিত্রশিল্পের পরিচয় পাইয়াছেন

* এই প্রবন্ধ লেখার পর লেখকের ভাগ্যে দেওয়ালী উপলক্ষে তিন দিন সেই কাঞ্চনমূর্ত্তি দেখা ঘটিয়াছে এবং তাহাতে লেখকের আকাঙ্ক্ষাও কিয়ৎপরিমাণে চরিতার্থ হইয়াছে। তবে সাধারণতঃ যাত্রীরা সে দৃশ্যে বঞ্চিত, কাযেই প্রবন্ধোক্ত বাক্যের প্রত্যাহার নিষ্প্রয়োজন।

এই সমস্ত মূর্ত্তিদর্শনে তাঁহাদের কতদূর আশাভঙ্গ হয় তাহা সহজেই অনুমেয়। +

সকল বিগ্রহ দেখি নাই, দেখিবার সুবিধাও হয় নাই। সত্য কথা বলিতে কি, অনবরত শিবলিঙ্গ দেখিয়া দেখিয়া নিতান্ত একঘেয়ে বোধ হওয়ায় আর তত ঘুর্ণি র প্রবৃত্তিও হয় নাই। শাস্ত্রের মতে যিনি 'শরীরার্দ্ধং স্মৃতা', তাঁহারই উপর দেবদর্শনের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত ছিলাম; তাহাতে লোকসানও হয় নাই, কেননা,—তিনিই ত 'পুণ্যাপুণ্যফলে সমা'। এইটুকু কেবল প্রণিধান করিলাম যে, বারাণসীধাম সর্ব্বতীর্থের সংক্ষিপ্তসার (epitome); শাস্ত্রেও আছে, 'অথবা সর্ব্বক্ষেত্রাণি কাশ্যাং সন্তি নগোত্তম।' অসিসঙ্গম হইতে আরম্ভ করিয়া বরুণাসঙ্গম পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিলে হিন্দুশাস্ত্রোক্ত প্রধান প্রধান সকল দেবদেবীরই দর্শন-লাভ ঘটে। হিন্দুস্থানের প্রকৃত রাজধানী বারাণসী, কলিকাতা নহে, এ কথার সত্যতা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছি। আরও একটি কারণে এই কথা হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়াছে। হিন্দুস্থানে যুগে যুগে যে সকল ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তৎসমুদয়ের সঙ্ঘর্ষ ও সমন্বয় (?) এইখানেই ঘটিয়াছে। সৌর, গাণপত্য, শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি হিন্দুধর্ম্মের বিশেষ বিশেষ শাখা ত আছেই, ইহা ছাড়া বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের

+ সমস্ত দেবমন্দির ও দেববিগ্রহ দেখিয়া মনে যে বিস্ময় ও হর্ষের উদয় না হইয়াছে, কুইন্‌স্ কলেজের স্থাপত্য-শিল্প দেখিয়া তাহা হইয়াছে; কথাটা সাহস করিয়া বলিতে পারি না, পাছে পাঠক মহাশয় উপহাস করিয়া বলিয়া উঠেন—এক বিধবা জগন্নাথদর্শনে গিয়া কেবল সূতার নাটাই ঘুরিতে দেখিয়াছিলেন, শিক্ষা-ব্যবসায়ীও সেইরূপ দেবদর্শন করিতে গিয়াও নিজের ব্যবসায় কথা ভুলেন নাই। তবে ভরসা আছে, যিনি কুইন্‌স্ কলেজ একবার স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তিনি কথাটা নেহাৎ হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন না।

সঙ্ঘর্ষের পরিচয় বারাণসীধাম হইতে কয়েক মাইল দূরে সারনাথনামক স্থানে পরিস্ফুটরূপে পাওয়া যায়। বৌদ্ধস্তূপের অনতিদূরে সারনাথেশ্বর-নামক শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা দেখিয়া উভয় ধর্ম্মের সঙ্ঘর্ষ ও সমন্বয়ের সুন্দর ইতিহাস পাওয়া যায়। এদিকে আবার প্রাচীন বিশ্বেশ্বরের মন্দির মুসলমানের মস্‌জিদে পরিণত হইয়াছে এবং বিন্দুমাধবের মন্দিরের পার্শ্বেই মুসলমানের মস্‌জিদের অত্যুচ্চ চূড়া (ইহাকেই লোকে 'বেণী-মাধবের ধ্বজা' বলে) রহিয়াছে, ইহাতে আর্য্যধর্ম্ম ও ইস্‌লামধর্ম্মের সঙ্ঘর্ষ ও সমন্বয়ের সুস্পষ্ট পরিচয় দেয়। এখনও কাশীর মধ্যস্থলে খ্রীষ্টানের গির্জ্জা ও হিন্দুর শিবমন্দির পাশাপাশি উচ্চচূড়া উত্তোলন করিতেছে, ইহাতেও হিন্দুস্থানের আধুনিক ধর্ম্মভেদের বিলক্ষণ আভাস পাওয়া যায়। তাই বলিতেছিলাম, হিন্দুস্থানের প্রকৃত রাজধানী ও সংক্ষিপ্তসার এই বারাণসীধাম, ঐতিহাসিকের চক্ষে ইহার interest অসীম।

পূর্ব্বে বলিয়াছি বটে, দেববিগ্রহ বা দেবমন্দির, ঘাট বা রাস্তা দেখিয়া মনে তত তৃপ্তি হয় নাই। তথাপি বলিব, যে কয়দিন কাশীবাস করিয়া-ছিলাম মনের শান্তিতে কাটাইয়াছিলাম এবং এই পুণ্যধামের 'আনন্দ-কানন' নাম অন্বর্থ তাহা বুঝিয়াছিলাম। কেন, জিজ্ঞাসা করিলে খোলসা উত্তর দিতে পারিব না।

প্রত্নতত্ত্বে কখন অনুরাগী নহি, কাযেই কাশীর প্রাচীনতায় ও ঐতি-হাসিক রহস্যে মনে এই ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা সাহস করিয়া বলিতে পারি না। পুণ্যসঞ্চয়ে তাদৃশ উৎসাহ দেখাই নাই, কাযেই পুণ্যার্জ্জনে চিত্তপ্রসাদ হইয়াছিল, এ কথাও পাপমুখে বলিতে প্রবৃত্তি হয় না। কাশীতে খাদ্যসুখ আছে বটে, কিন্তু কলিকাতাবাসী অম্লরোগীর পক্ষে সেটা বিশেষ একটা সুসংবাদ নহে, কাযেই মিষ্টরসে রসনা তৃপ্ত হইয়াছে বলিয়া কাশীর গুণগান করিতেছি বলিলেও সত্যের অপলাপ হয়।

কাশীর ধর্ম্মের ষাঁড়গুলি শিবের সান্নিধ্যে শিবত্ব না পাইলেও শান্তত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু এই স্থানমাহাত্ম্য দেখিয়া হৃদয় বিগলিত হইয়াছে ইহা বলিলেও হাস্যাস্পদ হইতে হইবে। কাশীর দৃশ্য নয়নমনোরঞ্জন বটে,—রেলগাড়ীতে বসিয়াই, রাজঘাট ষ্টেশনে না পৌছিতেই গঙ্গাবক্ষোবিলম্বী সেতুবর্ত্মের উপর হইতে ক্রোশ-বিস্তৃত অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি যে বিচিত্র পুরী দেখা যায় তাহাতেই প্রাণমন কাড়িয়া লয়। এরূপ দৃশ্য সমগ্র জগতেও অতুলনীয়। পূর্ণিমারজনীতে দশাশ্বমেধঘাটে কূলে কূলে জল, সেই জলে অর্দ্ধপ্রোথিত প্রস্তরমন্দিরের চাতাল হইতেও আবার এই রমণীয় দৃশ্য প্রাণ ভরিয়া দেখিয়াছি। জ্যোৎস্নারাত্রে গঙ্গাবক্ষে বিচরণশীল নৌকা হইতেও এই দৃশ্য নয়নগোচর হইয়াছে। কাশীপ্রবেশকালে এই দৃশ্য প্রাণমন অধিকার করে এবং ইহারই প্রভাবে সমস্ত মধুময় হইয়া উঠে; অগণিত মন্দিরচূড়া, পাথরের 'দ্বিতল, ত্রিতল, চৌতল ভবন,' ভিত্তিগাত্রে বিচিত্র চিত্রাবলী, গোটা-পাথর-মোড়া গলিরাস্তা, কোথাও উচ্চ, কোথাও নিম্ন, গঙ্গাতটে যেন গঙ্গাগর্ভ হইতে উত্থিত হইতেছে এরূপ সুরম্য অত্যুচ্চ অট্টালিকাসমূহ, অসংখ্য পাষাণ-সোপানশ্রেণী, আর পুরীর পাশ দিয়া বাঁকিয়া ভাগীরথী কুলকুলরবে বহিতেছেন, এ সমস্তই কাশীর দৃশ্যকে লোভনীয় করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু এই মনোলোভা পুরীশোভা দেখিয়াই ত মনে এমন সুখের ফোয়ারা খেলার কথা নহে, আরও ত অনেক দেশে অনেক সুন্দর সহর, সুরম্য হর্ম্ম্য, 'পুণ্যবতী স্রোতস্বতী' রহিয়াছে, কৈ আর কোথাও ত মনে এরূপ ভাবের উদয় হয় না।

তাই মনে হয়, বৈদিক ঋষি, পুরাণবর্ণিত রাজা প্রভৃতি প্রাচীনকালের মহাপুরুষগণ হইতে আরম্ভ করিয়া এই ঘোর কলিকালে ত্রৈলঙ্গস্বামী ভাস্করানন্দস্বামী বিশুদ্ধানন্দস্বামী প্রভৃতি মহাপুরুষগণ পর্য্যন্ত যে সকল সিদ্ধপুরুষ এই পবিত্র পুরীতে বিচরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের চরণরজঃ

বারাণসীর প্রত্যেক ধূলিকণার অণুতে অণুতে মিশ্রিত রহিয়াছে, সেই চরণরেণুর স্পর্শে স্পর্শে আমাদের হৃদয়-মন বিমল শান্তিতে ভরিয়া যায়, প্রাণে কেমন একটা বৈরাগ্যের ভাব আসে, পুণ্যভূমি ছাড়িতে চোখে জল আসে, প্রাণে বেদনাবোধ হয়, হৃদয়ে শূন্যতার অনুভব হয়; আমরা স্থূলদৃষ্টিতে বুঝিয়া উঠিতে পারি না, কেন এমন হয়?

* * * *

এই চাকুরিগতপ্রাণ অধম লেখকের আজ কাশীবাসের শেষ দিন। সায়াহ্ন উপস্থিত, বিশ্বনাথের পুরীতে শত শত দেবালয়ে শঙ্খঘণ্টানিনাদ হইতেছে; দশাশ্বমেধঘাটে কেহ চাতালে বসিয়া ভাবে ভোর হইয়া ধর্ম্মসঙ্গীত গায়িতেছেন, কেহ তন্ময় হইয়া তাহা শুনিতেছেন; আবার কাষ্ঠবেদিকায় আসীন হইয়া কেহ সাধুসন্ন্যাসীর সহিত ধর্ম্মালাপে ব্যাপৃত, কেহ সন্ধ্যাবন্দনাদিতে রত; আর কাষ্ঠবেদিকার এক পার্শ্বে ক্রিয়াকাণ্ডহীন নব্যতন্ত্রের লেখক বিষণ্ণমনে বসিয়া আছেন। সূর্য্যাস্তকালের আকাশের বিচিত্র বর্ণচ্ছটা দেখিতে দেখিতে বিলীন হইল; গঙ্গাতটে, গঙ্গাজলে, পরপারবর্ত্তী বৃক্ষরাজিমধ্যে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল, লেখকের হৃদয়ও কি-যেন-কি এক অব্যক্ত বিষাদে ভরিয়া গেল, এই শান্তিপবিত্রতা-নিলয় পুণ্যনিকেতন ছাড়িয়া যাইতে হইবে বলিয়া হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িল। আত্মতত্ত্ববিহীন জনের পক্ষে পশুর ন্যায় এই মূকশোকই একমাত্র সম্বল।

পরিশিষ্ট

বারাণসী-দর্শনে।

(ভারতমহিলা, বৈশাখ ১৩১৪)

বিরাজে পবিত্রতীর্থ বারাণসী-ধাম,
বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা প্রতিষ্ঠিত যেথা
পূর্ণব্রহ্ম আদ্যাশক্তি মূর্ত্তিগ্রহ করি'।
অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি গঙ্গা শোভে নিরবধি
হরমৌলি-ইন্দু-সম, পুণ্যতোয়া ভবে।

পুরী প্রবেশিতে অনিমিষে দেখে নর
অগণিত দেবালয় শোভে উচ্চচূড়,
পাষাণে নির্ম্মিত হর্ম্ম্য দ্বিতল ত্রিতল,
ভিত্তি-গাত্রে চিত্ররাজি উজ্জ্বলবরণ,
পাষাণ-সোপানশ্রেণী ভাগীরথীতটে,
শিলাপট্টে আবরিত আঁকা বাঁকা গলি,
সকলই বিচিত্র হেথা। জাহ্নবীর বারি
সুস্নিগ্ধ নির্ম্মল; স্নানান্তে জুড়ায় দেহ,
আত্মার কলুষ কাটে, ভরে মনঃপ্রাণ
শান্তির বিমল রসে। প্রভাতে সন্ধ্যায়
তীরে বসি' পূজে ভক্ত নিজ ইষ্টদেবে;

বসি' সাধু-দণ্ডী কাছে শুনে ধর্ম্মকথা
কেহ শুদ্ধচিত্তে। বিরাজিত শান্তি যথা
এ পবিত্র ধামে, ভুলে নর শোক-তাপ;
আত্মার পিপাসা মিটে শান্তি-সুধা-পানে।

যুগে যুগে যোগী ঋষি সাধু ভক্তগণ
পবিত্র করেছে পুরী চরণ-পরশে;
পুণ্য-রজঃ-স্পর্শে প্রতি ধূলিকণা
পূরিত অধ্যাত্ম-বলে; তাই বুঝি প্রাণ
শান্তিরসে অভিষিক্ত, বৈরাগ্যমণ্ডিত
হয় প্রতিক্ষণে; ছেড়ে যেতে আঁখি ভরে
অশ্রুনীরে, শূন্য ঠেকে হৃদয়পঞ্জর—
বুঝি না অজ্ঞান মোরা কেন হেন ভাব?

কত যুগ কত কল্প ধরি' আছে পুরী।
ধর্ম্মবিধি কত প্রকাশিল একে একে;
সৌর গাণপত্য শৈব শাক্তি বিষ্ণুসেবী
পঞ্চ উপাসক-দল মিলিত হেথায়;
শিবের মহিমা প্রকটিত কত স্থলে,
জ্ঞানবাপী আদি করি' পুণ্যবারি কত;
সর্ব্বতীর্থময়ী কাশী—ধর্ম্ম-রাজধানী।
ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তন বুদ্ধদেব-কৃত
—বিরাট্ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম নিষ্প্রভ যেথায়—
সারনাথ অদূরে বিরাজে; স্তূপমাত্র
অবশেষ; পাষাণ-বিগ্রহ মহাদেব

সারনাথেশ্বর প্রতিষ্ঠিত তা'র পাশে ;
ধর্ম্মসমন্বয় কিবা ভারত-ভিতরে।
ইস্‌লাম মজিদ হোথা উচ্চ চূড়া তুলি,'
বিরাজে তাহার পাশে শ্রীবিন্দুমাধব ;
আদি-বিশ্বেশ্বর-স্থান করেছে মজিদ ;
খ্রীষ্টান ভজনালয়, শিবের মন্দির
রহে পাশাপাশি, কি উদার ধর্ম্মভাব !
বহু ধর্ম্ম বহু যুগে উদিত ভারতে,
সংঘর্ষণ-সমন্বয় বারাণসীধামে।

সুখের প্রবাস

(সাহিত্য, মাঘ ও ফাল্গুন ১৩১৪)

(১)

কথায় বলে,—'সৎসঙ্গে কাশীবাস, অসৎসঙ্গে সর্ব্বনাশ'। তাই পূজার ছুটীতে 'সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ' এই ঋষিবাক্যের অনুসরণ করিয়া 'দারাপুত্র' লইয়া কাশীবাস করিয়া আসিয়াছি। তবে সেটা ঠিক 'সৎসঙ্গ' বলিয়া আদালতে ধার্য্য হইবে কি না, বলিতে পারি না। সেই বৃত্তান্ত 'তীর্থ-দর্শন'-শীর্ষক প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতেও মনের আক্ষেপ সংবরণ করিতে না পারিয়া 'বারাণসী-দর্শনে' কবিতাও লিখিয়া ফেলিয়াছি! কিন্তু তরুণবয়স্ক পাঠক ধর্ম্মের কাহিনী বড় শুনিতে চাহেন না, তাই এবার গুরুগম্ভীর আলোচনা ছাড়িয়া দুটা স্ফূর্ত্তির কথা বলিব।

বলা বাহুল্য, পূজার ছুটীতে এক পক্ষকাল কাশীবাস করিয়া মনের খেদ মেটে নাই, আবার বড় দিনের ছুটীতে সেই পথের পথিক হইয়াছি। এবার আর 'শীতলা ঘাড়ে করিয়া' বাহির হই নাই; 'একা আসা একা যাওয়া, একের কর ভাবনা', মহাপ্রয়াণের এই সারতত্ত্ব বুঝিয়া একাই বাহির হইয়া পড়িয়াছি। সঙ্গে পথের সম্বল লোটাকম্বল ত আছেই, তাহার উপর পুরানেটিভত্ব-পরিচায়ক একটি প্রমাণসই বোঁচ্‌কা!. এবার ঠিক বিশ্বেশ্বর-দর্শন-লালসায় চিত্ত-চকোর চঞ্চল, ইহা বলা চলে না। বড়দিন উপলক্ষে কন্‌গ্রেস্, এগ্‌জিবিশান, কন্‌ফারেন্স প্রভৃতি 'হুশ' রগড়, হুলাথ মজা' উপভোগ করিবার জন্যই উৎসাহ ও ঔৎসুক্য বেশী। তবে সেটা আসল উদ্দেশ্যের ফাউস্বরূপ। দিন কয়েকের জন্য সংসারের ভাবনা,

কাযের ঝঞ্ঝাট, কুটুম্বভারচিন্তা, অর্থোপার্জন প্রভৃতি হইতে অব্যাহতি পাইয়া প্রাণটা একটু হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে, ইহাই মুখ্য উদ্দেশ্য। বিদেশী রাজার জাতির গৌরব-গর্ব্বের নিশানা কলিকাতা সহর ছাড়িয়া হিন্দুর ধর্ম্ম ও সমাজের কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করিলে 'বাঙ্মনঃ-কর্ম্মভিঃ' ম্লেচ্ছসংস্পর্শ-দোষের কিয়দংশে প্রায়শ্চিত্ত হয় ও তাহার দরুণ কতকটা চিত্তপ্রসাদলাভ হয়, ইহাও মনে মনে আঁচিয়াছিলাম। এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিয়া প্রসন্নচিত্তে কাশী-যাত্রা করিলাম।

গাড়ীতে আরোহীর অভাব নাই। অধিকাংশই কন্‌গ্রেসের 'প্রতিনিধি,' বা নিতান্তপক্ষে 'দর্শক' হিসাবে যাইতেছেন। এতগুলি শিক্ষিত ও স্বচ্ছল অবস্থার লোক দেশের কথা ভাবেন, ও তজ্জন্য পয়সা খরচ করিয়া সুদূর (?) 'পশ্চিমে' মাতৃযজ্ঞ নিষ্পাদন করিতে যাইতেছেন, তীর্থদর্শনরূপ কুসংস্কারের বাধা ঠেলিয়া ফেলিয়া দেশের শ্রেয়ঃসাধনে তৎপর, ইহা দেখিয়াও বুকটা দশহাত হইল। বুঝিলাম, ভারত-উদ্ধারের আর বিলম্ব নাই, সিদ্ধি অদূরবর্ত্তিনী—অন্ততঃ বক্তৃতায়। গাড়ীতে উঠিয়া দেখি, বঙ্গভঙ্গ, স্বদেশী আন্দোলন ও বয়কট প্রসঙ্গে মজ্‌লিস সরগরম, গোখ্‌লের নাম সকলের মুখে, এ আসরে পোড়া বিশ্বেশ্বরের নাম কেহ মুখেও আনে না, হেথায় তিনি বড় কল্কে পান না। কাযেই ভাবগতিক দেখিয়া 'কাশী যাচ্ছি কি মক্কা যাচ্ছি,' তাহা বড় ঠাহর করিয়া উঠিতে পারিলাম না। গাড়ীর ভিতরে চা পাঁউরুটি বিস্কুটের আতশ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইতেছে, আর বিলাতি-বর্জ্জন-ব্যাধির নূতন উপসর্গ বিড়ি সকলের মুখে রাবণের চিতার ন্যায় চিরজ্বলন্ত, গন্ধে দশদিক্ আমোদিত। (গন্ধটিও প্রকৃতিসাদৃশ্যে রাবণের চিতার কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে।) আরোহীদিগের তেজস্বিনী বক্তৃতায় নিদ্রাকর্ষণের আশা সুদূরপরাহত। বোধ হইল, ভাবী কন্‌গ্রেস্-মণ্ডপে বাহবা লইবার জন্য ইঁহারা আগে হইতেই আখ্‌ড়াই ভাঁজিতেছেন,

বিজেতার শাসন-কলঙ্ক প্রকটন করিয়া রাজপুরুষগণের মস্তকমুণ্ডন করিয়া দিবার জন্ম ইঁহারা এখন হইতেই রসনারূপ ক্ষুরে শাণ লাগাইতেছেন! বলা বাহুল্য, এই রাজনীতিবিশারদের দায়রায় শিক্ষাব্যবসায়ী নিরীহ (?) লেখক 'নিতান্ত সঙ্কোচ ক'রে, একধারে আছে স'রে,' ঠিক 'হংসমধ্যে বকো যথা'। যাক্, এ দৃশ্য বড় চটকদার নহে; অতএব এ দৃশ্যে এইখানেই যবনিকা-পতন হউক।

এইভাবে রাত্রিযাপনের পর আরায় কি বক্সারে, ঠিক মনে নাই, প্রভাত হইল। যাত্রীর ভিড়ে ও বক্তৃতার তেজে পৌষমাসের কন্‌কনে শীত টেরও পাওয়া যায় নাই। এখানে প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া হাত-মুখ ধুইয়া অনেকেই কিঞ্চিৎ জলযোগের ব্যবস্থা করিলেন। চা পাঁউরুটি ত আছেই, তাহার উপর 'বোঝার উপর শাকের আঁটিটা' হিসাবে কেহ গরম গরম জিলেপি, কেহ গরম গরম পুরী, (পুরু বলিয়া কি ইহার এইরূপ নাম-করণ? ভাষাতত্ত্ববিদের উপর মীমাংসার ভার থাকিল)—ও অনুপান-স্বরূপ ঢেঁড়সচচ্চড়ী ভোগ লাগাইলেন; আর কেহ বা গৃহিণীর কোমল-করে প্রস্তুত, সুতরাং বড় মোলায়েম লুচি-মোহনভোগ টীনের কৌটা হইতে বাহির করিয়া সেই সুদূর-প্রবাসেও অঙ্কশায়িনীর এই প্রীতির নিদর্শন অবলোকন করিতে করিতে রোমাঞ্চিত-কলেবর হইয়া (অলঙ্কারশাস্ত্রে ইহাকেই সাত্ত্বিকভাব বলে) অন্তরের ও বাহিরের ক্ষুধা মিটাইতে প্রবৃত্ত হইলেন; শীতকালের ভোরের কুয়াশায় বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু বোধ হইল যেন, প্রেমিকবরের দাড়ী বহিয়া দুই এক ফোঁটা প্রেমাশ্রু পড়িয়াছিল। যাক্, সখের ভ্রমণ-কাহিনী লিখিতে গিয়া এত প্রেমের বিবরণের বাড়াবাড়ি ভাল নহে।

একটু বেলা হইলে গাড়ী মোগলসরাই পঁহুছিল। তথায় গাড়ী বদল করা গেল। ট্রেনের অধিকাংশ লোকই কাশীযাত্রী, সুতরাং নূতন

গাড়ীতে 'ন স্থানং তিলধারণম্'; তবে আশ্বাসের কথা, এরূপ গর্ভযন্ত্রণা বেশীক্ষণের জন্ত নহে, যোগেযাগে একটা ষ্টেশন গেলেই কেল্লা ফতে হয়। দেখিতে দেখিতে গাড়ী গঙ্গার পুলের উপর দিয়া কাশী (রাজঘাট) ষ্টেশনে পঁহুছিল। পুলের ওধার হইতে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি গঙ্গার ধারে ধারে যতদূর চক্ষুঃ যায়, ততদূর কেবল সারি সারি অসংখ্য সোপানশ্রেণী, অগণিত দেবালয়চূড়া ও 'দ্বিতল ত্রিতল চৌতল ভবন' রহিয়াছে, এই মনোমোহন দৃশ্য অতৃপ্ত-নয়নে দেখিলাম; পূর্ব্ববারে এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া হৃদয়ে যে আনন্দ, যে বিস্ময়, যে ভক্তির উদয় হইয়াছিল, এবারও তাহার অণুমাত্র কম নহে। সহযাত্রীরা কচিৎ কেহ কেহ এই সৌন্দর্য্য এই grandeur লক্ষ্য করিলেন, কিন্তু অধিকাংশই প্রাতে বাল্যভোগের পর নূতন উদ্যমে রাজনীতিচর্চ্চায় ভরপূর, এই মনোলোভা শ্রীশোভার দিকে তাঁহারা দৃক্‌পাতও করিলেন না। যাঁহারা আবার এ পাকাপোক্তগোছের লোক, তাঁহারা সময় থাকিতে তল্পীতল্পা গুছাইতে লাগিলেন, সকলেই জিনিশপত্র নির্গমনদ্বারে আনিয়া হাজির করিলেন, দুইটি বস্তু একই স্থান অধিকার করিতে পারে না, এই জ্যামিতিক স্বতঃসিদ্ধ তাঁহারা তাড়াতাড়িতে ভুলিয়া গেলেন। কাশীষ্টেশনের লাগাও কন্‌গ্রেসের মহামণ্ডপ ও প্রতিনিধিবর্গের ডেরাডাণ্ডার স্থান। অনেকেই এখানে নামিলেন, তবে যাঁহারা কেবল দর্শকহিসাবে আসিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ইহার পরের ষ্টেশন শিক্‌রোলে নামিবেন, এইরূপ মন্তব্য জারী করিলেন। সহরের ঐ অংশে অনেক ইংরেজ-পছন্দ বাড়ী পাওয়া যায়। তজ্জন্যই তাঁহাদের এই সঙ্কল্প। আর বিশ্বেশ্বরের অতিসান্নিধ্য অনেকে নিরাপদ্ মনে করেন না। মানব-চিত্ত দুর্ব্বল, কি জানি, যদিই কোনও 'দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে' পাষাণবিগ্রহের উপর ভক্তির সঞ্চার হয়! শাস্ত্রে শস্ত্রপাণির সান্নিধ্য নিষিদ্ধ আছে, মহাকালের শূলদণ্ড প্রভৃতিও ত হাল আইনে শস্ত্রের সামিল!

সহযাত্রীদিগের নিকট কায়দামাফিক বিদায় লওয়া গেল। পাঠক-বর্গকে আশ্বাস দিতেছি, বিদায়দৃশ্য নিতান্ত মর্ম্মভেদী হয় নাই। প্রথমত দ্বিগুণ মূল্যে (কলিকাতার বাবুদের জন্য এইরূপ ডবল ফীর ব্যবস্থা সনাতন) এক্কা ভাড়া করিয়া হিতোপদেশের রাজহংসের ন্যায় 'সুখাসীন' হইলাম। অঙ্কে ফর্শীগড়গড়ার পরিবর্ত্তে বোঁচ্‌কা, ইহাতে balance ঠিক রাখার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইল। তবে জড়বিজ্ঞানের পরীক্ষিত সত্যগুলির উপর কখনই ভরাভর বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারি নাই, (বোধ হয় ছাত্র-জীবনে বিজ্ঞানপাঠের অল্পতাপ্রযুক্ত)—তাই শরীরের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া দক্ষিণ হস্তে দৃঢ়মুষ্টিতে এক্কার ডাণ্ডা চাপিয়া ধরিয়াছি, বামহস্ত বোঁচ্‌কার উপর সন্নিবিষ্ট; হিন্দুশাস্ত্রোক্ত শক্তির কোনও মূর্ত্তিরই এমনতর রূপকল্পনা নাই, তাহা জোর করিয়া বলিতে পারি। এক্কার প্রথম ধাক্কাতেই (শব্দগত ও অর্থগত কি সুন্দর মিল!) বুঝিলাম, গতবার স্ত্রীপরিজন আনিয়া কি ঝকমারিই করিয়াছিলাম, তাঁহাদের আব্রুরক্ষার খাতিরে পাল্কীগাড়ী ভাড়া করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম, সুতরাং পশ্চিমে আসার একটী প্রধান সুখ এক্কা-আরোহণ হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলাম। বাল্যকালে উৎসব-উপলক্ষে সখ করিয়া 'নাগরদোলা'য় চাপিয়াছি, (কলিকাতার ভাষায় 'চাপা' বলিলাম; 'চড়া' অপেক্ষা 'চাপা' কথাটি এখানে সঙ্গত, কেননা, ইহাতে উঠিলেই একটা কিছু চাপিয়া ধরিতে হয়!); গরুর গাড়ীর সুখে ত চিরাভ্যস্ত; বর্দ্ধমানের উটের গাড়ীর প্রত্যক্ষ-জ্ঞান না থাকিলেও কতকটা অনুমান করিয়া লইতে পারি; মহিষ, অশ্ব ও হাওদাবিহীন হাতীতেও যে না উঠিয়াছি, এমন নহে; কিন্তু এই নূতন যানের নামও যেমন শ্রুতিসুখদ, ইহাতে আরোহণের সুখও সেই অনুপাতে আরাম দায়ক। যেমন ধর্ম্মতত্ত্বে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্', তেমনি যানতত্ত্বেও এক্কা! ('একমেবা'র

অপভ্রংশ কি না, মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী বা বিদ্যাভূষণ মহাশয় বিচার করিবেন)।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত একা অবশ্য লেখককে রূপবর্ণনার অবকাশ দিবার জন্য দাঁড়াইয়া নাই। রূপকথায় বর্ণিত পক্ষিরাজ ঘোড়া ছুটিতেছে, টুপি-মাথায় মুসলমান গাড়োয়ান চাবুক কষিতেছে, একার ঝঙ্কার-শব্দে দিগ্‌বলয় মুখরিত হইতেছে, আর সৌভাগ্যবান্ আরোহী হেলিতে দুলিতে টলিতে টলিতে চলিতেছেন; যেখানে পথ অসমতল, তথায় একটি করিয়া বিষম ধাক্কা লাগিতেছে। পুরীতে সাগরের ঢেউ খাওয়া কি ইহা অপেক্ষা বেশী আরামদায়ক? এও ঠিক যেন সাগরোর্ম্মির আঘাতে উঠিতেছি, পড়িতেছি, তরঙ্গবেগে কখনও সম্মুখে, কখনও পশ্চাতে ঝুঁকিতেছি, আর সমুদ্রফেনের ন্যায় ধূলিকণা মস্তকের কেশে ও গাত্রবস্ত্রে পুঞ্জীকৃত হইতেছে। একবার মনে হইতে লাগিল, 'বেহারে বেঘোরে চড়িনু একা' ইত্যাদি গানটা ধরি, কিন্তু কণ্ঠ-ব্যায়াম দেখাইতে গিয়া হয় ত মুষ্টিবন্ধন শিথিল হইবে, ভারকেন্দ্র ঠিক রাখিতে পারিব না, আর মুখ খুলিলেই মুখবিবরে ধূলিপটল প্রবেশ করিয়া ভূগোলনির্দ্দিষ্ট 'ব-দ্বীপ'-গঠনের সহায়তা করিবে; অগত্যা গলা ছাড়িয়া গাহিতে পারিলাম না; 'মনে রৈলো সই মনের বেদনা' গানটি মনে মনে আবৃত্তি করিয়া দুধের তৃষ্ণা ঘোলে মিটাইলাম। সুখের বিষয়, শীতকালের রৌদ্র তত প্রখর নহে, বেলাও অধিক হয় নাই, খাদ্য-প্রাচুর্য্যে বত্রিশ নাড়ীর উপর গুরুভারও পড়ে নাই, সেই জন্য এই অর্দ্ধঘণ্টাব্যাপী অভিযান একেবারে অসহ্য হইয়া পড়ে নাই।

যেখানে প্রশস্ত রাজপথ ছাড়িয়া সঙ্কীর্ণ গলিতে প্রবেশ করিতে হইবে, তথায় এই অনভ্যস্ত যান হইতে বহু কসরতে নামিলাম; ধরাশায়ী হইলাম না, সে কেবল পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিবলে। এখান হইতে 'দু পা' গেলেই গন্তব্য স্থানে পৌছান যায়, কিন্তু কলিকাতার প্রথামত মুটিয়া

ডাকিলাম, বোঁচ্‌কাটি বহিবার জন্য। একাওয়ালা নিজে উদ্‌যোগী হইয়া মুটিয়া ডাকিয়া দিল; এই বিদেশ-বিভূমে ভিন্নধর্ম্মীর উপচিকীর্ষাবৃত্তি দেখিয়া হৃদয় উৎফুল্ল হইল, (তবে বখ্‌রার বন্দোবস্তও থাকিতে পারে) —কিন্তু মুটিয়া লোক, বাঙ্গালী, বিশেষতঃ কলিকাতাই বাঙ্গালী দেখিয়া যেন দোহাগাই পাইয়া সেই 'দু পা' যাইবার জন্য চারি আনা হাঁকিল। তীর্থস্থানে কৃচ্ছ্রসাধনই ধর্ম্ম, তীর্থক্ষেত্রে অর্থের অনেক প্রকারে সদ্‌ব্যয় করা যাইতে পারে, মনে ইত্যাদি নানারূপ সদ্ভাব ও সুচিন্তা উদিত হওয়াতে ও পয়সাও বিশেষ সস্তা নহে বুঝিয়া অগত্যা বোঁচ্‌কাটিকে কক্ষে লইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলাম। মুটিয়া আমার পানে অনিমিষনয়নে চাহিয়া রহিল। এ চাহনি ঠিক গোবিন্দলালের প্রতি ভ্রমরের চাহনি নহে, ইহা হলপ করিয়া বলিতে পারি। হায়! অধিক কচ্‌লাকচ্‌লি করিলে হিতে বিপরীত হইবে, অধিক নিঙ্‌ড়াইলে লেবু তিক্ত হইয়া যাইবে, শীকার হাতছাড়া হইবে, একথাটা বেচারা একবারও ভাবে নাই। ইহা-কেই বলে 'অতি লোভে তাঁতি নষ্ট'। যাক্‌ আর নীতিবোধের সূত্র আওড়াইব না। পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলাম, যাত্রিবৎসল একাওয়ালার মুখখানি বিষাদগম্ভীর; পরোপকারে বাধা পাইলে সজ্জনের হৃদয়াকাশ এইরূপই মেঘাচ্ছন্ন হয়। আহা! ইহাদের চিত্তসমুদ্রে কি ভীষণ ঝটিকাবর্ত্ত বহিতেছিল, তাহা দার্শনিক ভিন্ন কে বিশ্লেষণ করিবে? যাহা হউক, সে রাত্রে এই দুইটী সেবাধর্ম্মধারীর সুনিদ্রা হইয়াছিল কিনা সে ভাবনায় লেখকের নিদ্রার কোনও ব্যাঘাত হয় নাই, পাঠক মহাশয়েরও বোধ হয় বিশেষ মাথাব্যথা হইবে না।

বাঙ্গালীটোলায় এক আত্মীয়ের বাটীতে অধিষ্ঠান করিলাম। তাঁহাদের তখন বাজারের বেলা। পূর্ব্বেই আমার আগমন-সম্ভাবনা পত্রদ্বারা জ্ঞাপন করিয়াছিলাম; তাঁহারা সাদরে সহাস্য-বদনে আমাকে

গ্রহণ করিলেম। (কাশীবাসী এরূপ উপদ্রবে অভ্যস্ত।) যথাসময়ে স্নান-আহার করিয়া পথের কষ্ট দূর করিবার অভিপ্রায়ে ও পূর্ব্বরাত্রের ক্ষতিপূরণ-মানসে মধ্যাহ্নে নিদ্রার সুকোমল ক্রোড়ে আশ্রয় লইলাম। আত্মীয়েরাও "মহাজনোযেন গতঃ স পন্থাঃ" এই ঋষিবাক্যের অবমাননা করিলেন না। নিদ্রাভঙ্গে বাটীর স্ত্রীলোকদিগের নিকট কাণাঘুষায় টের পাওয়া গেল যে, আমাদের সকলের সমবেত নাসিকাগর্জ্জনে বাগ্‌বাজারের অবৈতনিক কন্‌সার্টপার্টিকেও পরাভূত করিয়াছিল।

(২)

এই প্রবন্ধে কাশীর আত্মীয়গণের কথা মাঝে মাঝে তুলিতে হইবে অতএব তাঁহাদের একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া, বোধ হয়, নিতান্ত অনাবশ্যক বিবেচিত হইবে না। পাঠক ও লেখকের মধ্যে হৃদ্যতা জন্মিলে লেখকের আত্মীয়জনের সঙ্গেও পাঠকের আত্মীয়তা জন্মিয়া যায় সুতরাং এরূপ বিবরণ নীরস ও অপ্রাসঙ্গিক বোধ হয় না।

বাড়ীর কর্ত্তাটি সম্বন্ধে ঠাকুরদাদা; সম্পর্ক নিতান্ত দূর নহে দশ রাত্রের জ্ঞাতি, দেশে পুরুষানুক্রমে এক ভিটায় বাস। অবস্থা পূর্বে ভালই ছিল। কিন্তু নূতন করিয়া অর্থাগমের কোন উপায় না থাকাতে অনটন ঘটে, শেষে পত্নীবিয়োগের পর শিশু পুত্রকন্যাদিগকে লইয়া কয়েক বৎসর হইতে কাশীবাসী হইয়াছেন। এখন জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্রদ্বয় উপযুক্ত হইয়াছে এবং কিছু কিছু আনিতেছে; তাহাতেই অন্নপূর্ণার কৃপায় এক প্রকার চলিয়া যাইতেছে। আজকালকার দিনে যেরূপ সৌখীনতা বাড়িয়াছে, তাহাতে অবস্থা সচ্ছল বলা যায় না। তবে গ্রাসাচ্ছাদনের বিশেষ কষ্ট নাই। উভয়েই বিবাহিত, জ্যেষ্ঠের একটি পুত্রসন্তানও হইয়াছে। কনিষ্ঠ পুত্রটি বালক, পড়াশুনা করে। কন্যাদ্বয় শ্বশুরালয়ে। পুত্র, পুত্রবধূ ও শিশুপৌত্র লইয়া ঠাকুরদাদা মহাশয়

শেষ-বয়সে একপ্রকার সুখশান্তিতেই দিন কাটাইতেছেন। অনেক দিন হইতে তাঁহার অনুরোধ, একবার সপরিবারে কাশী গিয়া তাঁহার আতথ্য-স্বীকার করি। অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া পূজার ছুটিতে পুত্রকলত্র-সমভিব্যাহারে তাঁহার স্কন্ধে চাপিয়াছিলাম, এবং তাঁহার আদর ও যত্ন ভুলিতে পারি নাই বলিয়া এ যাত্রায়ও তাঁহার আশ্রয়ে আসিয়া উঠিয়াছি। তাঁহার ও তাঁহার পুত্রদিগের সৌজন্যে প্রবাসের কোনও কষ্ট পাইতে হয় নাই। পৈতৃক ভিটায় যেরূপ সম্প্রীতির সঙ্গে বাস করিতাম, বহুকাল পরে আবার যেন সেই দিন ফিরিয়া আসিল। একত্র আহার, একত্র শয়ন, নানারূপ সুখ-দুঃখের কথাবার্ত্তায় একত্র কালযাপন করিয়া উভয়-পক্ষই পরম সুখী হইলাম। ইহাকে 'সুখের প্রবাস' বলিব না ত কি বলিব ? *

(৩)

মাতৃপূজার তিন দিন প্রাতর্ভ্রমণ বা সান্ধ্যভ্রমণের তত সুবিধা হইত না। সে কয়দিন শীতও দারুণ পড়িয়াছিল, প্রাতে শয্যা ত্যাগ করিতে একটু বিলম্ব হইত। উঠিয়াই বেচারা বধূদ্বয়ের উপর কিঞ্চিৎ অত্যাচার করিয়া সকাল সকাল ভাতের তাগাদা এবং ১০টা না বাজিতেই তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া লইয়া নাকে মুখে চারিটি গুঁজিয়াই কন্‌গ্রেস্-মণ্ডপে যাত্রার উদ্‌যোগ। আহারান্তে এক্কায় আরোহণ কিরূপ সুখের, ভুক্তভোগিমাত্রেই জানেন। এক্কার দরও এ কয়দিন খুব চড়া, তবে ইহাতে কেহ কুণ্ঠিত নহে; এক্কাওয়ালাকে ষোল আনা দক্ষিণা দিয়া

* এক্ষণে ঠাকুরদাদা মহাশয়ের ৺কাশীপ্রাপ্তি হইয়াছে। এখনও কাশী গেলে তাঁহার পুত্রগণ তেমনই যত্ন করেন, কিন্তু ঠাকুরদাদা মহাশয়ের অভাবে মনে বড়ই দুঃখ হয়।—(দ্বিতীয় সংস্করণের টিপ্পনী।)

মাতৃসেবার জন্য কিছু ত্যাগস্বীকার করিলাম, সকলের মনে যেন এইরূপ ভাব। এত সস্তায় মাতৃভূমির কল্যাণ সাধন করিয়া যদি মনের তৃপ্তি হয়, মন্দ কি? সভাস্থলে পঁহুছিয়া টিকিট কিনিয়া ভিড় ঠেলিয়া যথাযোগ্য আসনে অধিষ্ঠান এবং উৎকর্ণ ও উদ্‌গ্রীব হইয়া বক্তৃতা-শ্রবণ, এ কয়দিনের নিত্যকর্ম্ম হইয়াছিল।

প্রথম দিনে সভাপতি অধ্যাপক গোখ্‌লের সুদীর্ঘ বক্তৃতায় লর্ড কর্জ্জনের সঙ্গে মোগল-সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবের (ইংরাজী 'জেড্' ও আর্‌বী 'জাল্' অক্ষরের শব্দসাদৃশ্যও প্রণিধানযোগ্য) তুলনাটা খুব জমিয়াছিল। তবে নূতন ভারতসচিব-নিয়োগে কেতাবী বিদ্যার জোরে তিনি যে সকল আশার বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহাতে সভাস্থ সুধীবর্গের কি হইয়াছিল জানি না, আমার ত বিশেষ আস্থা হয় নাই। আমার ধ্রুব বিশ্বাস, ভারতের ভাগ্যনিয়ন্তা যুধিষ্ঠিরই হউন আর দুর্য্যোধনই হউন, ভারত 'যে তিমিরে, সে তিমিরে'ই থাকিবে। তবে এ সব বড় বড় রাজনীতির কথা, শিক্ষাব্যবসায়ী ক্ষুদ্রপ্রাণ লেখক এ সবের কি বুঝিবেন? এ সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করাই ধৃষ্টতা। (গোখ্‌লে মহোদয়ও কিন্তু গোড়ায় শিক্ষাব্যবসায়ী।)

অন্যান্য দিনের বক্তৃতাও জমিয়াছিল ভাল; বক্তৃতার বন্যায় দেশের আসল কাযের ফসল হউক বা না হউক, ইহাতে যে হৃদয়ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা সাধিত হয়, তাহা অস্বীকার করা যায় না। ইহাতে যথেষ্ট উত্তেজনা ও উদ্দীপনা হয় (যদিও তাহা সাময়িক), ভারতের চতুঃসীমা হইতে সমবেত শত শত শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয় একসুরে বাজিয়া উঠে, এবং তাহার ফলে জাতীয় একতা সংসাধিত হইবার সহায়তা করে, ইহা নিঃসন্দেহ। ইহাও জাতীয় শিক্ষা-দীক্ষার একটা ক্রম তাহা বলিতেই হইবে। উর্দ্দু বক্তৃতা শুনিয়া প্রকৃতই রোমাঞ্চ হইয়াছিল, যদিও তাহার

এক বর্ণও বুঝি নাই। তবে এইটুকু বুঝিয়াছিলাম যে, স্বদেশী সমাজে ভাব-আদানপ্রদানের জন্য বিদেশী ভাষার সাহায্য না লইয়া এইরূপ একটা তেজাল স্বদেশী ভাষা সার্ব্বজনীন করিয়া তুলিলে কাজটা সহজে, স্বাভাবিক উপায়ে ও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে। যাক্, একভাষা বা একাক্ষর-সমস্যার পূরণ করিবার অভিপ্রায়ে বর্ত্তমান প্রবন্ধকার লেখনীধারণ করেন নাই।

দৈনন্দিন বক্তৃতা ফুরাইলে ফিরিবার পালা। বক্তৃতা শ্রবণ করিবার কৌতূহলের প্রবল উৎসাহে গাঁটের কড়ি বাহির করা যতটা সহজ হইত, উত্তেজনা ফুরাইলে 'শাদা চোখে' কাযটা তত সহজ হইয়া উঠিত না। আর ওজস্বিনী বক্তৃতাপরম্পরা শ্রবণ করাতে মনটা এত চড়াসুরে বাঁধা হইত, হৃদয়ে স্বাধীনতার অনল এতই জ্বলিয়া উঠিত, দেশের জন্য একটা কিছু করিয়া ফেলি, এই সংকল্পে কর্ম্মশীল প্রবৃত্তি এতই সজাগ হইত যে, সে সময়ে একারআশ্রয় গ্রহণ করিলে নিতান্তই উপহাস্য হইয়া পড়িত, যাহাকে ইংরেজীতে বলে, It is one step from the sublime to the ridiculous; অগত্যা পদব্রজেই পাড়ী দেওয়া যাইত। এরূপ পরিশ্রমে শক্তিপ্রয়োগের কণ্ডূয়ন কতকটা নিবৃত্ত হইত। তাহা ছাড়া, এরূপ অঙ্গচালনায় সারাদিনের আটাকাটি বাঁধনের পর শরীরের আড় ভাঙ্গিত, এবং ভিড়ের মধ্যে বদ্ধ বায়ুর যে বিষ শরীরে প্রবেশ করিয়াছিল, সন্ধ্যাকালীন নির্ম্মল বায়ু-সেবনে তাহার দোষটা কাটিয়া যাইত। অতএব শারীরিক, মানসিক, আর্থিক, এই তিন দিক্ হইতেই যে ব্যবস্থাটি সঙ্গত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে বোধ করি আর দ্বিমত নাই। বাসায় ফিরিতে রাত্রি হইত। তখন জঠরাগ্নির তেজ রাজনীতিক স্বাধীনতা-বহ্নিকেও পরাস্ত করিয়াছে, যথাসম্ভব জলখাবারের সাহায্যে অগ্নিনির্ব্বাণ করা যাইত; পরে যথাসময়ে রাত্রিভোজনান্তে সুনিদ্রার

ব্যবস্থা। দিনের শ্রান্তি-ক্লান্তির পরে তদ্‌বিষয়ে কোনও ত্রুটি হইত না। শীতটা যদিও কন্‌কনে, কিন্তু বক্তৃতার গরম ও ভিড়ের গরম ছুটিতে সমস্ত রাত্রিই যাইত, কাযেই শীতটা তত লাগাইত না।

বঙ্গদেশে এক এক বৎসর দুর্গোৎসব তিন দিনে শেষ না হইয়া চারি দিনে শেষ হয়। এবার বোধ করি বঙ্গদেশের হাওয়া লাগিয়া এই হাল ফ্যাশানের মাতৃপূজায়ও সেই ব্যবস্থা হইয়াছিল! লেখকের কিন্তু তিন দিনের পূজার আড়ম্বরেই নেত্রশ্রোত্রের যথেষ্ট পরিতোষ হইয়াছিল, চতুর্থ দিনে পূজাস্থলে যাইবার আর প্রবৃত্তি হয় নাই।

সমাজসংস্কার, ধর্ম্মসংস্কার প্রভৃতি উচ্চ অঙ্গের তত্ত্ববিচার এই অধমের ক্ষুদ্রশক্তির অতীত বুঝিয়া কন্‌গ্রেসের লেজুড় সোশ্যাল কন্‌ফারেন্স প্রভৃতিতে উপস্থিত হইবার প্রয়োজন অনুভব করি নাই। তবে একদিন স্বদেশী প্রদর্শনীক্ষেত্রে গিয়া এখনও 'দীন পরাধীন' ভারতের যে শিল্প-নৈপুণ্য আছে, তাহার নিদর্শন-দর্শনে নয়ন-মন সার্থক করিয়া আসিয়াছি। এদিন আর আমি একা নহি আমার আর এক জন আত্মীয় কলিকাতায় যুবরাজের শুভাগমনের উৎসব দেখা সাঙ্গ করিয়া কাশীতে আসিয়া যুটিলেন, এবং পুত্রকন্যা ও পাচক ভৃত্য লইয়া এগ্‌জিবিশান দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কাশীস্থ আত্মীয়েরাও সেই রায়ে রায় দিলেন। কাযেই দলে পুরু হইয়া যামিনি টিকিট লইয়া প্রদর্শনী-দ্বারে উপস্থিত হইলাম। বলা বাহুল্য, পূর্ব্ব তিন দিন ফাঁকা বক্তৃতা শুনিয়া মনের যে স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল, এদিনে ভারতশ্রমজাত শিল্পসম্ভার দেখিয়া তদপেক্ষা অনেক অধিক স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল। কথা ও কাযের প্রভেদে আনন্দের এরূপ প্রভেদ। এদিন যাতায়াতেও যথেষ্ট আরাম হইয়াছিল। মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর নৌকাযোগে দশাশ্বমেধঘাট হইতে রাজঘাটে আসা গিয়াছিল; ইহাতে ভোজনের অব্যবহিত পরে পরিপাকক্রিয়ার কোনও

ব্যাঘাত ঘটে নাই। সায়ংকালে নৌকাপথে ফিরিতে ততোঽধিক আরাম হইয়াছিল। প্রশস্ত প্রদর্শনীপ্রাঙ্গণে ঘুরিয়া ঘুরিয়া যে ক্লান্তি হইয়াছিল তাহার সম্পূর্ণ অপনোদন হইয়াছিল, এবং সেই সুরধুনী-সলিল-সংস্পর্শ শীতল-সান্ধ্য-সমীরণ-সেবনে শরীর স্নিগ্ধ হইয়াছিল। ক্ষুধার বিলক্ষ উদ্রেক হওয়াতে, ফিরিয়া আসিয়া আত্মীয়গণের অন্নব্যঞ্জনের যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করা গেল। এ কয়দিন রাত্রে সুনিদ্রা ত ব্রাহ্মণভোজনান্তে দক্ষিণার ন্যায় স্বতঃসিদ্ধ।

(৪)

পর দিন প্রাতঃকাল হইতে স্বাধীনভাবে বেড়াইবার অবসর পাইলাম আর মায়ের ডাকে এক স্থানে মিলিবার উপরোধ নাই। কয়েক দিন একায় বসবাস করিয়া কেমন একটু প্রাণের টান হইয়া পড়িয়াছিল; এই যানের নানা অসুবিধা-সত্ত্বেও রোজ একবার করিয়া না চড়িলে মনট কেমন খুঁৎ খুঁৎ করিত। ইহাকেই বলে মায়ার বন্ধন। তবে এটাকে খাঁটি স্বদেশী ভাব বলিয়া পাঠক-বর্গ যদি বাহবা দেন, তাহা হইলে ত কথাই নাই। যাহা হউক, দু' দিনের আলাপী একার মমতায় একদিনের তরেও আশৈশবসঙ্গী চরণযুগলের অনাদর করি নাই, তাহাদিগকে তাহাদের ন্যায্য দাবী দিতে কোনও দিনই কুণ্ঠিত হই নাই। এইরূপ সমদর্শিতাই মহত্তের লক্ষণ!

পথে-ঘাটে সর্ব্বত্রই চেনা মুখ; কলিকাতার অর্দ্ধেক লোক সে কয়দিন কাশীতে অবস্থিতি করিতেছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহার মধ্যে কেহ কেহ সুপরিচিত, কেহ কেহ অর্দ্ধপরিচিত, মুখ চিনি, কিন্তু নাম জানি না; (সেটা ত আধুনিক সভ্যতার একটা বিশিষ্ট উপসর্গ) যাঁহারা একেবারেই অপরিচিত, তাঁহাদিগকেও যেন পূর্ব্বে কোথা দেখিয়াছি দেখিয়াছি মনে হইল। আর ছাত্রদিগকে ত (বর্ত্তমান

ভূত উভয় প্রকারই আছে) 'যে দিকে ফিরাই আঁখি, পাই দেখিতে'। ছড়িঘড়ি-দাড়ী-শোভিত, বিরাট্ আলষ্টারলম্বিত, শালের কম্ফর্টারজড়িত কলিকাতার বাবুদিগের সবুট-পদবিক্ষেপে কালভৈরবরক্ষিত পুরী সে কয়দিন টলটলায়মান হইয়াছিল।

দশাশ্বমেধঘাটের পার্শ্ববর্তী তরীতরকারীর বাজারে একবার করিয়া হাজিরা দেওয়া সকলেরই প্রাতভ্রমণের একটা অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আত্মীয়ের গৃহে অতিথি হওয়াতে বেবাক দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার সম্পন্ন হইলেও, বাজারে যাওয়ার প্রলোভন এড়াইতে পারি নাই। সখের সওদাও যে দুই এক দিন না করিয়াছি, এমন নহে। বাস্তবিক, সেই রাশীকৃত ফুলকপি, কড়াইসুঁটি, মূলা, বেগুন, কুল, পেয়ারা দেখিয়া রিক্তহস্তে গৃহে ফেরা জিতেন্দ্রিয় পুরুষ ছাড়া আর কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। মূল্যও যার-পর-নাই অল্প, কলিকাতার মূল্যের তুলনায় ত এক রকম বিনামূল্যের ব্যবস্থা। তবে কাশীর বাসিন্দাগণ এ কয় দিন কলিকাতার বাবুদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছিলেন, বাজার গরম হওয়াতে তাঁহারা বড়ই অপ্রসন্ন। আমিও ক্রেতার দলে মিশিয়া দরচড়ানর কার্য্যে সহায়তা করাতে (যাহাকে দণ্ডবিধি আইনে Aiding and abetting বলে) আত্মীয়গণের কাছে মৃদু ভৎসনা খাইয়াছি। যাহা হউক, স্থানীয় লোকের ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করিয়া কলিকাতার বাবুরা বড় বড় রুই কাৎলা ও ফুলকপি লইয়া ঝাঁকা বোঝাই করিতেছেন ও দানশৌণ্ডতার পরিচয় দিয়া ইতরভদ্র সকলকেই চমৎকৃত করিতেছেন। ইলিশমাছও হেথায় অপর্য্যাপ্ত, মূল্যও অতি সামান্য, এক পয়সা দু'পয়সায় ডিমভরা ইলিশ, লোভসংবরণ অসম্ভব। তবে সেগুলি রসায়ন-শাস্ত্রের অম্লজান জলজান প্রভৃতির ন্যায় স্বাদহীন, গন্ধহীন, তাহা এই আমিষ "দিল্লীকা লাড্ডু"র খরিদদারগণ 'পিছে মালুম' করিয়াছিলেন। যাক্, সে

ত 'ভূতে পঞ্চভূতি'র কথা। কলিকাতায় ফিরিবার সময় কাশীর বাজার উজাড় করিয়া ঝুড়ি-বোঝাই ফুলকপি কুল পেয়ারা লইয়া সকলেই গাড়ীতে উঠিয়াছিলেন, এবং রেলওয়ে কোম্পানীকে যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিয়া কাশীভ্রমণ-পরিচ্ছেদের সমাপ্তি করিয়াছিলেন।

কার্‌মাইকেল লাইব্রেরী-নামক সাধারণ পুস্তকাগারে একবার করিয়া 'ধন্না' দেওয়াও প্রায় সকলেরই প্রাতর্ভ্রমণ বা সান্ধ্যভ্রমণের একটা অঙ্গ ছিল। এখানে আসিলে দৈনিক সংবাদপত্রগুলির সারসংগ্রহ করা যায়; এই উদ্দেশ্যে এখানে হাজিরা দেওয়া। কথায় বলে, ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে; সেইরূপ এখনকার সভ্য মানব দুদিন চারদিনের জন্যও যেখানে যায়, সেখানেও দিনকার দিন দুনিয়ার সংবাদ না জানিলে মনের খুঁৎখুঁতুনি যায় না। পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখাশুনা ও মেলামেশাও এই পুস্তকাগারে আসিবার আর এক উদ্দেশ্য। মানুষ নূতনের মধ্যেও পুরাতনের মায়া একেবারে কাটাইতে পারে না।

কলিকাতায় ইড্‌ন্‌-গার্ড্‌ন্‌, বীড্‌ন্‌-গার্ড্‌ন্‌ বা গোলদীঘি, লালদীঘি, হেদুয়া প্রভৃতি স্থানে বায়ুসেবন যাঁহাদের চিরাভ্যস্ত, তাঁহারা স্থানীয় পার্কে যাইতেন। সহরের দুই প্রান্তে দুইটি পার্ক আছে; তবে সেগুলি তত প্রশস্ত ও পরিপাটী নহে, একটি ত হালে তৈয়ার হইতেছে। যাহা হউক, কাশীতে আসিয়া অতি অল্প লোকেই পার্কে বায়ুসেবন করিতে উৎসুক। গঙ্গার ঘাটে ঘাটে ভ্রমণই এখানকার বিধি। গঙ্গার বাঁধাঘাটে অনেকে বৈকালে বসিতেন, সন্ধ্যা-আহ্নিক করিতেন এবং সাধুদণ্ডীদিগের শাস্ত্রালাপ শুনিতেন। ইহার মধ্যে দশাশ্বমেধঘাটে একটি মন্দিরের চাতাল বসিবার পক্ষে সর্ব্বোত্তম স্থান। এ সব স্থানে সাধারণতঃ প্রবীণ লোকই আসিতেন; উদ্যমশীল যুবক ও প্রৌঢ়েরা এদিক্ সেদিক্ বেড়াইতে ও পাঁচ রকম নূতন জিনিশ দেখিতে ব্যস্ত থাকিতেন। যাক্, কাশীপ্রবাসী বাঙ্গালী-

সম্প্রদায়ের দৈনন্দিন জীবনের ইতিহাস লেখার ভার আমার উপর কোনও সাহিত্যসমাজ দেন নাই। ও সব কথা ছাড়িয়া দিয়া অতঃপর নিজের কাহিনীই বলি।

প্রাতে উঠিয়া যে দিকে দুই চক্ষুঃ যায়, সেই দিকে বাহির হইয়া পড়িতাম। বৈকালেও সেই নিয়ম। সাহিত্যপরিষদের উদ্যোগে প্রকাশিত 'কাশীপরিক্রমা'খানি সঙ্গেই ছিল; কাশীর অন্ধিসন্ধি সম্বন্ধে ইহা হইতে অনেক কথা জানিয়াছিলাম। দেবালয় দেখিবার ইচ্ছা হইলে এখানি ডাইরেক্টরীর কায করিত। একদিন অজানা পথে ঘুরিতে ঘুরিতে অসিসঙ্গমে গিয়া উপস্থিত হইলাম, তথায় জগন্নাথদেব ও নৃসিংহ-দেবের দর্শনলাভ করিলাম। আর একদিন অন্য দিকে যাইতে যাইতে কপির ক্ষেতের সৌন্দর্য্য ও সৌরভ (!) উপভোগ করিতেছি বলিয়া মনকে আশ্বস্ত করিতেছি, এমন সময় বটুকনাথ, কামাখ্যা ও বৈদ্যনাথের দর্শন-লাভ ঘটিয়া গেল। আর একদিন ঠাকুরদাদা মহাশয়কে লইয়া সাজিয়া গুজিয়া বরুণাসঙ্গম ও আদিকেশববিগ্রহ দেখিতে রওনা হইলাম। রাজঘাট ষ্টেশন পর্য্যন্ত একায় গিয়া অবশিষ্ট পথটুকু পদব্রজে যাওয়া গেল। পথও বেশী নহে, প্রোগ্রামের বাহিরে খড়্গবিনায়ক প্রভৃতি আরও দুই একটি দেবদর্শন ঘটিল। ঠাকুরদাদা মহাশয় যদিও কাশীবাসী, তথাপি এ অঞ্চলে তাঁহার গতিবিধি ছিল না; নূতন দেবস্থান দেখিয়া তাঁহার বড় আনন্দ হইল, এবং আমার কল্যাণে এই সৌভাগ্য হইল বলিয়া আমাকে বহুতর আশীর্ব্বাদ করিলেন। ইহা ছাড়া বিশ্বেশ্বর, অন্নপূর্ণা, কেদারেশ্বর, দুর্গাবাড়ী, মেনকার বাড়ী, গুরুধাম, সঙ্কট-মোচন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ দেবদেবী ও দেবালয়-দর্শন, বিন্দুমাধব-দর্শন ও 'বেণীমাধবের ধ্বজা'য় আরোহণ (বাস্তবিক এটি মুসলমান মস্‌জীদের উপর নির্ম্মিত 'মনুমেণ্ট') ও অন্যান্য বহুদেবতা ও দেবালয়-দর্শন নিত্যকর্ম্মের মধ্যে

হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার মধ্যে গোপালমন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তথায় দেবতার ব্যবহারের আস্‌বাবগুলি বহুমূল্য ও সুদৃশ্য ; দিনের মধ্যে অনেকবার দেবতার আবাহন আরতি প্রভৃতি হয়, সে দৃশ্যও অতি মনোহর। কাশীধামের কোনও না কোনও অংশে হিন্দু-পুরাণোক্ত সকলরূপ দেবতারই পীঠস্থান আছে। ইহাতে বারাণসী হিন্দুস্থানের সংক্ষিপ্তসার, সকল সম্প্রদায়ের হিন্দুর কেন্দ্রস্থলীয় তীর্থ, তাহা বেশ মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিলাম। এখানে ভারতবর্ষের বিভিন্নপ্রদেশের বিভিন্ন আকৃতির ও বিভিন্ন পরিচ্ছদের নরনারী দেখিয়াও এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হইল। দেব-দর্শনের প্রসঙ্গে বিশ্বেশ্বরের আরতির কথা লিখিলাম না দেখিয়া অনেক পাঠক হয় ত বিস্মিত হইবেন। পূর্ব্ব-প্রবন্ধেই বলিয়াছি, ঘুষ বা ঘুষির সাহায্য ব্যতীত ভিড় ঠেলিয়া এই উদাত্তভাবোদ্দীপক দৃশ্য দেখা অসম্ভব, সুতরাং এ দৃশ্য দেখা আমার ভাগ্যে ঘটে নাই।

কাশী হইতে কয়েক মাইল দূরে সারনাথ-নামক স্থানে বৌদ্ধস্তূপ ও বৌদ্ধবিহারের ধ্বংসাবশেষ ও সারনাথেশ্বর-নামক শিববিগ্রহ কৌতূহলের সহিত দর্শন করিয়াছি, এবং সন্নিকটবর্ত্তী আধুনিক বৌদ্ধসম্প্রদায়ের ক্ষুদ্রগৃহে অল্পক্ষণের জন্য বিশ্রাম করিয়াছি। তবে তাহার বিবরণ দিতে রাজী নহি। প্রত্নতত্ত্বের ধার-করা বিদ্যা জাহির করিয়া বাহাদুরী লইতে চাহি না। *

অনেকক্ষণ ধরিয়া দেবদেবী ও দেবালয়ের কথা বলিলাম। পাঠক-মহাশয় বুঝিয়া না বসেন, লেখক নিতান্ত সাত্ত্বিকপ্রকৃতির লোক, প্রত্যহ

* এক্ষণে এখানে প্রশস্ত প্রদর্শনীগৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে।—(দ্বিতীয় সংস্করণের টিপ্পনী।) পাঠক-সম্প্রদায়কে এই প্রসঙ্গে শ্রীমান্ বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্-এ কর্তৃক নব-প্রকাশিত 'সারনাথের ইতিহাস' পাঠ করিতে অনুরোধ করি।—(তৃতীয় সংস্করণের টিপ্পনী।)

'যাত্রা' করাই লেখকের সাধু উদ্দেশ্য! ইহা ভাবিলে লেখকের উপর অযথা পক্ষপাত (বা মতান্তরে অযথা দোষারোপ) করা হইবে। উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণে যে দিন সম্মুখে যাহা পড়িয়াছে, তাহাই দেখিয়াছি; তবে তীর্থক্ষেত্র বারাণসীধামে দেবালয়ের প্রাচুর্য্য, কাযেই এগুলি দেখা আপনা হইতেই ঘটিয়া পড়িয়াছে। অবশ্য, এগুলি দেখিলে পুণ্য না হউক, অন্ততঃ কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দেওয়াতে পাপক্ষয় ও আত্মার অধোগতি হইল, সে বিকট গোঁড়ামি লেখকের নাই।

দেবতার নাম-গন্ধ নাই, এরূপ দর্শনযোগ্য স্থান বা জিনিশ দেখিতেও কসুর করি নাই। লেখক যখন শিক্ষাব্যবসায়ী, তখন তিনি যে ভারত-হিতৈষিণী ব্রহ্মচারিণী শ্রীমতী এনি বেসান্টের স্থাপিত কলেজ স্কুল যন্ত্রাগার ছাত্রাবাস ও তৎসংলগ্ন প্রশস্ত ক্রীড়ার মাঠ, এবং সরকারী কুইন্‌স্ কলেজ বার বার করিয়া দেখিয়াছেন, তাহা বলা বাহুল্য। কলেজ দুইটির একটি প্রাচীন, অপরটি আধুনিক। আধুনিক কলেজটি প্রশস্ত, প্রতিষ্ঠাত্রীর কর্ম্মশীলতা ও ভারতহিতৈষণার প্রকৃষ্ট পরিচয় দেয়; কিন্তু স্থাপত্যশিল্পের দিক্ হইতে দেখিতে গেলে কুইন্‌স্ কলেজ, বিশেষতঃ কলেজের হলঘর অতুলনীয়। শুনিয়াছি, ভারতবর্ষের অন্য কুত্রাপি এরূপ সুদৃশ্য কলেজ নাই। বাড়ীটি যেন ছবিখানি। এরূপ স্থানের বাতাসেও যেন বিদ্যাচর্চ্চার সহায়তা করে। হায়! ইহার তুলনায় আমাদের কলিকাতার কলেজগুলি (খাস প্রেসিডেন্সি কলেজও বাদ পড়ে না) কি কুৎসিত! বিদ্যার প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মাইবার জন্যই যেন সেগুলির সৃষ্টি। যাক্, ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখিতে গিয়া জাতব্যবসার কথা উঠিয়া পড়িল।

কলেজ দুইটি ছাড়া আরও দুইটি দর্শন-যোগ্য জিনিশ আছে; সে দুইটি ইঁদারা, নাম 'গৈবী'। এই ইঁদারার জল খাইলে না কি পরিপাক-শক্তি আশ্চর্য্যরূপে বৃদ্ধি পায়। এইজন্য অনেক অম্লরোগী কলিকাতার

বাবু কাশীপ্রবাস-কালে প্রত্যহ গৈবীর ধারে বসিয়া ঘোঁটা লোটা গৈবীর জল পান করেন অথবা কলসী ভরিয়া এখানকার জল লইয়া যান এবং যথেচ্ছ পান করেন। ইহার মধ্যে যেটি বেশী প্রসিদ্ধ, সেটি শ্রীমতী এনি বেসাণ্টের কলেজ ছাড়াইয়া মাইল খানেক তফাতে; স্থানটি নিরালা ও পাহাড়িয়া; দ্বিতীয়টিও নিরালা জায়গায়, কিন্তু চতুর্দ্দিকের দৃশ্য সুন্দর নহে। উভয় স্থানে কুস্তির আখ্ড়া আছে, সাধু-সন্ন্যাসীও থাকেন—ইঁদারার নিকট জুতা পায়ে যাইতে নিষেধ! তথায় গেলেই সাধুর চেলারা জল তুলিয়া আল্‌গোছে মুখে ঢালিয়া দেয়, যত ইচ্ছা পান করিতে পার। হাল ফ্যাশানের লোকের পক্ষে এটা বড় ঝক্‌মারি; সঙ্গে ঘটী-গেলাস লইয়া গেলে আর এ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। চেলাদিগকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কিছু দিলে তাহা সাধুসেবায় নিয়োজিত হয় ও দাতার দানও সার্থক হয়। আমরা কয়েক জনে উভয় স্থানেই গিয়াছিলাম, এবং উদর পূরিয়া জল পান করিয়াছিলাম। তবে বিশেষ কি উপকার হইয়াছিল, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। হইতে পারে, ইউরোপে স্থানে স্থানে যেরূপ mineral waters আছে, সেইরূপ (মুঙ্গেরের নিকটবর্ত্তী সীতাকুণ্ডের জলের ন্যায়) এই জলেরও উপকারিতা আছে। পশ্চিমের অনেক ইঁদারার জলই নাকি সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর।

হজ্‌মী জলের কথা বলিয়া কাশীর খাদ্যসুখের কথা না বলিলে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে। ফুলকপি, কড়াইসুটি, মূলা, বেগুন, কুল, পেয়ারা ও রুই, কাৎলা, ইলিশের কথা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু কলিকাতা অঞ্চলের পাঠকদিগকে 'খাবারে'র কথা না বলিলে কিছুই বলা হইল না। কেননা, খাবারই তাঁহাদের প্রাণের প্রাণ। এখানকার ঘৃতপক্ক খাবার অতি সুখাদ্য, কলিকাতার ন্যায় ঘৃতের কায অনুকরে বাদামের তেলে সম্পন্ন হয় না; খাবার প্রস্তুত করার কালে ঘৃতের

সদ্গন্ধে উদরপরায়ণ ব্যক্তির জিহ্বায় লালাসঞ্চার হয়। বাঙ্গালীটোলায় যথেষ্ট খাবারের দোকান আছে, বিশেষতঃ শশীর ও তস্য ভ্রাতার দোকানে উৎকৃষ্ট 'খাবার' প্রস্তুত হয়, কিন্তু (সার্থকনামা) 'কচুরিগলি'র নাম-ডাকটাই বেশী। কচুরিগলির রাবড়ি-মালাই উপাদেয়; ছানার সন্দেশ কেবল বাঙ্গালীটোলায় মিলে। নানারূপ সুখাদ্যের নাম করিলে পাঠক-বর্গের ভাবান্তর ঘটিতে পারে, অতএব আর কথা বাড়াইলাম না। এখানকার 'নান্‌খাতাই' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিজ্ঞানশিক্ষার ন্যায় এ সম্বন্ধেও লিখিত উপদেশ অপেক্ষা হাতে-মুখে পরখ করাই বিশেষ ফলোপধায়ক। তজ্জন্য বিস্তর লিখিয়া পুঁথি বাড়াইব না। বাস্তবিক কাশী ত্যাগীর পক্ষে যেরূপ উপযুক্ত স্থান, ভোগীর পক্ষেও সেইরূপ উপযুক্ত।

(৫)

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িল। পাঠক মহাশয়ের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটা বিচিত্র নহে। যাহা হউক, আর একদিনের কথা বলিয়া উপসংহার করি। এই দিনের প্রোগ্রাম—কাশীর অপরপারস্থিত রামনগর (কাশীনরেশের রাজধানী) ও তাঁহার স্থাপিত দুর্গামন্দির দেখা, এবং সুবিধা ও সম্ভব হইলে ব্যাসকাশী পর্য্যন্ত যাওয়া। ঠাকুরদাদা মহাশয়, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র, অপর একজন আত্মীয় ও পূর্ব্বোক্ত আত্মীয়ের চাকর ও পাচক, সবশুদ্ধ আধ ডজন লোক হইল; ফাউস্বরূপ পূর্ব্বোল্লিখিত আত্মীয়ের একটি পঞ্চমবর্ষীয় পুত্রকে হাওয়া খাওয়াইতে লওয়া হইল। বালকটি অনেক দিন রোগে ভুগিয়া বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য এখানে আনীত হইয়াছে, এখন শরীর সারিয়া উঠিতেছে। মধ্যাহ্নভোজন ও দিবানিদ্রার পর বেলা তিনটার সময় দশাশ্বমেধঘাটে গিয়া একখানি নৌকা যাতায়াতের জন্য ভাড়া করা গেল। নৌকা যথাসময়ে পরপারে পৌঁছিল। প্রথমেই রাজবাড়ীর

সজ্জিত ঘরগুলি ও বহুমূল্য আস্‌বাব দেখিয়া গোজন্ম সার্থক করিলাম। ইহার মধ্যে শকুন্তলাগৃহ ও শান্তিগৃহ বড় মনোরম ; শান্তিগৃহ সার্থকনামা। শকুন্তলাগৃহে শকুন্তলার জীবন-ইতিহাসের ঘটনাবলি পর পর চিত্রে প্রদর্শিত। রাজপ্রাসাদে অধিষ্ঠিত গঙ্গাদেবীর শ্বেতপ্রস্তরের মূর্তিও দর্শনযোগ্য। (এতৎসম্বন্ধে হেমবাবুর কবিতা বোধ হয় পাঠকসম্প্রদায়ের অবিদিত নহে।) ম্যানেজার বাবুর উপর একজন কাশীস্থ উকীল বন্ধু চিঠি দিয়াছিলেন, সেই খাতিরে তিনি একজন আর্দ্দালিকে ঘরগুলি দেখাইবার জন্ম মোতায়েন করিয়া দিলেন, তাহার সাহায্যে কার্য্য সহজেই নিষ্পন্ন হইল। আর্দ্দালিকে কিঞ্চিৎ বখশীশ দিয়া হাসিমুখে বিদায়গ্রহণ করিলাম। ঠাকুরদাদা মহাশয় ক্ষীণজীবী মানুষ, বয়সও হইয়াছে এইটুকুতেই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি আর আমাদের সঙ্গে যাইতে সম্মত হইলেন না, ফিরিয়া গিয়া নৌকায় আশ্রয় লইলেন ; এবং আমাদিগকে শীঘ্র শীঘ্র ফিরিতে বলিয়া আমাদিগের জন্ম অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তখন প্রায় অপরাহ্ণ।

রাজবাটী হইতে বাহির হইয়া রামনগরের দুর্গামন্দির দেখিতে রওনা হইলাম, এবং খানিক পথ সহরের ভিতর দিয়া ও খানিক পথ মেঠো রাস্তা দিয়া গিয়া মন্দিরে উপস্থিত হইলাম।

মন্দিরটি সুন্দর, ইহার উচ্চচূড়া অনেক দূর হইতে দেখা যায়, কাশী হইতে সুস্পষ্ট দেখা যায়, মোগলসরাই ছাড়াইয়া ট্রেনে আসিতে আসিতেও ইহা দূর হইতে লক্ষ্য হয়। কাশীতেও রামনগরের রাজার একটি কালীমন্দির আছে (গোধূলিয়া নামক মহল্লার নিকট)। উভয় মন্দিরের গঠনপ্রণালী ও কারুকার্য্য একই প্রকারের। দরজাগুলি কাষ্ঠের খোদাইকার্য্যে সুশোভিত, মন্দিরগাত্রে নানারূপ দেবদেবী ও বাদ্যযন্ত্রের প্রতিকৃতি ক্ষোদিত। বোধ হয়, দেবলোকের কোনও সঙ্গীত-মহোৎসব

স্থচিত হইয়াছে। মন্দির দেখিয়া আমাদের একটা পথ হাঁটার পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে, সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিলাম। তৃষ্ণার্ত্ত হওয়াতে পূজকদিগের নিকট চাহিয়া শীতল জল পান করিলাম।

মন্দিরের সন্নিকটে চারি দিকে বাঁধান প্রশস্ত পুষ্করিণী ও তাহার পার্শ্বে বিশ্রামবাটিকা। ইহার লাগাও একখানি ফলের বাগান, নাম রামবাগ, আয়তনে প্রকাণ্ড। অকুতোভয়ে বাগানে প্রবেশ করিলাম, এবং সমস্ত বাগান তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলাম। কোথাও আমের বাগান, কোথাও পেয়ারার বাগান, কোথাও অনেক দূর জুড়িয়া সারি সারি (Orange) নারাঙ্গ লেবুর গাঁছ, কোথাও কণ্টকাকীর্ণ কুলগাছ জঙ্গল করিয়া রহিয়াছে। ইহার মধ্যে লেবুগাছেরই বাহার বেশী, সোণার বরণ লেবুগুলি থরে থরে গাছে ঝুলিতেছে, ঘন পল্লবের মধ্য হইতে প্রদোষকালের আবছায়া অন্ধকারে যেন স্বর্ণদ্বীপের ন্যায় জ্বলিতেছে, দেখিয়া নয়ন-মনের তৃপ্তি হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে দর্শন হইতে স্পর্শন ও আস্বাদনের স্পৃহাও উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। (মোহের প্রকৃতিই এই !) একজন সঙ্গী বহু সাধ্যসাধনায় মালীদিগের নিকট হইতে এই মধুর-অম্লরস-পূরিত ফল একটি পাইবার চেষ্টা করিলেন, এবং তজ্জন্য ন্যায্য মূল্য দিতেও প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু তাহারা নিতান্তই নারাজ। সুতরাং, ক্রয় ও যাচ্ঞা ছাড়া কাঙ্ক্ষিত বস্তুলাভের আরও যে একটা তৃতীয় পন্থাঃ আছে, তিনি তাহাই অবলম্বন করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। তবে তাহার তত সুবিধা পাইলেন না বলিয়াই হউক (প্রহরী বড় সতর্ক) অথবা মনে কোনরূপ দ্বিধা উপস্থিত হওয়াতেই হউক, সে কার্য্যসাধনে অবশেষে নিরস্ত হইলেন।

উদ্যানসংলগ্ন সুদৃশ্য ও সুপরিষ্কার প্রাসাদে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া নির্গত হইলাম, এবং ব্যাসকাশীর উদ্দেশে লঘুপদবিক্ষেপে অগ্রসর

হইতে লাগিলাম। অপরিচিত পথ, তাহা আবার মাঠের ভিতর দিয়া, প্রতি পদে লোককে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে যাইতে হইল; কাযেই বহু বিলম্ব ঘটিতে লাগিল। স্থানটিও অন্ততঃ চার পাঁচ মাইল (?) দূরে। ইহা ছাড়া পথে নানারূপ প্রতিবন্ধক ঘটিতে লাগিল। কুলগাছ দেখিলেই সঙ্গীরা আর স্থির থাকিতে পারেন না, স্বভাবের নিয়মে ক্ষুধাতৃষ্ণা-নিবারণের জন্য গাছে চড়িয়া বসেন; ইক্ষুক্ষেত্র দেখিলেই স্বাদু ইক্ষুদণ্ড সংগ্রহে ব্যস্ত। ভাগ্যে সঙ্গের বালকটি সুবোধ, এবং বুদ্ধি করিয়া মিছরি, বাতাসা, বিস্কুট প্রভৃতি রোগীর খাদ্য পকেট বোঝাই করিয়া আনা হইয়াছিল, নতুবা নানারূপ কুপথ্যভোজনে তাহার অবস্থা আশঙ্কা-জনক হইয়া পড়িত।

এইরূপে অগ্রসর হইয়া অবশেষে বহুদূর আসিয়া পড়া গেল; যেখানেই মানুষ দেখা যাইতেছিল, সেখানেই 'ব্যাসকাশী আর কত দূর' ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করা হইতেছিল; শেষে একস্থানে আসিয়া শুনা গেল, ব্যাসকাশী পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছি! কথাবার্ত্তার স্ফূর্ত্তিতে যথাসময়ে স্থানটি লক্ষ্য করা হয় নাই। আবার সেখান হইতে পিছু হঠিতে আরম্ভ করা গেল। এবার ইন্দ্রিয়গ্রাম খুব সজাগ রাখা গেল, পাছে আবার স্থানটি ফেলিয়া বেশী দূর চলিয়া যাই। অল্পক্ষণ পরেই অভীষ্ট স্থানে পঁহুছিলাম। কিন্তু স্থানটি দেখিয়া হরিভক্তি উড়িয়া গেল। ক্ষুদ্র একটি ইষ্টকময় গৃহে ব্যাসেশ্বর শিবলিঙ্গ বিরাজমান, আশে পাশে দুই একটা দোকান-ঘরের মাটীর দেয়ালের ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে, দেখিবার কিছুই নাই। বুঝিলাম, এ স্থানে মরিলে কেন, এ স্থানে আসিলেও গর্দ্দভজন্মলাভের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বিলক্ষণ! কেননা, এরূপ কদর্য্য স্থানে আসার চেষ্টাই নির্ব্বুদ্ধিতা। শুনিলাম, এখানে একদিন মেলা-উপলক্ষে লোকসমাগম হয়। অবশিষ্ট সময় ভোঁ ভাঁ। যাহা

হউক, পথ অল্প হাঁটা হয় নাই, ফিরিবার তাড়া থাকিলেও তথায় একটু বেশীক্ষণ বিশ্রাম না করিয়া উঠিতে পারা গেল না।

এইবার ফিরিবার পালা। নূতন স্থান দেখার কৌতূহলে যেরূপ দ্রুত আসা গিয়াছিল, যাইবার সময় ততটা বেগ রহিল না; আর তখন অন্ধকারও বেশ ঘনাইয়া আসিয়াছে; অপরিচিত স্থান, তবে নিকটে ঝোঁপ-জঙ্গল না থাকাতে হিংস্রজন্তুর ভয় ছিল না। ফাঁকা মাঠ, পৌষমাসের হাওয়া, পথ হাঁটিয়া বেশ স্ফূর্ত্তিবোধ হইতেছিল। কিছুক্ষণ পরে এক আখের 'বানে' পঁহুছান গেল। সঙ্গীদের অম্‌নি টাট্‌কা ইক্ষুরস পান করিবার প্রবৃত্তি চাগিয়া উঠিল। আমিও বড় গর্‌রাজী নহি, কাযেই তথায় হল্‌ট্‌ করা গেল। মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া কৃষক-গৃহস্থের নিকট ঝক্‌ঝকে একটি জার্ম্ম্যান্‌-সিল্‌ভারের গ্ল্যাস্‌ (কাশীতে এই মিশ্রধাতুর বাসন যথেষ্টপরিমাণে নির্ম্মিত হয়) লওয়া গেল, এবং অল্প পয়সায় বিলক্ষণ আরাম করা গেল; বোধ হয়, নেশাখোরদের স্ফূর্ত্তিও ইহা অপেক্ষা বেশী জমে না।

সরল কৃষকের সঙ্গে দু' একটা মিষ্টালাপের পর উঠিবার উদ্‌যোগ করা যাইতেছে, এমন সময় লক্ষ্য হইল যে, পাচক ব্রাহ্মণটির হাতের ছাতাটি নাই! লোকটি কিছু বোকা রকমের, প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়াও তাহার স্মৃতিশক্তি উদ্‌বুদ্ধ করা গেল না। আমাদের সিদ্ধান্ত হইল যে, ব্যাসকাশীতে অনেকক্ষণ ধরিয়া বিশ্রাম করা হইয়াছে, তথায়ই সম্ভবতঃ ছাতাটি ফেলিয়া আসিয়াছে। তবে সেটি এখনও তথায় আছে কি না, অথবা কোনও কুলতলায় বা আখের ক্ষেতে পড়িয়াছে কি না, তাহার কোনও মীমাংসা করা অসম্ভব। আবার ফিরিয়া ব্যাসকাশী যাওয়া যাইবে কি না, তাহা লইয়া তর্ক উঠিল। এমন স্ফূর্ত্তির ভ্রমণে ছাতা হারাইয়া ষোল আনা সুখের অঙ্গহানি হইবে, ইহা বর্‌দাস্ত

হইল না ; 'ছাতু'র দেশে ছাতা হারাইয়া বোকা বনিয়া যাওয়া নিতান্ত কাপুরুষের লক্ষণ, ইত্যাদি বিবেচনায় নষ্টছত্র-উদ্ধারের চেষ্টায় ব্যাসকাশী-অভিমুখে ফেরাই স্থির হইল। পথে আখের ক্ষেতে ও কুলতলায়, অন্ধকারে যতটা সম্ভব, পাঁতি পাঁতি করিয়া সন্ধান করা গেল। অবশেষে ব্যাসেশ্বরের ক্ষুদ্র মন্দিরে উপনীত হইয়া সবিস্ময়ে ও সহর্ষে দেখা গেল, মন্দিরের 'রকে'—যেখানে আমরা বিশ্রাম করিয়াছিলাম,—ছাতাটি পড়িয়া যেন সঙ্গীহারা হইয়া বিমর্ষভাবে ভূমিশয্যায় শয়ান রহিয়াছে। অতি সমাদরে ছাতাটি ধূলা ঝাড়িয়া কুড়াইয়া লওয়া হইল ; কবিসুলভ কল্পনা ও সুকুমার মনোবৃত্তি পাইলে আমরা বোধ হয় হারানিধিকে কোলে তুলিয়া লইয়া চুম্বন আলিঙ্গন ইত্যাদিও করিতে ছাড়িতাম না। অন্ধকারে ইহা অপর কাহারও নয়ন-গোচর হয় নাই বলিয়াই হউক, অথবা ব্যাসেশ্বর 'জাগ্রৎ' দেবতা বলিয়াই হউক, ছাতাটি অক্ষত-শরীরে পাইয়া আমাদের স্ফূর্ত্তি দ্বিগুণ হইতে চতুর্গুণ হইয়া দাঁড়াইল ; ক্ষণিক উদ্‌বেগ দূর হইয়া আনন্দের স্থায়িভাব হৃদয় অধিকার করিল। মহাস্ফূর্ত্তিতে আবার পথ চলিতে আরম্ভ করা গেল।

এবার কিন্তু বড় মুস্কিল। একে ত অচেনা পথ, তাহাতে নিবিড় অন্ধকার। পথ হারাইতে বেশী বিলম্ব হইল না। তবে ভরসা, আমরা দলে পুরু আছি, আর সঙ্গে পাচক ব্রাহ্মণ মজুত ; নল রাজা বিনা ইন্ধনে পাক করিয়াছিলেন, প্রয়োজন হইলে আমাদের পাচকপ্রবরও কি বিনা উপকরণে পাঁচ ব্যঞ্জন ভাত দিতে পারিবেন না ? একজন সঙ্গী পথি-পার্শ্বস্থ কৃষককুটীর হইতে খাঁটী দুধ সংগ্রহ করিবার আগ্রহ প্রকাশ করিলেন, কিন্তু সঙ্গে কোনওরূপ পাত্র না থাকাতে সে সাধু ইচ্ছা 'উত্থায় হৃদি লীন' হইল। দুর্গামন্দিরের উচ্চচূড়া লক্ষ্য করিয়া ঢেলা ঠেলিয়া চষাভূমির উপর দিয়া চলিতে লাগিলাম। কলিকাতার ন্যায় কাশীতেও

মাটী কিনিতে হয়, এই প্রসঙ্গ উঠাতে কাশীর আত্মীয়টি পাচক ঠাকুরকে কয়েকটি ঢেলা বাঁধিয়া লইতে বলিলেন। নির্ব্বোধ লোকটি উপহাস না বুঝিয়া সত্যসত্যই তাহা করিল। যাহা হউক, বিলক্ষণ আয়াসের পর ক্রমশঃ দুর্গামন্দিরে ও তৎপরে রামনগরে পৌছান গেল। রামনগরে পৌছিয়া কাশীর আত্মীয়টি চলন্ত অবস্থাতেই আমাদিগকে নানারূপ উদ্ভট খাদ্য কিনিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন। রাত্রি প্রহরেক হইলে রামনগরের ঘাটে নৌকায় আসিয়া জমা গেল।

অসঙ্গত বিলম্বে মাঝীদিগের বকাবকি পাঠক মহাশয় অনুমান করিয়া লইতে পারেন, কিন্তু ঠাকুরদাদা মহাশয়ের তিরস্কার আরও সাংঘাতিক, তাহা অবর্ণনীয় ও অননুধাবনীয়। পৌষের দুরন্ত শীতে রাত্রিকালে নদীবক্ষে অনাচ্ছাদিত নৌকায় বৃদ্ধ ক্ষীণজীবী ঠাকুরদাদা মহাশয় নিরাহার নিরালম্ব হইয়া বালাপোষ মুড়ি দিয়া বসিয়া আছেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়া যাইতেছে, আমাদের প্রত্যাগমনের কোনও লক্ষণ নাই, হয় ত কোন অনিশ্চিত বিপদ্ আশঙ্কা করিয়া গৃহকর্ত্তার অত্যন্ত উৎকণ্ঠায় মন অবসন্ন, তাহার উপর আবার 'গণ্ডস্যোপরি পিণ্ডঃ সংবৃত্তঃ'—আফিঙের-কৌটাটি আনিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। আমরা ফিরিতেই আমাদের উপর খুব এক চোট লইলেন, বোধ হয়, তাহাতে আফিঙের অভাব কিঞ্চিৎ-পরিমাণে পূর্ণ হইল। আমরা অবশ্য ন্যাকা সাজিয়া, পথহারা হইয়াছিলাম, তাহাতেই এত বিলম্ব, এই অজুহাত দিলাম। প্রতিপক্ষ শান্ত হইলে নৌকা ছাড়িয়া দিল, এবং ঘণ্টাখানেক পরে দশাশ্বমেধঘাটে পৌছিলাম ও মাঝীদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া গৃহাভিমুখীন হইলাম। বালকটি সুষুপ্ত অবস্থায় চাকরের স্কন্ধে বাহিত হইল। আপাতমনোরম পরিণাম-বিষম নৈশবিহারে হিমভোগ করিয়া হয় ত সকলেই অসুস্থ হইয়া পড়িব, বিশেষতঃ বৃদ্ধ ঠাকুরদাদা মহাশয় ও সদ্যোরোগমুক্ত বালকটি সম্বন্ধে

বিলক্ষণ আশঙ্কা হইয়াছিল। কিন্তু সুখের বিষয়, পরদিন প্রাতে কাহারও সর্দ্দিকাসীর লক্ষণ প্রকাশিত হইল না। বাঙ্গালা দেশের আব-হাওয়ার সঙ্গে কি আশ্চর্য্য প্রভেদ! সাধে কি বাঙ্গালার কবি গায়িয়াছেন,

আমার লোয়ার (Lower) বাংলা।
আমি তোমায় ভালবাসি।
তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার বুকে বাজায় কাসী! (কাঁসী ?)

এই দিনকার সুখস্মৃতি অনেক দিন মনে থাকিবে এবং কর্ম্মক্লান্ত জীবনের অবসাদমুহূর্ত্তে সেই স্ফূর্ত্তির কথা মনে পড়িলেও আবার নূতন করিয়া স্ফূর্ত্তিবোধ হইবে। এই দিনটিকেই বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া 'অনৃণী চাপ্রবাসী চ' ইত্যাদি শ্লোক জানিয়াও প্রবন্ধের শীর্ষে 'সুখের প্রবাস' এই আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী শব্দ দুইটি বসাইতে সাহসী হইয়াছি। পাঠক মহাশয়ের দু-দণ্ডের জন্য আনন্দলাভ হইলেই এই অকিঞ্চিৎকর ভ্রমণ-কাহিনী বিবৃত করিবার পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

(ভারতবর্ষ, আষাঢ় ১৩২৪)
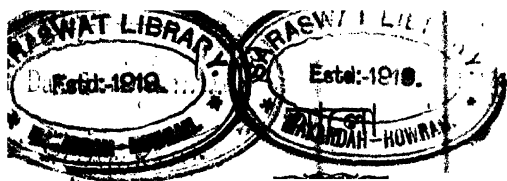
উনবিংশ শতাব্দীতে জার্ম্মাণীর জাতীয় প্রতিভার মূর্ত্ত অবতার (Goethe) গেটের চর্ম্মচক্ষে যখন জগতের আলো নিবিয়া আসিয়াছিল, তখন তিনি শেষ নিশ্বাসের সহিত ক্ষীণকণ্ঠে বলিয়াছিলেন,—"আলো, আলো, আরও আলো!" ('Light, light, more light!') আর আজ বিংশ শতাব্দীতে জার্ম্মাণীর জাতীয় প্রতিভার মূর্ত্ত অবতার কাইজার (Kaiser) বজ্রনির্ঘোষে বলিতেছেন,—"আঁধার, আঁধার, আরও আঁধার! গথিক (Gothic) বর্ব্বরতার, অমানুষ নিষ্ঠুরতার, পৈশাচিক জিগীষা ও জিঘাংসার নারকীয় অন্ধকারে সমস্ত পৃথিবী ডুবাইয়া দেও!"

বাইবেলে বর্ণিত (Genesis) সৃষ্টিপ্রকরণে দেখা যায়, পরমেশ্বরের আদেশে অন্ধকার হইতে আলোকের উদ্ভবেই সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার আরম্ভ— 'Let there be light and there was light'; আমাদের শাস্ত্রেও আছে, 'আসীদিদং তমোভূতম্। ততঃ স্বয়ম্ভুর্ভগবান্ প্রাদুরাসীৎ তমোনুদঃ॥' (মনুসংহিতা, ১ম অধ্যায় ৫।৬ শ্লোক)। তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে ইতি শ্রুতিঃ।

গেটের মৃত্যুকালীন উক্তির ও বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্বের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হইয়াছে; এই ব্যাখ্যায় আলোক জ্ঞানরূপে ও অন্ধকার অজ্ঞান-রূপে গৃহীত হইয়াছে; অর্থাৎ অজ্ঞান জ্ঞানের আলোকে তিরোহিত হয়—'তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা'। এই ব্যাখ্যানুসারে, 'অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুরুন্মীলিতং যেন', সেই জগদ্গুরু শ্রীভগবান্

আসন্নমরণ জ্ঞানভিক্ষু জার্ম্মাণ কবি গেটের রসনায় আবির্ভূত হইয়া বৈদিক ঋষির উদাত্ত প্রার্থনা তাঁহার মুখ দিয়া বাহির করাইয়াছেন,—'অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়।' এই আধ্যাত্মিক অর্থেই আমাদের কবি গাহিয়াছেন, 'তুমি অন্ধ জনে দেহ আলো, মৃত জনে দেহ প্রাণ।' এই ভাবের ভাবুক হইয়াই শাস্ত্রবিশ্বাসী হিন্দু বলেন,—

অনেক-সংশয়োচ্ছেদি পরোক্ষার্থস্য দর্শনম্।
সর্ব্বস্য লোচনং শাস্ত্রং যস্য নাস্ত্যন্ধ এব সঃ॥

বিশেষ করিয়া যে শাস্ত্র এই সত্যজ্ঞানের আলোক প্রদান করে, তাহাকেই আমাদের দেবভাষায় দর্শন-শাস্ত্র বলে, কেননা প্রকৃত-দর্শন ও সত্যজ্ঞান অভিন্ন।

যাহা হউক, আমরা এই গভীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ছাড়িয়া সহজ স্বাভাবিক অর্থেই 'আলো' শব্দটা গ্রহণ করিব; শিক্ষা-ব্যবসায়ী হইয়াও ইহা দ্বারা শিক্ষার আলোক না বুঝিয়া শিখার আলোকই বুঝিব।

আকাশে সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্র ধূমকেতু উল্কা বিদ্যুৎ, ভূপৃষ্ঠে খদ্যোত প্রভৃতি পতঙ্গ ও তৃণজ্যোতিঃ প্রভৃতি উদ্ভিদ্, স্বাভাবিক উপায়ে আলোক বিকীর্ণ করে। সাগর-জলেও এইরূপ (Phosphorescent) জ্যোতিষ্মান্ কীট-পতঙ্গ ও উদ্ভিদের অস্তিত্ব পরিদৃষ্ট হইয়াছে। নির্জ্জন প্রান্তরে আলেয়ার আলো পথিককে বিভ্রান্ত, বিড়ম্বিত করে। বনের দাবানল ও সমুদ্রের বাড়বানল আকস্মিক আলোক উৎপাদন করে। উল্কার আলোকে শেক্স্পীয়ারের ব্রুটস্ পত্র পড়িতে পারিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়, কিন্তু জগতের অন্য কেহ কোন উপকার পাইয়াছে বলিয়া জানি না। বরং উল্কাপাতে মানব-মনে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি করে, ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের ছায়াপাত করে। আমার মনে হয়, এগুলি বিশ্বামিত্রের সৃষ্ট জগতের ধ্বংসাবশেষ, বিশ্বামিত্রের উচ্চ আশার মতই থাকিয়া

থাকিয়া খসিয়া পড়ে। ক্ষণপ্রভার ক্ষণিক আলোকে প্রেমিকা বসন্তসেনা বা প্রেমপ্রবণ জগৎসিংহ 'বিদ্যুদ্দীপ্তি-প্রদর্শিত পথে কোনমতে চলিতে' পারিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে আলোকের উপর তত ভরসা হয় না; তাই অভিসারিকা বসন্তসেনা আক্ষেপ করিয়াছেন,—'অয়ি বিদ্যুৎ ত্বমপি প্রমদানাং দুঃখং ন জানাসি।" বস্তুতঃ মেঘমালার বিদ্যুৎঝলকে আলোকের মনোহারিত্ব অপেক্ষা বজ্রপতনের ভয়ঙ্করত্বই অধিক প্রকট। ধূমকেতুর আবির্ভাব কালে-ভদ্রে ঘটে এবং ইহা মানবের কোন উপকারে আসে না। বরং ইহার আকস্মিক আবির্ভাব মানবমনে নানারূপ আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছে, ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কায় মানবমনকে দুশ্চিন্তায় অভিভূত করিয়াছে। ফলতঃ ভূপৃষ্ঠের আলেয়া এবং আকাশের বিদ্যুৎ, উল্কা ও ধূমকেতু, দাবানল বাড়বানল, জলজ ও স্থলজ (Phosphorescent) জ্যোতিষ্মান্ কীটপতঙ্গ উদ্ভিদ্, আলোক বিতরণ করিয়া মানবের জীবন-পথ সুগম করিয়াছে, বলা চলে না।

পক্ষান্তরে, সূর্য্য চন্দ্র ও নক্ষত্রমালা সৃষ্টির আদিমকাল হইতে আলোক প্রদান করিয়া মানবের উপকার সাধন করিতেছে। বাইবেলের সৃষ্টিপ্রকরণে স্পষ্টবাক্যে লিখিত আছে, 'সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ' মানুষকে আলো দিবার জন্যই জীহোভা-কর্ত্তৃক নিযুক্ত,—'The greater light to rule the day and the lesser light to rule the night,' অর্থাৎ দিনের ভার বড় আলো সূর্য্যের উপর, আর রাতের ভার ছোট আলো চন্দ্রের উপর। তবে জীহোভার নির্দ্দিষ্ট এই শ্রমবিভাগে (division of labour) একটু ত্রুটি আছে; আমরা যখন জীহোভা-ভক্ত য়িহুদী নহি, তখন অকুতোভয়েই কথাটা বলিতে পারি।

সূর্য্যি মামার লোহার শরীর (iron constitution), অটুট স্বাস্থ্য, অসীম শক্তি, অসামান্য কর্ত্তব্যবুদ্ধি। তিনি রোজ সকালে ঠিক ঘড়ী

ধরিয়া আফিস করিতে বাহির হন, কখন লেট্ বা গরহাজির হন না। মেঘলা-কুয়াশা-বর্ষা-বাদলার দিনে তিনি একটু লুকোচুরি খেলেন বটে, কিন্তু রীতিমত আলো সরবরাহ করিতে ক্ষান্ত থাকেন না। তবে যখন দুরন্ত রাহুর কবলে সর্ব্বগ্রাস ঘটে, তখন ইচ্ছাসত্ত্বেও আলো দিতে পারেন না। সে ত বিধাতার ফের! তাহার উপর আর তাঁহার হাত কি?

চাঁদা মামার কায কিন্তু এমন নিখুঁত নহে। তিনি ক্ষয়রোগী, তাঁহার ভঙ্গুর স্বাস্থ্য (delicate health), কর্ত্তব্যজ্ঞানও তেমন সজাগ নহে। জীহোভার বন্দোবস্তমত, সূর্য্যাস্তে দাদার হাত হইতে চার্জ্জ বুঝিয়া লইয়া দাদাকে relieve করিয়া, আবার সূর্য্যোদয়ে চার্জ্জ বুঝাইয়া দিয়া তাঁহার ঘরে যাওয়া উচিত। কিন্তু পাহারাওয়ালার মত এরূপ কাঁটায়-কাঁটায় কায তিনি মাসের মধ্যে দুই দিনও করেন কি না সন্দেহ। ফাঁকিবাজ কেরাণীর মত দেরী করিয়া কাযে আসা বা টাইম্ না হইতে আফিস-পালান তাঁহার বিষম রোগ। তবে গুণের মধ্যে এইটুকু যে, তিনি দুই দিক্ রক্ষা করিতে না পারিলেও এক দিক্ রক্ষা করেন, যেদিন দেরীতে আসেন সেদিন শেষ পর্য্যন্ত থাকেন, আবার যেদিন শেষদিকে গা-ঢাকা দেন, সেদিন খুব সকাল সকাল কাযে লাগেন; কেরাণীর শিরোমণি চার্লস্ ল্যাম্বের * মত বা শাঁখের করাতের মত 'যেতেও কাটা আস্‌তেও কাটা, অভ্যাস নাই। বৈজ্ঞানিকেরা তাঁহার এই বদ্‌খেয়ালের নিদান-নির্ণয় করিয়াছেন; কিন্তু আমরা অতশত বুঝি না; আমাদের স্থূল বুদ্ধিতে ইহাই লয় যে, কুলীন ব্রাহ্মণের মত বহুপত্নীক বলিয়া তিনি চাকরীর কাযে তাল ঠিক রাখিতে পারেন না।

* 'You are late Mr. Lamb.' 'Yes, but I always make it up by going away early!' বলা বাহুল্য এটা বৈঠকী কথা। প্রকৃতপক্ষে ল্যাম্ব আফিসের কার্য্যে অবহেলা করিতেন না।

বঙ্কিমচন্দ্রের স্ত্রৈণ শ্রীশচন্দ্র যে একটি লইয়াই সব সময়ে তাল সাম্‌লাইতে পারেন্ নাই! ইহার উপর আবার যদি মেঘলা-বাদলা হয়, তবে ত কথাই নাই; এমন অবস্থায় বরং সূয্যি মামার একটু আবছায়া দেখা যায়, চাঁদা মামা একেবারেই ডুব দেন। গ্রহণের সর্ব্বগ্রাসে অবস্থা আরও সঙ্গীন হয়। ফল কথা, ইনি জীহোভার বন্দোবস্ত ঠিকমত পালন করেন না। ইহাতে শয়তানের কারসাজী আছে কি না, বাইবেলজ্ঞই বলিতে পারেন। যাহা হউক, সাতাইশ তারার পতি হওয়াতে তাঁহার এইটুকু সুবিধা হইয়াছে যে, তিনি যখন Sick report করিয়া গরহাজির হন, তখন তাঁহার পত্নীগণ বা তাহাদের সখীরা তাঁহার একটিনী করে। (যেমন বর্ত্তমান যুদ্ধে পুরুষেরা লড়াই করিতে যাওয়াতে স্ত্রীলোকে দেশে বসিয়া পুরুষদের কায চালাইতেছে।) তবে এই ক্ষীণাঙ্গীদিগের সাধ্য কি যে তাঁহার স্থান পূরণ করে? তাই চাণক্য পণ্ডিত বলিয়া গিয়াছেন,—

একশ্চন্দ্রস্তমো হন্তি ন চ তারাগণৈরপি ॥

আর প্রাচীন বাঙ্গালী কবি 'অস্বার্থ' করিয়াছেন—

এক চন্দ্র জগতের অন্ধকার হরে।
লক্ষ লক্ষ তারা দেখ কি করিতে পারে ॥

আরও এক কথা। সূর্য্যের আলো 'প্রদীপ্ত, প্রভাময়, যাহাতে পড়ে, তাহাই হাসিতে থাকে।' * সুতরাং দিনের বেলা অন্ধকারের ভয় নিতান্ত গুলিখোর ভিন্ন কেহ করিবে না। কিন্তু রাতের বেলা চন্দ্র-তারার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকা যায় না। একে ত তাহাদের আবির্ভাব-তিরোভাবে নানান্ ছলা; তাহাতে আবার তাহাদের জ্যোতিঃ বড়ই ক্ষীণ; সস্তা জার্ম্মাণ মালের মত তাহাদের কেবো গুণ অপেক্ষা বাহ্য-চটকই বেশী। সেই আলোকে পুলকিত হইয়া কবিতা লেখা চলে, কিন্তু

---

* দুর্গেশনন্দিনী—'আয়েষা'-শীর্ষক পরিচ্ছেদ।

তাহাতে সংসারের প্রয়োজন সাধিত হয় না। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় বলিতে গেলে, সে আলোক 'সুবিমল, সুমধুর, সুশীতল; কিন্তু তাহাতে গৃহকার্য্য হয় না; তত প্রখর নয় এবং দূরনিঃসৃত।'* তাই মানুষ সভ্যতার প্রথম ধাপে উঠিয়াই, রাত্রিকালের জন্য কৃত্রিম উপায়ে আলোক-উৎপাদনের চেষ্টা করিয়াছে। সেই চেষ্টার ইতিহাস-সঙ্কলনের সূচনী-স্বরূপ এই দীর্ঘ গৌরচন্দ্রিকা। কিন্তু এই ইতিহাস-অবতারণার পূর্ব্বে প্রসঙ্গক্রমে আর একটু বক্তব্য আছে।

যখন মানববুদ্ধি ক্রমশঃ বিকাশ পাইতে লাগিল, যখন মানব নিজের অভাব অনুভব করিতে এবং অভাব দূর করার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করিতে শিখিল, যখন প্রয়োজন উদ্ভাবনের জনন করিতে প্রবৃত্ত হইল, সেই অবস্থায় মানব আলোক অপেক্ষা তাপের প্রয়োজনীয়তাই অধিকতর তীব্রভাবে অনুভব করিয়াছিল। কেননা অন্ধকারে মানুষ বাঁচিতে পারে, কিন্তু শীত-নিবারণ ব্যতিরেকে প্রাণধারণ দুঃসাধ্য। বিশেষতঃ, জগতের আদিম অবস্থায় (glacial period) শীতটাও ছিল নিদারুণ। লোমশ পশুচর্ম্মধারণ ও বসাভোজনে সে শীত প্রশমিত হইত না। আবার, আম-মাংস ও স্কন্দমূলফল-ভোজনে ক্রমে অরুচি জন্মিলে, মানুষ খাদ্যপাকের জন্যও অগ্নির প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়াছিল। হয় ত আকস্মিক দাবানলে অর্দ্ধদগ্ধ পশুপক্ষীর মাংস খাইয়া মানুষ আমমাংস অপেক্ষা ইহার স্বাদুত্বা বুঝিয়াছিল এবং সুস্বাদু খাদ্যপাকের লোভে ইচ্ছাক্রমে অগ্নি-উৎপাদনে কৃতাভিনিবেশ হইয়াছিল। অন্ততঃ দাবানল দেখিয়া অগ্নির দাহিকা শক্তি ও তাপ-বিকিরণ সম্বন্ধে মানবের প্রথম জ্ঞান জন্মিয়াছিল, ইহা নিঃসংশয়ে বলা যায়। কিন্তু দাবানল দৈব ঘটনা, মানুষের ইচ্ছাধীন

* দুর্গেশনন্দিনী—'আয়েষা'-শীর্ষক পরিচ্ছেদ

নহে; সুতরাং অগ্নিপ্রজ্বলনের কৃত্রিম উপায় তখনও পর্য্যন্ত মানবের করায়ত্ত হয় নাই। কি কৃত্রিম উপায়ে দাবানলের ন্যায় অগ্নি উৎপাদন করা যায়, মানব তদ্‌বিষয়ে মস্তিষ্ক-চালনা করিতে লাগিল। হয় ত দৈবাৎ প্রজ্বলিত দাবানলকে নিবিতে না দিয়া, তাহাতে ইন্ধন যোগাইয়া সেই আগুন (চাষাদের তামাকু-সেবনের জন্য বোঁদনার আগুনের মত) বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টাই সর্ব্বপ্রথম।

তাহার পর কোন একজন অসাধারণ-প্রতিভাশালী মানব পুনঃ-পুনঃ দাবানল পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা স্থির করিলেন যে, কাষ্ঠে-কাষ্ঠে ঘর্ষণে দাবানল উৎপন্ন হয়। যিনি প্রথমে এই সূত্র ধরিয়া কাষ্ঠে-কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিয়া স্বহস্তে কৃত্রিম উপায়ে অগ্নি-উৎপাদনে কৃতকার্য্য হইলেন, তিনি ঋষিপদবাচ্য। প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে উল্লিখিত আছে যে, নচিকেতাঃ যমরাজের নিকট অগ্নিচয়ন-বিদ্যা শিক্ষা করেন। গ্রীক পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে যে, প্রোমিথিউস্ (Prometheus) স্বর্গ হইতে অগ্নি অপহরণ করিয়া মানুষকে ইহার ব্যবহার শিখান। কিন্তু ভাষাতত্ত্বজ্ঞগণ বুঝাইয়াছেন যে, এই কাহিনী রূপক। অরণিদ্বয়-সঙ্ঘর্ষণে অগ্নির আবির্ভাব-রহস্য এই কাহিনীর মূর্ত্তি লইয়াছে। Prometheus = প্রমন্থ = কাষ্ঠে-কাষ্ঠে ঘর্ষণে অগ্নিমন্থন। ইহা এখনও বৈদিক যজ্ঞের অপরিহার্য্য অঙ্গ; উক্ত প্রক্রিয়া না কি অনেক বর্ব্বর জাতির মধ্যেও সুপরিজ্ঞাত। সাগ্নিক বা আহিতাগ্নিক গৃহিগণ যে বহু যত্নে অগ্নিরক্ষা করিতেন, তাহার মূলেও হয় ত এই তথ্য রহিয়াছে যে, তখন অগ্নি-উৎপাদন আয়াস-সাধ্য ব্যাপার ছিল। এই উপায় উদ্ভাবন করার পরই নিশ্চিত শবদেহ মৃত্তিকায় প্রোথিত করার পরিবর্ত্তে মুখ-অগ্নি ও অগ্নি-সংস্কার-প্রথার প্রবর্ত্তন হইয়াছিল।

এইরূপে মানব যখন স্বীয় উদ্ভাবনী শক্তির পরিচালনায় কৃত্রিম উপায়ে

অগ্নি-উৎপাদনে সফলকাম হইল, তখন সে অগ্নির দাহিকা ও প্রকাশিকা শক্তি, অর্থাৎ, তাপ ও আলোক উভয়ের উপকারিতাই বুঝিল, এবং উভয় প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্যই কৃত্রিম উপায়ে অগ্নি উৎপাদন করিতে লাগিল।

এই ঘর্ষণ-ব্যাপারের ক্রমিক উন্নতিতে চকমকি পাথর ও লোহায় ঠোকাঠুকি করিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উৎপাদন করিয়া তাহা দ্বারা শোলা ধরাইয়া সহজদাহ্য শুষ্কপত্র-কাষ্ঠাদিতে অগ্নি-সংযোগ করা হইত। আজ ইহারই চরম উন্নতি—'অগ্নিগর্ভদীপশলাকা' সকলের গৃহে-গৃহে (গৃহিণীর বালিশের নীচে ও কর্ত্তার শার্টের পকেটে) বিরাজ করিতেছে। হায়! এই চরম উদ্ভাবনের দিনে সে কাহিনীসৃষ্টির আমল (mythopoeic age), হিন্দু ও গ্রীক প্রভৃতি আর্য্যজাতির সে সুন্দর কল্পনা-প্রবণতার কাল কাটিয়া গিয়াছে, তাই আধুনিক কবি 'নমামি বিলাতী অগ্নি দেশলাইরূপী' বলিয়া 'নমোনমঃ' করিয়া সারিয়াছেন, দিয়াশলাইএর উদ্ভাবককে নচিকেতাঃ বা প্রোমিথিউসের ন্যায় উচ্চ আসন দেন নাই।

কথায়-কথায় অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। পূর্ব্বে বলিতেছিলাম যে, ঘর্ষণ-জনিত অগ্নিতে শুষ্কপত্র শুষ্ককাষ্ঠ প্রভৃতি সহজদাহ্য ইন্ধন যোগাইয়া মানুষ উত্তাপ ও আলোক উভয়ই উপভোগ করিতে লাগিল। কিন্তু কেবল আলোর জন্য প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বালিত করা, কিছুদিন পরে, একটু যেন (clumsy) বহ্বাড়ম্বর বলিয়া বিবেচিত হইতে আরম্ভ হইল। এ যেন বিশল্যকরণীর জন্য সমগ্র গন্ধমাদন-উৎপাটন! ক্রমে কন্‌গ্রেস্‌বাদীদিগের প্রস্তাবিত বিচারকার্য্য ও শাসনকার্য্যের পৃথক্‌করণের ন্যায় (separation of judicial and executive functions) আলো জ্বালা ও তাপ দেওয়ার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হইল। আলোর জন্য প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড জ্বালার পরিবর্ত্তে ভেরাণ্ডার বীজ ছালা করিয়া কাঠিতে গাঁথিয়া

তাহাতেই অগ্নিসংযোগ করা অথবা তৈলদায়ক কাষ্ঠ অথবা সেইরূপ পদার্থে প্রস্তুত মশাল জ্বালার ব্যবস্থা হইল। তাহার পর, মানুষ যখন তৈলদায়ক বীজ হইতে তৈল বাহির করিতে শিখিল, তখন ত ব্যাপার অতি সহজ, অতি সরল, অতি সংক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। কবিরাজী গাছগাছড়া এবং ডাক্তারী (extract) নির্য্যাসের মধ্যে যে প্রভেদ, আলো জ্বালার পূর্ব্বের বহ্বাড়ম্বর প্রণালী ও পরের সংক্ষিপ্ত প্রণালীর মধ্যেও সেই প্রভেদ।

সরিষা, মসিনা, রেড়ী, মহুয়া, নারিকেল প্রভৃতি হইতে তৈল বাহির করার সঙ্গে-সঙ্গে মানববুদ্ধি পলিতা বা সলিতা পাকান ও দীপনির্ম্মাণ প্রভৃতিও উদ্ভাবন করিল। তখন ঘরে-ঘরে সন্ধ্যা জ্বালা গৃহস্থের 'লক্ষণ' হইল, দেবোদ্দেশে দীপদান অর্থাৎ আকাশ-প্রদীপ, চৌদ্দ-প্রদীপ প্রভৃতি সজ্জিত হইল; দেবার্চ্চনে, আরতি ও বরণে তৈলের পরিবর্ত্তে পবিত্র ঘৃতের প্রদীপের প্রতিষ্ঠা হইল, বিবাহে শুভদৃষ্টির প্রবর্ত্তন হইল, বাসর-ঘরে সুন্দরীর হাট বসিল, সুখযামিনীতে নিরালায় বসিয়া দীপালোকে প্রেমিক প্রেমিকার মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিল।

অবশ্য ততদিনে মানুষ তরুতল বা গিরিগুহা ছাড়িয়া কুটীর বাঁধিয়া বাস করিতে শিখিয়াছিল। রাত্রিকালে গৃহে আলো জ্বালিতে পারাতে মানুষের অনেক সুখ-সুবিধা ঘটিল; এঘর ওঘর করিতে আর হোচট খাইয়া পড়িয়া যাইতে হয় না, দরকারী জিনিশ খুঁজিতে আর হাতড়াইতে হয় না, আহার্য্য দ্রব্যের সহিত খড়কুটা পোকা-মাকড় চিবাইতে হয় না, বিছানায় শুইতে গিয়া সাপ-বিছার দ্বারা নিগৃহীত হইতে হয় না। এ সব ত গেল মোটা কথা। সমস্তদিনের নানা শ্রমজনক কার্য্যের পর স্ত্রী-পুরুষ বিশ্রামক্ষণে পরস্পরের ও সন্তান-সন্ততির মুখ দেখিয়া বিমল আনন্দ লাভ করিল; কত আমোদ-আহ্লাদে, কত হাসি-গল্পে সময় কাটিতে লাগিল।

বাস্তবিক, যেমন গুড়ুকখোরের তামাকুর ধোঁয়া না দেখিতে পাইলে গুড়ুক টানার আয়েসটুকু সব মাটি হয়, তেমনি পরস্পরের হাস্যোজ্জ্বল মুখ দেখিতে না পাইলে হাসিঠাট্টাও মাঠে মারা যায়। তাই রসিকরাজ চার্লস্ ল্যাম্ব্ বলিয়াছেন—Jests came with candles; আলোক-উৎপাদনের উপায়-উদ্ভাবনের পূর্ব্বে মানুষ সন্ধ্যাকালে খাইত আর শুইত, হাসিগল্প গীতবাদ্য আমোদ-আহ্লাদ কিছুই জমিত না।

এ ত গেল গৃহে আলো জ্বালার সুখ-সুবিধার কথা। কিন্তু মানুষের আরও অসুবিধা আছে। অন্ধকার রাত্রে প্রয়োজন-বশে প্রতিবেশীর গৃহে বা গ্রামান্তরে যাইতে হইলে কি উপায়? জ্যোছনা-রাতে না হয় সরকারী আলোয় চলিতে পারে, কিন্তু নিশায়াং নষ্টচন্দ্রায়াং দুর্লভো মার্গদর্শকঃ। তখন দূর কুটীরের ক্ষীণ প্রদীপের আলোককেই ধ্রুবতারার মত লক্ষ্য করিয়া চলিতে হইত। আলেয়া জ্বলিলে ত বিপদ্ ঘনীভূত হইত। ঘরের দীপ হাতে করিয়া গেলে, দু'পা না যাইতেই, মুক্ত বায়ুতে সেটি নিবিয়া যাইত। ধুচুনী আড়াল দিয়া প্রদীপ রক্ষা করিয়া এঘর-ওঘর করা চলিলেও, এবাড়ী-ওবাড়ী এগ্রাম-ওগ্রাম যাওয়া চলে না। এই অসুবিধা দূরীকরণের জন্য কাচ বা অন্য কোন মসৃণ পদার্থে প্রস্তুত আলোকাবরণ অর্থাৎ হাত-লণ্ঠন উদ্ভাবিত হইল। আমাদের বাল্যকালে যেমন গৃহান্তরে বা গ্রামান্তরে নিমন্ত্রণ খাইতে যাইতে হইলে সঙ্গে জলপাত্র লইয়া যাইতে হইত, তেমনি রাত্রে গৃহ হইতে গৃহান্তরে বা গ্রামান্তরে যাইতে হইলে হাত-লণ্ঠন সঙ্গে লইবার ব্যবস্থা। আজও পল্লীগ্রামে এই প্রথা প্রচলিত। যেমন পকেট-ঘড়ী সঙ্গে থাকিলে সময় দেখা চলে, তেমনি হাত-লণ্ঠন হাতে থাকিলে পথ দেখা চলে। বীর-হনূমান্ আসল সূর্য্যকে বগলদাবা করিয়াছিলেন; ডারউইনের মতে যাঁহারা উক্ত মহাত্মার উত্তরপুরুষ তাঁহারা নকল সূর্য্যকে হাতে ঝুলাইলেন। সত্য-সত্যই এই সচল

আলো—'migratory lanthorn', 'vagabond pharos'*—সূর্য্য-চন্দ্র-তারার গার্হস্থ্য সংস্করণ নহে কি ?

ইহার পর, সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে নগরনির্ম্মাণ এবং আরও উন্নতির অবস্থায় রাস্তায় আলোকস্তম্ভ-নির্ম্মাণ। আফিস করিয়া, প্রাইভেট পড়াইয়া, বিবাহে নিমন্ত্রণ খাইয়া, থিয়েটার দেখিয়া, সাহিত্য-সঙ্গত করিয়া, আড্ডা দিয়া, যত রাত্তেই ফের, লণ্ঠন-হাতে বিব্রত হইবার দরকার নাই; অথচ নাক ভাঙ্গিবার, পা মচ্‌কাইবার, পরের ঘাড়ে পড়িবার, পথ হারাইবার ভয় নাই। এক সময়ে আমাদের প্রাচীন কবি (মৃচ্ছকটিক-কার) চন্দ্রকে 'রাজমার্গপ্রদীপ' বলিয়া ছোট করিয়াছিলেন। আর আজ আধুনিক ইংরেজ লেখক (Stevenson) রাস্তার সারি-সারি সাজান আলোককে 'Urban Stars', 'biddable domesticated stars'—'সহুরে তারা', 'আজ্ঞাকারী পোষমানা তারা' বলিয়া বড় করিয়াছেন। সময়ের কি পরিবর্ত্তন!

কথা-প্রসঙ্গে সভ্যতার অনেকগুলি ধাপ এক লম্ফে অতিক্রম করিয়া গিয়াছি। এক্ষণে আবার সেই আদিম (কিন্তু কৃত্রিম) প্রদীপ বা চেরাগের কথা তুলিব। সভ্যতার ক্রমিক বিকাশে এই নূতন আলোর নানা দোষ ধরা পড়িতে লাগিল। তেল-সলিতার প্রদীপ নোংরা ও জবরজঙ্গ, সলিতা-পাকান অকারণ পরিশ্রমের কায, ফর্শা নেকড়ার সলিতা না হইলে আলো মিটমিট করে, তৈলও সাফ না হইলে আলো ঘোলাটে হয়; মিনিটে-মিনিটে সলিতা উস্কান, কোয়ার্টারে-কোয়ার্টারে নূতন সলিতার যোগান দেওয়া, ঘণ্টায়-ঘণ্টায় প্রদীপে তেল ঢালা—সবই

* এই প্রবন্ধের কোন-কোন স্থলে ভাব ও ভাষার ভঙ্গী R. L. Stevensonএর 'A Plea for Gas-lamps'-নামক উপাদেয় প্রবন্ধ হইতে গৃহীত।

ক্লেশকর; পরন্তু তেল ঢালা ও প্রদীপ উস্কান বড় নোংরা কাজ; আবার প্রদীপের দিকে সর্ব্বদা নজর রাখিতে হয়,—কখন তেল দিতে, সলিতা উস্কাইতে বা নূতন সলিতা যোগাইতে হইবে; সুতরাং কাযে মনঃসংযোগ হয় না। যতক্ষণ জ্বলিবে, ততক্ষণ জ্বালাইবে। ইহা ছাড়া বর্ষা হইলে পোকা-পড়ার ভয়, বাতাস হইলে নিবিবার ভয়। আবার অনাবৃত প্রদীপের শিখায় অসাবধানে কাপড়-চোপড় ধরিয়া গিয়া গৃহদাহ ঘটাও বিচিত্র নহে। গেলাসে জল ও তেল ঢালিয়া পতিঙ্গেয় পলিতা পরাইয়া আলোর ব্যবস্থা ইহার অপেক্ষাকৃত উন্নত সংস্করণ।

এই সব দোষ পরিহার করিবার চেষ্টায় মানুষ ইহা অপেক্ষা ছিমছাম আলোর উদ্ভাবন করিল—মোমবাতি ও চর্ব্বির বাতি। কঠিন পদার্থকে দ্রব করিয়া আবার পিণ্ডাকারে কঠিন করা হইল, দ্রব অবস্থায় কৌশলে তাহার মধ্যে পলিতা প্রবেশ করান হইল, প্রজ্জ্বলিত পলিতার উত্তাপে ক্রমে-ক্রমে আবার সেই কঠিন পদার্থ দ্রব হইয়া ইন্ধন যোগাইতে থাকিল; পুনঃ-পুনঃ তেল-সলিতা যোগান, সলিতা উস্কান, কিছুরই প্রয়োজন হইল না। এই আলোক বড় স্নিগ্ধ, বড় মিঠে, সুন্দর ও শোভন। কিন্তু ইহা ব্যয়সাধ্য, বাবুগিরির, বড়মানুষির, বিলাসের জিনিশ। হয় ত অধিক বিলাস-ব্যসনে শেষে 'লালবাতি' জ্বালিতে হয়! রাজনন্দিনী প্যারী শ্যাম-কালাচাঁদের আশায় 'জ্বালায়ে মোমের বাতি, সারারাতি' জাগিয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু দরিদ্রের সেই চেরাগ ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

যাহা হউক, বাতিতে চেরাগের অন্যান্য দোষ নিরাকৃত হইলেও পোকা-পড়ার ও বাতাসে নিবিয়া যাওয়ার এবং অকস্মাৎ ব্রহ্মার কোপের ভয় গেল না। এই ত্রিদোষের প্রতিবিধানের জন্য আলোকের আবরণ লণ্ঠন-ফানুশের প্রচলন হইল। দরিদ্রের চেরাগ অবশ্য বাড়তী খরচের ভয়ে এইরূপ আবরণের আশ্রয় পায় না। কিন্তু মহাজনের গদির

গেলাসে-জ্বালা রেড়ীর বা নারিকেল তৈলের আলো এবং সৌখীন লোকের বাতির আলো লণ্ঠন-ফানুশের স্বচ্ছ কাচের ভিতর হইতে খোলে ভাল। ঝাড়-লণ্ঠন-ডেলে ঝাড়ের ভিতর যখন এই বাতির বাহার সহস্রগুণে বর্দ্ধিত হয়, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে।

এই দুই রকম আলো—গরিবের সম্বল চেরাগ, আর বড়লোকের বাতি—জগতে বহু শত, বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছিল; আসিতেছিল কেন, আজও বহু গৃহে চলিতেছে। কিন্তু হালে মানুষের অনুসন্ধিৎসা মাটীর ভিতর হইতে মেটে তৈল (rock oil) বাহির করিয়া আলোকজগতে একটা বিপ্লব বাধাইয়াছে। সস্তার কল্যাণে ইহার অবাধ প্রসার হইয়াছে। আজ এই কেরসিনের দাপটে সরিষা, মসিনা, রেড়ী, মহুয়া প্রভৃতির তৈলের রেওয়াজ উঠিয়া যাইতেছে। দুর্গন্ধে ও ধূমোদ্গারে নাক জ্বলিয়া যাইতেছে, আলোকের তীব্রতায় মাথা ধরিয়া উঠিতেছে, চক্ষুঃ ঝলসিয়া যাইতেছে, এমন কি অকালে দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে, বিষাক্ত সূক্ষ্ম অঙ্গারকণা খাদ্য-পেয়ে ছড়াইয়া পড়িয়া স্বাস্থ্যহানি করিতেছে, হঠাৎ আগুন ধরিয়া উঠিয়া (explosion) কত ঘরবাড়ী পাটতলা জ্বলিয়া যাইতেছে, কত মানুষ পুড়িয়া মরিতেছে, জলবত্তরলম্ তীব্রবিষ ছেলেবুদ্ধিতে পান করিয়া কত শিশু মৃত্যুমুখে পড়িতেছে, শুধু মর্ম্মান্তিক বেদনায় কেন, সামান্য অভিমানে কত নারী পরিধেয় বস্ত্রে এই অত্যন্ত-সহজদাহ্য পদার্থ নিষিক্ত করিয়া অগ্নিকাণ্ড ঘটাইয়া জীবনবলি দিতেছে,—আর অর্থনীতিবিশারদ আমরা 'সস্তার তিন অবস্থা'র হিড়িকে অটল-অচল-ভাবে বীরাসনে বসিয়া—এই লেলিহান অগ্নিশিখার স্তবপাঠ করিতেছি,—

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
যা দেবী ঘরদ্বারেষু **সস্তা**-রূপেণ সংস্থিতা ॥

যাক্, আর এত ওজোগুণসম্পন্ন বক্তৃতার প্রয়োজন নাই ; অন্য কথা বলি। মানব-বুদ্ধির অনুসন্ধিৎসা-প্রবৃত্তির, আবিষ্ক্রিয়া-ক্ষমতার, উদ্ভাবনী শক্তির সীমা নাই। মানবের সূক্ষ্মবুদ্ধি কঠিন পদার্থ কাঠ-খড়-পাতায় অগ্নিসংযোগ করিয়া আলোক নিষ্কাশন করিল, তাহার পর কঠিন বীজ সরিষা-মসিনা প্রভৃতি হইতে তরল তৈল বাহির করিয়া, কৌশলে ঘৃত ও বসা প্রস্তুত করিয়া, মধু-মক্ষিকার শ্রমজাত মোম লইয়া, সুরাসার (spirit) চোঁয়াইয়া, আলোকের ইন্ধন-স্বরূপ ব্যবহার করিল ; কিন্তু কঠিন ও তরল পদার্থেও সন্তুষ্ট না হইয়া বায়বীয় পদার্থকেও আলোকের ইন্ধন-রূপে নিয়োজিত করিতে প্রবৃত্ত হইল ; অধ্যবসায়ের ফলে গ্যাসের আলো জ্বলিল। ইহাকে সামলাইতে পারিলে ইহা নিরাপদ্, কিন্তু leak করিলে দুর্গন্ধের অসুবিধাও আছেই, প্রাণের আশঙ্কাও আছে। একদম জ্বলিয়া উঠিলেও সমূহ বিপদ্। যাহা হউক, ইহার আলো কেরসিনের আলো অপেক্ষা মৃদু ও স্নিগ্ধ, অথচ অন্য তৈলের আলো অপেক্ষা প্রখর। সেইজন্য golden mean ('মধ্যমা প্রতিপৎ'!) বলিয়া ইহার প্রশংসা করিতে হয়। সভ্যতার কেন্দ্র সহর-জায়গায় ইহার যথেষ্ট প্রসার হইয়াছে। শুধু গৃহে-গৃহে কেন, রাজমার্গেও। সেকেলে রেড়ী বা নারিকেল তৈলের ও একেলে কেরসিনের লণ্ঠনের বদলে এখন সারি-সারি গ্যাসের আলো জ্বলিতেছে, সন্ধ্যা-তারার সঙ্গে-সঙ্গে মিউনিসিপ্যালিটির মশালচীরা মইএ চড়িয়া এক অভিনব স্বর্গের দ্বার খুলিয়া দিতেছে—'খোল খোল দ্বার, খোল শীঘ্রগতি, হিরণ্ময় দ্যুতি যা'র!'

তাহার পর একদিন মার্কিন মুল্লুকে (এ রাজ্যে সকলই অদ্ভুত) মেঘলার দিনে বুড়ো খোকা বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের হাতে কোন কায ছিল না ; কমলবিলাসী বাঙ্গালীর মত এমন দিনে 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর

টুপুর' বা 'এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর', 'মেঘৈর্মেদুরমম্বরম্' বা 'আষাঢ়স্য প্রথম-দিবসে' আবৃত্তি করিবারও প্রবৃত্তি ছিল না; তাই তিনি মনের খেয়ালে ঘুড়ী উড়াইতেছিলেন, আর মেয়েলি ছড়ার খোকাবাবু যেমন সাগর-জলে ছিপ ফেলিয়া রাঘব-বোয়াল ধরিয়াছিলেন, অথবা সমুদ্র-মন্থনে দেবাসুরগণ যেমন লক্ষ্মীকে সমুদ্র হইতে টানিয়া তুলিয়াছিলেন, তেমনি তিনি আকাশ-সমুদ্র হইতে, ব্যোমবপুঃ পয়োধি হইতে, সৌদামিনী-সুন্দরীকে বন্দী করিলেন। (রাবণের অত্যাচার ইহার তুলনায় ছেলেখেলা!) বাঙ্গালী কবি অমনি গায়িয়া উঠিলেন, 'বজ্রশিখা ধরে' সুকার্য্য-সাধনে প্রবৃত্ত হও!' সেই অবধি চঞ্চলা চপলা মানবের 'হস্তদাসী' (handmaid)! পাখাটানা * হইতে আলো জ্বালা পর্য্যন্ত সকল কায এই হাত-নুরকুতের জিম্মায়। দাসীকে উচ্চকণ্ঠে ডাকিতে হয় না, গায়ে জল ঢালিয়া দিয়া জাগাইতে হয় না, মৃদুহস্তে বোতাম টেপ, আর দাসী হুজুরে হাজির—সারা ঘর, সারা বাড়ী, সারা রাস্তা, সারা সহর, আলোয় আলো! তারা ফুটছে লাখে-লাখে ঝাঁকে-ঝাঁকে, কি আজব কারখানা! 'চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা, কোথায় উজল এমন ধারা!'

আমরা কিন্তু তড়িৎ-সুন্দরীর তত পক্ষপাতী নহি। ইহাতে 'উজ্জ্বলে-মধুরে' মিশে না। এই বিজলী-বাতি চোখ-ঝলসান; গ্যাসের আলোর মত মধুর-স্নিগ্ধ নহে। গ্যাস leak করার মত তীব্র দুর্গন্ধ বাহির না হইলেও, ইহারও fuse পুড়িলে একটা দুর্গন্ধ বাহির হয়; আর আকস্মিক

* আমার কিন্তু মনে হয়, সৌদামিনী-সুন্দরীকে দিয়া পাখাটানান, আর বৃষোৎসর্গের ষাঁড়কে দিয়া ময়লা-ফেলা গাড়ী টানান সমান (sacrilege) অধর্ম্ম! তবে আসল কথা, মানবের কাযে লাগাইতে প্রকৃতপক্ষে মেঘের কোলের সৌদামিনীকে টানিয়া আনা হয় না, উহার একটা ঘরোয়া হাতগড়া সংস্করণ প্রস্তুত করা হয়।

বিপদের আশঙ্কা গ্যাস বা কেরসিনের চেয়ে ইহাতে কোনও অংশেই ন্যূন নহে। আবার কল বিগড়াইলে ইহার আলো একদম নিবিয়া যায়; তখন ইন্দ্রভুবন চৌরঙ্গীতেও চর্ব্বির বাতি বা পিদিম জ্বালিয়া 'পুনর্মূষিক' হইতে হয়। ইহার সরঞ্জামীখরচ চড়া হইলেও, মোটের উপর ইহার সরবরাহ সস্তা পড়ে। সুতরাং এই অর্থনীতির আমলে, পরন্তু, এই বিলাসিতার মরসুমে, ইহার অবাধ-বাণিজ্য অপ্রতিবিধেয়। তথাপি আবার বলি, এই চোখ-ঝলসান, চমক-লাগান, আলো চমৎকার হইলেও, আমাদের তত মনঃপূত নহে। যদি এই ঘোর কলিকালে, তথাকথিত সভ্যতার কেন্দ্রে-কেন্দ্রে, সহরে-সহরে, বিলাস লালসার, বড়মানুষী ব্যসনের, অনাচারের, পাপাচারের নারকীয় দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত করিতে চাও, পাপপুরীর, মানবসৃষ্ট নরকের, সভ্যসমাজের অন্ধ তমসাচ্ছন্ন নিভৃত কোণ-কোণাচ পর্য্যন্ত search-light দ্বারা expose করিতে চাও, তবে এই তীব্র আলোক জ্বাল। আর যদি বিলাস-সাগরে গা ঢালিয়া না দিয়া, শান্ত শুদ্ধ সংযত চিত্তে সুখময় গৃহ-নীড়ে স্বাভাবিক-ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া বিমল সুখ ও শান্তি পাইতে চাও, তবে আবার সেই পিতৃ-পৈতামাহিক প্রদীপের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা কর।

যেনাস্য পিতরো যাতাঃ যেন যাতাঃ পিতামহাঃ।
তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেন যাস্যন্ন দূষ্যসে॥

পরন্তু ইহাতে পরের মুখ চাহিয়া থাকিতে হইবে না, গ্যাস বা বিজলী-বাতির বিরাট্ কারখানার উপর নির্ভর করিতে হইবে না, সামান্য সরঞ্জাম নিজেরই আয়ত্ত। শাস্ত্রেও বলে, 'সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্।'

কিন্তু সতত-চঞ্চল মানব-মন কি এইখানেই ক্ষান্ত থাকিবে? 'So far shalt thou go and no farther' এই বিধিনিষেধ সে কি মানিবে?

গেটের সেই মৃত্যুকালীন উক্তি—'Light, light, more light'—সভ্য মানবের ইষ্টমন্ত্র হইয়াছে; তাই ভয় হয়, তাহার আবিষ্কার-প্রবৃত্তি, উদ্ভাবনী শক্তি, অনুসন্ধিৎসা, ভোগ-বাসনা, এইখানেই উপশান্ত হইবে না; বিংশ শতাব্দী শেষ না হইতেই সে আরও উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া, চাল্‌শে-ধরা চোখের চশমার নম্বর চড়ানর ন্যায়, ব্রহ্মচারীর বছর-বছর বেড়া বদ্‌লানর ন্যায়, বিজলী-বাতির উপর টেক্কা দিয়া, (radium) রেডিয়ামের আলোকে নরদেহের প্রত্যেক শিরা-উপশিরা পর্য্যন্ত সকলের গোচর করিয়া দিয়াই নিবৃত্ত হইবে না, এই তীব্রতম আলোক-সম্পাতে সমস্ত জগৎ ভাসাইয়া দিবে। তখন কেরসিন, কার্ব্বাইড, গ্যাস, স্পিরিট, বিজলী-বাতি—সকল আলোই এই রেডিয়ামের কাছে ম্লান হইবে।

সংস্কৃত-সাহিত্যে কবিত্বের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে উদ্ভট শ্লোক আছে—

তাবদ্ভা ভারবের্ভাতি যাবন্ মাঘস্য নোদয়ঃ।
উদিতে নৈষধে কাব্যে ক্ব মাঘঃ ক্ব চ ভারবিঃ॥

আলোকের ক্রমবিকাশ-সম্বন্ধেও উদ্ভটসাগর মহাশয় এইরূপ একটি শ্লোক সংগ্রহ করিতে পারেন না কি?

চুট্‌কী

(ভারতী, ভাদ্র-কার্ত্তিক-পৌষ-চৈত্র ১৩১১)

১। গৌরচন্দ্রিকা।
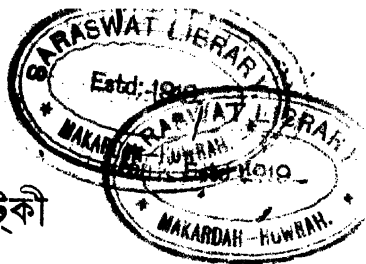
সকল দেশের সাহিত্যেই চুট্‌কীর আদর আছে, বিশেষতঃ ফরাসী ভাষায় এই প্রকারের সাহিত্য অতুলনীয়। La Rochefoucauld, La Bruyere প্রভৃতি রসিক লেখকগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প চুট্‌কী (Maxims) ফরাসী ভাষার অলঙ্কার। অবশ্য ইংরেজী ভাষায়ও এই ধরণের সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়াস হইয়াছে। বেকনের মত মহাজ্ঞানীও এই প্রণালীতে কতকগুলি apophthegms লিখিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। তবে সেগুলিতে ফরাসী-সাহিত্যোচিত সরসতা নাই। সুইফ্‌টের রসাল লেখনীও এই ধরণের চুট্‌কীর সৃষ্টি করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু সেগুলিও ফরাসী ভাষার চুট্‌কীর ন্যায় মোলায়েম হয় নাই। ফরাসী ভাষার ল্যাটিন ভাষার সহিত নিকটসম্বন্ধ থাকার দরুণই হউক, অথবা অন্য কোনও অনির্দ্দেশ্য কারণবশতঃই হউক, ফরাসী সাহিত্যে যেরূপ সরসতা ও কোমলতা দেখা যায়, ইংরেজী সাহিত্যে সেরূপ নাই। ইংরেজী গল্প কিছু কঠোর, কিছু একঘেয়ে, ইহাতে ফরাসী সাহিত্যের বিচিত্র ভঙ্গী নাই। বোধ হয় এই জন্যই ফরাসী ভাষায় চুট্‌কীসাহিত্যের এতটা খোল্‌তাই হয়।

আমার বিশ্বাস, বাঙ্গালা ভাষার সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে নিকটসম্বন্ধ থাকার দরুণই হউক, অথবা অন্য কোনও অনির্দ্দেশ্য কারণবশতঃই হউক, বাঙ্গালা ভাষারও ফরাসী ভাষার ন্যায় কোমলতা, সরসতা ও ভাষালীলার বিচিত্র ভঙ্গী যথেষ্ট পরিমাণে আছে। আশা হয়, প্রতিভাশালী লেখকের হাতে পড়িলে এ ধরণের সাহিত্য খুলিবে ভাল। অতি অল্প কথায় নর-চরিত্রের বা মনুষ্যজীবনের কোন একটা জটিল তত্ত্ব সরল অথচ সরস ভাষায় প্রকাশ করাই এই প্রকারের সাহিত্যের বিশিষ্টতা; একটু রসিকতা থাকিবে, কিন্তু তাহা হাল্কা হইবে না, ভাবটি গভীর হইবে অথচ তাহাতে বিকট গাম্ভীর্য্য থাকিবে না, চাই-কি একটু বিদ্রূপের কটাক্ষ থাকিবে অথবা করুণার অন্তঃসলিল প্রবাহ ধীরে বহিয়া যাইবে। এইরূপে উজ্জ্বলে মধুরে মিশিলেই এই প্রকারের সাহিত্য সার্থক হয়।

আমাদের কেমন প্রকৃতি, আমরা লিখিতে গেলেই লম্বা-চওড়া গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সামাজিক, সাহিত্যিক গবেষণা আসিয়া পড়ে, অথবা কবিতার আগ্নেয় উচ্ছ্বাস দশ যোজন ধরিয়া উদ্গীর্ণ হইয়া পড়ে। চুট্‌কী লেখাটা আমাদের মাথায় আসে না; আমরা skull-capএর আদর বুঝি না, মস্তকের শোভাসমৃদ্ধি দেখাইতে বিশ গজ থান দিয়া পাগড়ী বানাই, সমস্ত ইন্দ্রিয়-দ্বার বন্ধ করিয়া বিরাট্ বুদ্ধিমান্ 'হবচন্দ্র রাজার গবচন্দ্র মন্ত্রী' সাজিয়া বসি; চুট্‌কী লিখিতে কেমন মায়া করে, এত বড় প্রতিভাটা তুচ্ছে মাটী করিব? আমরা ভুলিয়া যাই যে, মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির বলে শূন্যে ভ্রাম্যমাণ সৌরজগৎ সৃষ্টি করিতে বিধাতা যে কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন, সুন্দরীর নাসিকায় দোদুল্যমান ক্ষুদ্র মুক্তাটির নির্ম্মাণেও তাহা অপেক্ষা কম কৌশলের পরিচয় দেন নাই।

২। পাঁপরভাজা।

বিদ্রূপশ্লেষাত্মক কাব্য (satire) সাহিত্যফলারে পাঁপরভাজা। বেশ মুখরোচক বটে, কিন্তু অধিক খাইলে পেট-গরম ও বদহজম হয়, রুচি-বিকার ঘটে, সাধারণ খাদ্য আর ভাল লাগে না। আরও দেখুন, পাঁপর কাঁচা অবস্থায় অখাদ্য, মুখে তুলিতে ইচ্ছা করে না, দাঁতে জড়াইয়া যায় কিন্তু ঘিয়ে ভাজিয়া গরম-গরম পাতে দিলে তোফা কুড়-মুড় করে, খাইতে বড় আরাম। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ জিনিশটারও সামাজিক কদাচার, পারিবারিক কুৎসা, ব্যক্তিবিশেষের কুৎসিত চরিত্র ইত্যাদি কদর্য্য উপকরণ। সেই কাঁচা অবস্থায় ঐ সব কুৎসা শুনিলে ভদ্রলোকে কাণে আঙ্গুল দেন, শুনিতে কেমন যেন বাধ-বাধ ঠেকে; কিন্তু যখন সাহিত্যে সিদ্ধহস্ত হালুইকরের আর্ট-রূপ ঘিয়ে ভাজিয়া সেই পরনিন্দা-রূপ কদর্য্য মাল পাঠকের পাতে দেওয়া হয়, তখন সেটা বড় উপাদেয় লাগে।

৩। পাকা আম ও কাব্যসমালোচনা।

গল্প শুনা যায়, এক দেশের রাজা জানিতে চাহিয়াছিলেন আম খাইতে কি রকম? (সে দেশটা অবশ্য হনুমান্‌জির প্রসাদে বঞ্চিত।) মন্ত্রী বলিলেন, 'মহারাজ, এক সের গুড় আর এক সের তেঁতুল যোগাড় করুন। আমি আপনাকে আম খাওয়াইতেছি।' জিনিশ দুইটি যোগাড় হইলে মন্ত্রী নিজের লম্বা দাড়ীতে তেঁতুলগোলা ও গুড় বেশ করিয়া মাখিয়া মহারাজকে চাটিতে বলিলেন। রাজা বুঝিলেন—আমের স্বাদ অম্লমধুর আর তাহার কতকটা আঁশ আছে।

অনেক সমালোচক লম্বাদাড়ীর সাহায্যে এই ভাবে কাব্যের উপাদান-বিশ্লেষণ করেন। ডিকন্‌সের সমালোচনায় (a curious blending of humour and pathos) রসিকতা ও করুণরসের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ বলিয়াই কথাটায় ইতি দেন। কিন্তু ইহাতে কি ডিকন্‌সের প্রতিভার স্বরূপনির্ণয় হয়? জলজান ও অম্লজান চাখিয়া দেখিলে কি জলের স্বাদুতা স্নিগ্ধতা অনুভব করা যায়?

৪। আধুনিক প্রেমের কবিতা।

আজকালকার প্রেমের কবিতাগুলিকে বাজারের খাবারের সঙ্গে তুলনা করিতে ইচ্ছা করে। খাবারের দোকান এখন অলিতে-গলিতে, পঞ্চাশ বৎসর আগে এমনটা ছিল না; কবিতাও এখন ছাপাখানার কল্যাণে মাঠে-ঘাটে। আগে লোকে মুড়ি ও ঝুনা নারিকেল খাইত, খাদ্যটা কিছু নীরস ও শুক্‌না গোছের, কিন্তু বড় পুষ্টিকর; এখন মুটে-মজুরও গজা-জেলাপি খায়। আগে লোকে যাত্রা, কবি, পাঁচালী, কথকতা, কীর্ত্তন শুনিত; তখনকার চণ্ডীর গান, শ্রীধর্ম্মমঙ্গল, মনসার ভাসান প্রভৃতিতে ধর্ম্মপ্রসঙ্গই থাকিত; জিনিশটায় হয়ত তত রসকস ছিল না, কিন্তু তাহাতে আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি ও পরিপুষ্টি হইত। আর তাহার জায়গায় এখন প্রেমের কবিতার ছড়াছড়ি, অজাত-শ্মশ্রু বালক হইতে অশীতিপর বৃদ্ধ পর্য্যন্ত থিয়েটারী ছন্দে প্রেমের ছড়া কাটিতে ব্যস্ত।

খাবারের দোকানে থরে থরে হরেক রকম খাবার সাজান, দেখিতে বড় বাহার, কিন্তু খাইলেই অম্বল হয়, বুক জ্বলে, গলা জ্বলে, দুই এক ঝলক বমি হইয়া উঠিয়াও যায়। মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠায়ও নানা কবি কবিতার পশরা সাজাইয়া বসিয়া আছেন; সে সব প্রেমের কাহিনী পড়িতে গেলেই কিন্তু হৃদয়ে জ্বালা ধরে, পাঠকেরও কবিত্বের ফোয়ারা এক আধটু ঝরিতে থাকে। টাট্‌কাভাজা কচুরি নিম্‌কি জেলাপি বেশ মুচ্‌মুচে, মুখে দিলে মিলাইয়া যায়; কিন্তু একটুখানি জুড়াইয়া গেলেই বাদামের তেলের গন্ধ ছাড়ে, মুখে দিতে ইচ্ছা করে না। কবিতাগুলিও, মাসিক পত্রিকার পাতা কাটিয়া পড়িবার সময়, বেশ মোহকর—বেশ প্রাণের সঙ্গে মিশিয়া যায়; কিন্তু একটু জুড়াইয়া গেলে, স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে, বাস্‌টে গন্ধ ছাড়ে, পুস্তক পড়িতে প্রবৃত্তি হয় না। খাবারের দোকানগুলি না উঠাইলে, সহরের স্বাস্থ্য ভাল হইবে

না, প্রেমের কবিতার হাট না ভাঙ্গিলেও সমাজের স্বাস্থ্য শোধরাইবে না। [নবীন পাঠক হয় ত বলিবেন, লেখককে অম্ল ও অজীর্ণ রোগে ধরিয়াছে।]

৫। প্রকৃতিভেদে প্রহরণ।

নারীজাতি (অবশ্য ইতর শ্রেণীর কথা বলিতেছি) কলহকালে নখদন্তের প্রয়োগ করেন। কেননা তাঁহারা নরখাদক-পর্য্যায়ভুক্ত, হিংস্রজীবের আয়ুধব্যবহার তাঁহাদের পক্ষে স্বতঃসিদ্ধ। অনেকের ক্ষুরধার রসনাই নখদন্ত অপেক্ষাও শাণিত অস্ত্র। আবার তাঁহারা বিবাহকালে পিতা বা অন্য অভিভাবকের মস্তক ভক্ষণ ও বিবাহের পরে স্বামিনামক জীবটির মস্তক-চর্ব্বণ করেন। অতএব তাঁহারা যে নরখাদক-পর্য্যায়ভুক্ত, তদ্‌বিষয়ে আর দ্বিতীয় প্রমাণ আবশ্যক নাই।

বাঙ্গালীবাবুরা দক্ষিণহস্তের ব্যাপারে বেশ পটু। তাই ক্রোধের উদ্রেক হইলে ইঁহারা ডান হাত তুলিয়া চড়টা-চাপড়টা মারেন। (ডার্‌উইনের শিষ্যগণ অবশ্য অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিবেন।) তবে আজ-কালকার ফুটবল্‌-বীর ইয়ং-বেঙ্গলের বেলায় দেখিতে পাই, পশুদের চাটমারার মত কিক্‌টাই ইঁহাদিগের স্বাভাবিক। হাত ও পায়ের ব্যবহারের এই তফাৎটা দ্বারাই মনুষ্যপ্রকৃতিক ও পশুপ্রকৃতিক (তা দ্বিপদই হউক আর চতুষ্পদই হউক) প্রাণীর প্রভেদটা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

৬। Absolute value ও Local value.

আমাদের সমাজের অধিকাংশ স্ত্রীলোক সংখ্যাতত্ত্বে শূন্যজাতীয়। শূন্যের নিজের কোন মূল্য নাই; যে সংখ্যার পাশে বসে তাহার জোরে ইহার মূল্য হয়। নারীর বেলায়ও সেই কথা। যথা, মুনসেফ বাবুর

গৃহিণী বলিয়া এক নারীর আদর, জমীদারের ঘরণী বলিয়া আর এক নারীর আদর ইত্যাদি। আবার ইঁহারাই যদি হরিপোড়া বামুন বা নাঙ্গুলা-কায়েতের ঘরে যাইতেন, তাহা হইলে ইঁহাদের কেহ পুঁছিত না! শুধু প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে এই ইতরবিশেষ। Absolute value এবং Local valueর প্রভেদ ইহা হইতে বেশ বুঝা যায়।

আবার দেখুন, শূন্য যে সংখ্যার পাশে বসে তাহার মূল্য দশ গুণ বাড়াইয়া দেয়। যে পুরুষের সদ্‌গৃহিণী যোটে, তাঁহার ঘরে লক্ষ্মী অচলা হইয়া থাকেন, তাঁহার এক আড়ি ধানে দশ আড়ি হয়, তাঁহার ধূলামুঠাটা সোণামুঠা হইয়া যায়। তবে যে সকল নারী সদ্‌গৃহিণীও নহেন, স্বামীর প্রতি অনুরাগিণীও নহেন, তাঁহারা যেন ডাহিনে যেতে বাঁয়ে যান, তাহাতে স্বামীর আয়পয় দেখে না। তাঁহারা যে শূন্য সেই শূন্যই থাকিয়া যান, পরন্তু পার্শ্ববর্ত্তী স্বামীটিকেও অপদার্থে পরিণত করেন।

৭। ঘোমটা।

বঙ্গসুন্দরীগণের মাথায় ঘোমটা দেখিলেই আমার ঘেরাটোপের কথা মনে পড়ে। অনুপ্রাসের অনুরোধে নহে, প্রকৃতিগত সাদৃশ্য দেখিয়া। মূল্যবান্ বাক্স-পেট্রার রং পাছে উঠিয়া বা জ্বলিয়া বা ময়লা হইয়া যায়, ধূলামাটী পড়ে, সেই জন্য সৌখীন লোকে বাক্স-পেট্রা ঘেরাটোপ দিয়া ঢাকিয়া রাখে। (অনেক সৌভাগ্যবতীকেও ক্যাশবাক্স বলিয়া জ্ঞান হয়।) রূপসীদের চাঁদমুখ পাছে ময়লা হইয়া যায়, তাই ঘোমটার সৃষ্টি। মুখখানি সর্ব্বদা ঢাকিয়া ঘিরিয়া রাখিলে বেশ কচি চলচলে থাকে। জ্যোতির্ব্বিদগণ কিরূপ বুঝেন জানি না, তবে আমার ধারণা যে, বিধাতা যদি চাঁদের উপর একটা চন্দ্রাতপ খাটাইয়া দিতেন, তাহা হইলে চন্দ্রে কলঙ্কের দাগ পড়িত না।

৮। চোগা।

চোগাটা ঠিক যেন গিন্নীমানুষের ঘোম্‌টা, মাথায় নামমাত্র দেওয়া অথচ মুখটা ঢাকা পড়িবে না। একটু না দিলেও আবার কেমন ন্যাড়া-ন্যাড়া দেখায়। চোগাও ঠিক তাই, চাপকানের উপর না পরিলেও ভাল দেখায় না, অথচ পরিলেও আল্‌গাভাবে পরিতে হয়, বোতাম আঁটিয়া বুকটা ঢাকিয়া ফেলা বিধি নহে।

৯। মৃন্ময় পাত্র ও কাংস্যময় পাত্র।

অনেক স্ত্রীলোকের রূপ নাই, কিন্তু কেমন একটা মধুর আকর্ষণী শক্তি আছে; সেই গুণে তাহাদের সাহচর্য্যে শান্তি ও প্রীতিলাভ হয়, হৃদয় স্নিগ্ধ ও সরস হয়। এগুলি মাটীর নাগরী, কিন্তু ইহাদের হৃদয়ে সঞ্চিত প্রেমরস, খর্জ্জুররসের ন্যায়, মধুর ও শীতল। আর অনেক রমণীর রূপযৌবন সবই আছে, কিন্তু সে উদ্দাম সৌন্দর্য্যে আকর্ষণী শক্তি নাই, তাহাতে মন মজে না, প্রাণ টানে না। এগুলি পিতলের ঘড়া, বাহিরে মাজাঘষা তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে, কিন্তু ভিতরে বন্যার ঘোলা জলে পরিপূর্ণ; প্রেমতৃষ্ণানিবারণের জন্য 'স্বাদুঃ সুগন্ধিঃ তুষারা বারিধারা' উছলিয়া পড়ে না।

১০। ন পুংস্বাতন্ত্র্যমর্হতি।

ভগবান্ মনু বলিয়াছেন 'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি', স্ত্রীলোক কোনও বয়সেই স্বাধীন নহে। সেকালে এইরূপই ছিল বটে। কিন্তু 'কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ' অর্থাৎ কলিতে সবই উল্টা। এখনকার দিনে পুরুষ কোনও বয়সেই স্বাধীন নহে। বাল্যে মাতার বা পিসি-মার, যৌবনে পত্নীর বা তৎসদৃশী অন্য কাহারও, আর প্রৌঢ়াবস্থায় কন্যার অধীন অর্থাৎ

কন্যাদায়গ্রস্ত। অতএব শাস্ত্রীয় বচনটি কলিতে ঈষৎ পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়েন :—

মাতা রক্ষতি কৌমারে পত্নী রক্ষতি যৌবনে।
ভক্ষন্তি স্থাবিরে পুত্রাঃ ন পুংস্বাতন্ত্র্যমর্হতি ॥

১১। রেলেটিভ প্রোনাউন।

রেলগাড়ীতে অনেক সহযাত্রী দেখা যায়, তাহারা হাজার অনুরোধেও নিজের জায়গা ছাড়িয়া একচুলও নড়িবে না, নিজের আস্‌বাব-পত্র এক ইঞ্চিও সরাইবে না। নেহাত ধরিয়া বসিলে হয়ত নিজে একটু সরিয়া পেট্‌রাটি সেইখানে রাখিয়া ভদ্রতা রক্ষা করে। ইহাদের ব্যবহার দেখিলে ইংরেজীভাষার রেলেটিভ প্রোনাউনের কথা মনে পড়ে। রেলেটিভ প্রোনাউন যে জায়গাটা দখল করিয়া বসে, সেখান হইতে কোনও কারণেই সরিবে না। কেবল, যদি তাহার পূর্ব্বে একটা preposition বসাইবার প্রয়োজন হয়, তবে সেই জন্য একটু জায়গা ছাড়িয়া দিয়া একটু হটিয়া বসে, ঠিক যেন নিজের আস্‌বাব রাখিবার জন্য একটু সরিয়া বসা।

১২। সেকাল আর একাল

সেকালের লোকে স্নানান্তে শুদ্ধবস্ত্রে কোশাকুশী, টাট, তাম্রকুণ্ড লইয়া বসিতেন, তাহাতে পূজার উপকরণ, গঙ্গাজল, ফুল, বিল্বপত্র, তুলসী, চন্দন থাকিত। আর একালের যুবকযুবতীরা স্নানের পরেই আয়না, চিরুনী, ব্রুস লইয়া বসেন, পাউডার, রুব্, পমেটম এসেন্সের সদ্ব্যবহার করেন। 'একেই কি বলে সভ্যতা'?

১৩। দেশী পণ্ডিত বনাম বিলাতী সংস্কৃতনবীশ।

আমাদের দেশের ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের অগাধ পাণ্ডিত্য আছে, কেহ বা বিদ্যাসাগর, কেহ বা বিদ্যাম্বুধি, কেহ বা বিদ্যার্ণব। কিন্তু তাঁহাদের বিদ্যাবারিধির এক ফোঁটাও সাধারণের জ্ঞানতৃষা নিবারণ করে না। আপামরসাধারণের নিকট জ্ঞানপ্রচার করা তাঁহারা স্বীয় কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করেন না। যদি বা সে বিষয়ে প্রয়াসী হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাদের ভাষা এমন কঠোর ও দুর্ব্বোধ হইয়া পড়ে যে, তাহাতে তোমার-আমার দন্তস্ফুট করিবার যো থাকে না। সম্মুখে অনন্ত সমুদ্র, কিন্তু সুপেয় জল একবিন্দুও নাই; খাইতে গেলে বমনোদ্রেক হয়, তৃষ্ণানিবারণ হয় না। 'Water, water, everywhere, But not a drop to drink'.

পক্ষান্তরে, বিলাতী সংস্কৃত-নবীশগণের (Savants) সংস্কৃতজ্ঞান অল্প, হয়ত তাহাতে ভ্রমপ্রমাদও আছে; কিন্তু সেই সামান্য জ্ঞানটুকু তাঁহারা সাধারণ্যে বিতরণ করিতে সর্ব্বদাই যত্নশীল; তাঁহাদের নিকট হইতে তবু আমরা প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে দু'চারিটা কথা জানিতে পারি। কূপের পরিধি সঙ্কীর্ণ, জলও অল্প; কিন্তু হইলে কি হয়, পশ্চিম অঞ্চলের কূয়ার জল বড় মিঠা। (কেহ কেহ সঙ্গে সঙ্গে বলিবেন, 'হাঁ, উপরে জলটি তর্‌তরে নির্ম্মল, কিন্তু অধিক জল তুলিতে গেলেই কাদা-বালি উঠিতে আরম্ভ হয়।')

১৪। বিলাতী ওক্‌ ও দেশী বটবৃক্ষ।

ওক্‌গাছ ইংলণ্ডের গৌরবের সামগ্রী, বিলাতী পার্কের বিরাট্ বনস্পতি। এ কাঠ বড় মজবুত, ইহাতে টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি গৃহ-সজ্জার আসবাব প্রস্তুত হয়, আর এই কাঠের প্রস্তুত জাহাজে চড়িয়া

ইংরেজ বাণিজ্যবিস্তার ও রাজ্যবিস্তার করিয়াছেন। গৃহসজ্জা বাণিজ্য-প্রসার ও রাজ্যসমৃদ্ধি ইংরেজ ওক্‌গাছের প্রসাদেই লাভ করিয়াছেন অতএব ওক্‌গাছ ইংরেজের শ্রীসম্পদের একমাত্র নিদান ও নিদর্শন।

আর ভারতের গৌরব বিরাট্ বট-পাদপ। ইহার তক্তায় গৃহসজ্জার আসবাব বা বাণিজ্যপোত যুদ্ধপোত গড়া যায় না। কিন্তু রৌদ্রতপ্ত প্রান্তরে অযত্নসংবর্দ্ধিত এই বিরাট্ বনস্পতি ছায়াদানে শ্রান্ত পথিকের ক্লেশ দূর করে, ফলদানে পশুপক্ষীর ক্ষুধাপ্রশমন করে, ইহার ঘনপল্লবে অসংখ্য জীব আশ্রয় লাভ করে, এবং ইহা হইতে শত শত নূতন বৃক্ষের উদ্ভব হয়। ভোগবিলাস বা পার্থিব ঐশ্বর্য্য কখনও ভারতীয় আর্য্য সভ্যতার আদর্শ ছিল না। ইহা ফলচ্ছায়াদানে বিশ্বমানবের ক্ষুধাশ্রান্তি দূর করিয়াছে, ভারতের জ্ঞানবিজ্ঞান, গীতা-উপনিষদ্ কত কাল ধরিয়া মনুষ্য-হৃদয়ে দুঃখযন্ত্রণার অপনোদন করিয়া সুখশান্তিবিধান করিয়াছে; আর ভারতের পূত শান্ত সভ্যতা হইতে 'তিব্বতচীনে ব্রহ্মতাতারে' নব নব সভ্যতার আবির্ভাব হইয়াছে। তাই বলিতেছি, বটবৃক্ষই ভারতীয় প্রকৃতির পবিত্র আদর্শ ও নিদর্শন।

১৫। অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী।

অনেকে যেখানে-সেখানে যখন-তখন বিদ্যা ফলান, ইহাকে ইংরেজীতে বলে pedantry (বিদ্যার জাঁক)। একজন বিদেশী লেখক ইঁহাদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, যেমন তামাকখোরের কাপড়ে-চোপড়ে, গায়ে-মুখে সর্ব্বদা তামাকের গন্ধ, তেমনি ইঁহাদের কথাবার্ত্তায় সর্ব্বদা বিদ্যাফলানর চেষ্টা দেখা যায়। আমাদের মধ্যে তামাকের প্রচলন এত অধিক যে, ও উপমাটায় আমাদের মন উঠে না, তামাকখোর না বলিয়া পিঁয়াজ-রশুনখোর বলিলে কথাটা আমাদের মনঃপূত হয়।

আমার মনে হয়, বিদ্যালাভ অনেকটা তেলমাখা বা সাবানমাখার মত। তেল মাখিয়া বেশ করিয়া গা রগ্‌ড়াইয়া স্নান করিলে তেলটা উঠিয়া যায়, কিন্তু তেলমাখার ফলে চামড়াটা বেশ মসৃণ ও স্নিগ্ধ হয়। সেইরূপ প্রকৃতপক্ষে বিদ্যালাভ করিলে স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার, কথাবার্ত্তা বেশ মোলায়েম হয়। কিন্তু চাষালোকে খানিকটা তেল জব্‌জবে করিয়া মাখে, হয়ত তা'র কোন পুরুষে একটু তেল পায় নাই, তাই একদিন ভদ্রলোকের বাড়ীতে মজুরী করিতে আসিয়া সে আধপোয়া তেল গায়ে ঢালিল, মাথার চুল হইতে চুঁচিয়া তেল পড়িতে লাগিল। pedantএর অবস্থাও ঠিক তাহাই। হয়ত বংশের মধ্যে বা গ্রামের মধ্যে বা সমশ্রেণীর মধ্যে তিনিই কোনও সুযোগে কিঞ্চিৎ বিদ্যা উদরস্থ করিয়াছেন, তাই চালচলনে কথাবার্ত্তায় সেটুকু জাহির করিতেছেন। দণ্ডে দণ্ডে থড়্‌কে-প্রমাণ ঘৃতের ঢেঁকুর তুলিতেছেন।

সাবান মাখিলে গায়ের ময়লা কাটে, চর্ম্মরোগ দূর হয়। বিদ্যা শিখিলেও মনের ময়লা কাটে, চরিত্র নির্ম্মল হয়। কিন্তু আনাড়ীতে সাবান মাখিলে খানিকটা সাবানের ফেনা কাণে-কপালে লাগিয়া থাকে, সেটা ভাল করিয়া ধুইয়া মুছিয়া ফেলে না; হয়ত লোককে দেখাইতে চায় 'আমি সাবান মাখিয়াছি'। pedantদেরও বিদ্যার ফেনা তাহাদের কথাবার্ত্তায় লাগিয়া থাকে। কাঙ্গালীরামের গোঁফে দুধের সর লাগাইয়া আঁচাইতে যাওয়ার গল্প মনে পড়ে।

১৬। Mobile equilibrium of intelligence

মাষ্টারী করিলে লোকে ক্রমশঃ বোকা হইয়া যায়, এইরূপ একটা অপবাদ আছে। দশ বৎসর মাষ্টারী করিলে তাহাকে আর কোনও ঝুঁকির কাযের ভার দেওয়া হয় না, কোন্ সভ্যমুলুকে নাকি এইরূপ

নিয়ম। কথাটা নিতান্ত অন্যায় নহে। মাষ্টারেরা সারাজীবন নিজেদের চেয়ে অল্পবুদ্ধি ও অল্পবিদ্য বালকদিগের সঙ্গে মেশেন, নিজেদের চেয়ে বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার তেমন সুযোগ পান না। সুতরাং তাঁহাদের আত্মোন্নতির কোনও উপায় থাকে না। তাঁহারা মূর্খকে পণ্ডিত করিতে গিয়া নিজেরা দিন-দিন মূর্খ হইয়া পড়েন। ছাত্রদিগের Exercise সংশোধন করিয়া তাহাদের বাণান দোরস্ত করেন, কিন্তু সেই সঙ্গে নিজেরা বাণান ভুলিতে থাকেন। 'যতই করিবে দান, তত যাবে বেড়ে,' কথাটা ষোলআনা সত্য নহে।

এই ব্যাপার দেখিলে পদার্থবিজ্ঞানের mobile equilibrium of temperature নিয়মের কথা মনে পড়ে। ঘরে পাঁচটা জিনিশের মধ্যে একটা খুব গরম জিনিশ রাখিলে খানিক পরে দেখা যাইবে, গরম জিনিশটা কতকটা ঠাণ্ডা হইয়াছে, কিন্তু ঘরের অন্য জিনিশগুলা কতকটা গরম হইয়া উঠিয়াছে, তপ্ত জিনিশের তাপ অন্য জিনিশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ তাপবিকিরণ খানিকক্ষণ চলিতে থাকিলে দেখা যাইবে, ঘরের সব জিনিশগুলিতেই সমান পরিমাণ তাপ আছে, ঠাণ্ডা জিনিশটা পূর্ব্বাপেক্ষা গরম হইয়াছে, গরম জিনিশটা পূর্ব্বাপেক্ষা ঠাণ্ডা হইয়াছে; ইহাকেই বলে, mobile equilibrium of temperature; এক্ষেত্রেও দেখা যাইবে, ছাত্রদিগের বিদ্যাবুদ্ধি যে পরিমাণে বাড়িয়াছে মাষ্টার মহাশয়ের বিদ্যাবুদ্ধি সেই পরিমাণে কমিয়াছে। শেষে বহুদর্শী মাষ্টারের ও সর্দ্দারপড়ুয়ার বিদ্যাবুদ্ধি সমান হইয়া দাঁড়ায়।

১৭। Maximum density.

অনেক ছাত্র পড়াশুনা যত করুক আর না করুক টায়ে-টোয়ে পাশ হয়। আবার হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিলেও তাহারা ফলে বড় বেশী

সুবিধা করিতে পারে না, সেই সমানই দাঁড়ায়। ইহাদের অবস্থা দেখিয়া maximum density of water at 4° Centigrade এর কথাটা মনে পড়ে।

১৮। বালির পিণ্ডি।

কলিকাতার ও মফঃস্বলের অনেক বেসরকারী স্কুল-কলেজে প্রকৃত-রূপে শিক্ষা দেওয়ার কোনও সরঞ্জাম নাই; ভাল শিক্ষক নাই, ভাল পুস্তকাগার নাই, বিজ্ঞানশিক্ষার যন্ত্রতন্ত্র নাই, কলেজ বা স্কুলগৃহটি পর্য্যন্ত নিতান্ত সঙ্কীর্ণ ও নোংরা। ঢাল নাই তরওয়াল নাই নিধিরাম সর্দ্দার! এইরূপ বিনা-আয়োজনে ছাত্রদিগকে যোগেযাগে পাশ করানর বন্দোবস্ত ঠিক যেন দরিদ্র-সন্তানের পিতৃপ্রেতকৃত্যে বালির পিণ্ডির ব্যবস্থা;—পিতৃপুরুষের পেট ভরে না, কোনও রকমে ঠাট বজায় রাখা মাত্র।

১৮॥।—কলেজ না যাত্রার দল?

কলিকাতার বেসরকারী কলেজগুলি এক একটী যাত্রার দল। প্রোফেসারেরা যুড়ী, এক এক বিষয়ে যোড়া যোড়া প্রোফেসার আছেন। তাঁহারা যুড়ীর গানের ধরণে কখনও দক্ষিণে কখনও বামে মুখ ফিরাইয়া বক্তৃতা (বা কথকতা*) করেন, নতুবা সকল শ্রোতার মন রাখা যায় না। যাঁহার বক্তৃতা জমিয়া যায়, তাঁহারই জয়জয়কার; সে কলেজে ছেলের ভিড় জমে। আবার পাকা যুড়ীরা কখনও কখনও চটিয়া বাহির

* বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ব্যবস্থায় এই সমস্ত গলদ সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে।—(দ্বিতীয় সংস্করণের টিপ্পনী)।

হইয়া নূতন দল খোলেন। কোনও কোনও কলেজ-স্থাপনার ইতিহাসও ঠিক এইরূপ।

এই সব দেখিয়া শুনিয়া ভরসা হয়, যদি হাল আইনের ফলে এ সকল কলেজ উঠিয়া যায়, তবে কলেজওয়ালারা স্বচ্ছন্দে এক একটা পেশাদার থিয়েটার বা যাত্রার দল খুলিতে পারেন।

তাঁহারাও বোধ হয় আখেরের কথা ভাবিয়া আগে হইতেই ছেলেদের তালিম করিতেছেন; সেই জন্যই প্রত্যেক কলেজে এক একটা সখের থিয়েটারের আখড়া দেখা যায়। †

† ইদানীং শিক্ষক ও ছাত্র-মহলে গোঁফ কামান যেরূপ চলিয়াছে, তাহাতেও এই সন্দেহ দৃঢ়ীভূত হয়।—(দ্বিতীয় সংস্করণের টিপ্পনী)।

নূতন চুট্‌কী

(ভারতবর্ষ, কার্ত্তিক ১৩২৫ ও আশ্বিন ১৩২৬)

(১) ব্যাকরণে সমাজ-তত্ত্ব

ইংরেজী ভাষার ধাতুরূপ I am এ আরম্ভ, thou art, he is তাহার পরে; অর্থাৎ আমির বড়াই সর্ব্বাগ্রে। পক্ষান্তরে, সংস্কৃত ভাষার ধাতুরূপে 'অস্তি'র পর 'অসি', তাহার পর 'অস্মি', অর্থাৎ আমির স্থান সকলের পশ্চাতে (যেমন হিন্দু গৃহিণী সর্ব্বশেষে আহার করেন)। ধাতুরূপের এই প্রভেদ হইতে এক জাতির দর্প-দম্ভ ও অপর জাতির বিনয়-সৌজন্যের পরিচয় পাওয়া যায়। আরও দেখুন, ইংরেজীতে 'আমি' **প্রথম** পুরুষ, ব্যাকরণে সর্ব্বাগ্রে উল্লিখিত, 'তুমি' 'সে' দ্বিতীয়-তৃতীয়-স্থানীয়—অহমিকার চরম। পক্ষান্তরে, সংস্কৃত ভাষায় 'তিনি' প্রথম পুরুষ, 'তুমি' মধ্যম পুরুষ আর 'আমি' উত্তম পুরুষ অর্থাৎ শেষ পুরুষ। (এ 'উত্তম' পুরুষ শ্রেষ্ঠ পুরুষ বুঝায় না, পাঠক এটুকু মনে রাখিবেন।) এমন নিজেকে ছোট করিয়া পরকে বড় করা, এমন বৈষ্ণব বিনয়, এমন (self-effacement) নিজেকে মুছিয়া ফেলা, জাতীয় চরিত্রের বিশিষ্টতার লক্ষণ নহে কি ?

আর এক কথা। ইংরেজী ভাষার ধাতুরূপে 'love' আদর্শ ধাতু, আর ইংরেজী সাহিত্যে তথা ইংরেজ-সমাজেও নভেলী প্রেমের ছড়াছড়ি! (শ্বেত গোরার গোঁড়ারা বলিবেন, ইহা ব্রিটিশ জাতির বিশ্বপ্রেমের বিবৃতি!)

(২) নারী-পূজা

ইংরেজেরা Ladies & Gentlemen বলিয়া সভাস্থ স্ত্রী-পুরুষকে সম্বোধন করিয়া লেডির মান রাখেন, এই গুমর করেন। কিন্তু তাঁহাদিগের শ্রেষ্ঠ কবির নাটকে—Romeo & Juliet, Antony & Cleopatra, Troilus & Cressida প্রভৃতি গাঁটছড়া-বাঁধা নামে ও চলিত কথা Jack & Gill যুগল-মূর্ত্তিতে ত কই নারীর নাম পূর্ব্বে বসে নাই। পক্ষান্তরে, আমাদের 'মালবিকাগ্নিমিত্রে' ও 'মালতীমাধবে' নারীর নামকেই প্রথম স্থান দেওয়া হইয়াছে। ('বিক্রমোর্ব্বশী'তে ব্যতিক্রম দেখা যায়; উর্ব্বশী স্বর্বেশ্যা, তাই বলিয়া বুঝি কবি তাঁহাকে সম্মানযোগ্যা মনে করেন নাই।) কালিদাস 'পার্ব্বতী-পরমেশ্বরৌ'এর বন্দনা করিয়া নারী-দেবতার শ্রেষ্ঠতা খ্যাপন করিয়াছেন। বৈষ্ণব 'রাধাকৃষ্ণ' না বলিয়া কদাচ 'কৃষ্ণরাধা' বলেন না। শুধু 'স্ত্রী-পুরুষে' কেন, গ্রাম্য ভাষার 'মেয়েমর্দ্দ' প্রভৃতিতেও 'যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে' ইত্যাদি মনুবাক্যের অনুবৃত্তি। (হাল বাঙ্গালায় 'নর-নারী' 'বর-বধূ' 'পিতামাতা' লেখে বটে, কিন্তু 'নারী-নরৌ' 'বধূবরৌ' 'মাতা-পিতরৌ' সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ-সম্মত।)

সেদিন দেখিলাম, একজন ইংরেজ সমালোচক বুঝাইয়াছেন যে, সমাজে ক্রমেই নারীর অধিকার-বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে নারীর নামে আখ্যায়িকার নামকরণ হইতেছে, এমনটি সাহিত্যের প্রথম আমলে ছিল না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে Pamela, Clarissa Harlowe, Amelia প্রভৃতি নভেলের নামকরণ ইহার নিদর্শন। (শেক্‌স্‌পীয়ারের আমলেও Lodgeএর Rosalind আখ্যায়িকা ছিল।) যাহা হউক, এক্ষেত্রেও আমাদের জিত। কেননা, ইহার বহু পূর্ব্বে সংস্কৃত ভাষায় 'কাদম্বরী'

ও 'বাসবদত্তা' প্রণীত হইয়াছে। শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী' ও ভাসকবির নবাবিষ্কৃত 'বসন্তসেনা'ও দৃশ্যকাব্যের তরফ হইতে সাক্ষ্য দিতেছে।

(৩) অহমিকা

অনেকের অহমিকার মাত্রা এত বেশী যে, তাহাদিগের বিকত্থনায় লোকের গায়ে জ্বর আসে। শাস্ত্রে অবশ্য 'আত্মপ্রশংসাং পরগর্হামিব বর্জ্জয়েৎ' উপদেশ আছে, কিন্তু কলির উল্টা বিচারে দুইটি নিষেধই বিধি হইয়া দাঁড়াইয়াছে! যাহা হউক, একটু দার্শনিক-ভাবে দেখিলে এই অহমিকার জন্য দাম্ভিক ব্যক্তির উপর আমাদের বিতৃষ্ণা হওয়া উচিত নহে। বৈজ্ঞানিক বলেন, অনেক কীট-পতঙ্গের এবং অনেক উদ্ভিদের দেহে এমন একটা রস বা গন্ধ থাকে যে, তাহার তীব্রতার জন্য কোন শত্রু তাহাদিগের কাছে ঘেঁসিতে পারে না। ইহাই তাহাদিগের আত্মরক্ষার প্রকৃতি-দত্ত অস্ত্র। অনেক মানুষও সেইরূপ তাহাদিগের অহমিকার তীব্রতায় আত্মরক্ষা করে। নতুবা যে-সে তাহাদিগকে দু' পায়ে মাড়াইত, জীবন-সংগ্রামে তাহারা একদিনও টিকিতে পারিত না।

(৪) সাঙ্কেতিক চিহ্ন

রচনায় বিরাম প্রভৃতি বুঝাইতে কতকগুলি সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। এইগুলিকে অন্য ভাবেও ব্যবহার করা যায় না কি? যথা, আস্তিক ব্যক্তির মনোভাব বিস্ময়-চিহ্ন (!) দ্বারা প্রকাশ করা যায়, কেননা—আস্তিক ব্যক্তি বিশ্বে সৃষ্টিকর্ত্তার নির্ম্মাণ-কৌশল ও বিশ্বপালিনী নীতির পরিচয় পাইয়া বিস্ময় ও ভক্তিতে অভিভূত হয়েন। পক্ষান্তরে, সন্দেহবাদীর (sceptic) মনোভাব জিজ্ঞাসার চিহ্ন (?) দ্বারা প্রকাশ করা যায়, কেননা তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চয়তা লাভ করিতে

পারেন নাই, তাঁহার সারাজীবনে এই খট্‌কার মীমাংসা হইল না।*
আর নাস্তিকের মনোভাব বা সিদ্ধান্ত সংখ্যাতত্ত্বের 'শূন্য' (০) দ্বারা প্রকাশ
করা যায়। এইরূপ, যিনি 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' মানেন, তিনি সংখ্যা-
শাস্ত্রের 'এক' (১) সংখ্যা দ্বারা তাঁহার মনোভাব প্রকাশ করিবেন; যিনি
Ormuzd ও Ahriman, খোদা ও শয়তান, দুইটি বিপরীত শক্তি মানেন,
তিনি 'দুই' (২) সংখ্যা দ্বারা নিজের মনোভাব প্রকাশ করিবেন; 'নম-
স্ত্রিমূর্ত্তয়ে তুভ্যম্', Triad, Trinity, 'ত্রিরত্ন', যাঁহার বিশ্বাসের বস্তু,
তিনি 'তিন' (৩) সংখ্যা দ্বারা নিজের মনোভাব প্রকাশ করিবেন।
আবার যাঁহারা পরকাল পরলোক পরজন্ম মানেন, তাঁহারা মানব-জীবনের
শেষে একটা কমা, কোলন বা সেমিকোলন বসাইবেন; আর যাঁহারা
ইহকালেই সব শেষ মনে করেন, তাঁহারা মানব-জীবনের শেষে একটা
পূর্ণচ্ছেদ (Full stop বা লম্বা দাঁড়ি) বসাইবেন, সব লেঠা চুকিয়া
যাইবে। তাঁহাদের গুরুজি চার্ব্বাক বলিয়া গিয়াছেন—

> যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
> ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ॥

(৫) কলমবাজ বনাম বক্তৃতাবাজ

অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকের সহিত আলাপ করিলে দেখা যায়,
তাঁহাদিগের কথাবার্ত্তা নিতান্ত সাধারণ ধরণের, প্রতিভার কোন পরিচয়
পাওয়া যায় না, অনেক সময় (Common-sense) কাণ্ডজ্ঞানেরও
কিঞ্চিৎ অভাব আছে বলিয়া সন্দেহ হয়। অথচ ইঁহাদিগের রচনা

* মার্কিন লেখক হোম্‌স্-প্রণীত Over the Tea-cups নামক উপাদেয়
পুস্তকের পঞ্চম পরিচ্ছেদ হইতে এই আলোচনার একটু ইঙ্গিত পাইয়াছি।

পড়িলে মুগ্ধ হইতে হয়। শুনা যায়, ইংরেজ লেখক এডিসন, গোল্ডস্মিথ ও কূপর অপরিচিত লোকের সম্মুখে নিতান্ত মুখচোরা ছিলেন, অথচ তাঁহাদিগের রচনা কেমন সরস ও সরল! ইঁহাদিগের মুখ চেয়ে হাত চলে ভাল! এই প্রভেদ লক্ষ্য করিয়া এডিসন বলিয়াছিলেন, 'আমি নগদ এক পয়সাও বাহির করিতে পারি না, কিন্তু ইচ্ছামাত্র লাখ টাকার চেক কাটিতে পারি!' আবার অনেক লোকের কথাবার্ত্তা সরসতা ও (ready wit) উপস্থিত-বুদ্ধির গুণে বড়ই প্রীতিপ্রদ; অনেকের অনর্গল বক্তৃতায় বাগ্মিতার পরা কাষ্ঠা প্রদর্শিত হয়, অথচ তাঁহারা এক কলম লিখিতে গেলে চক্ষে অন্ধকার দেখেন। ইঁহাদিগের হাত চেয়ে মুখ চলে ভাল!

এই অসামঞ্জস্যের কারণ,—লেখকগণের লেখাটাই স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে, অনুশীলনে এই শক্তিরই বিকাশ হইয়াছে, লিখিতে বসিলে তাঁহাদিগের আপনা হইতেই ভাব ও ভাষা যোগায়, কথাবার্ত্তায় অনভ্যাসের দোষে একটা জড়তা আসে, কেমন যেন বাধ-বাধ ঠেকে। পক্ষান্তরে, সম্মুখে পাঁচজন দেখিলেই মজলিসী লোকের রসিকতার ফোয়ারা খুলিয়া যায়, ভাবের ঘাত-প্রতিঘাতে তড়িৎ ছুটিতে থাকে। কিন্তু ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া ডেস্কের উপর খাতা খুলিয়া বসিলে তাঁহাদের ভাবের দরজাও বন্ধ হইয়া যায়। সমজদার শ্রোতার উপস্থিতিতে যে একটা উদ্দাম উত্তেজনার আবির্ভাব হয়, একলা ঘরে থাকিলে সেটা জন্মিতে পায় না। অন্যে পরে কা কথা, অনেক শিক্ষক ছাত্রমণ্ডলীর সমক্ষে যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেন, তাহার অর্দ্ধেকও পূর্ব্বাহ্নে ঘরে বসিয়া যোটাইতে পারেন না, সময়ে সময়ে কঠিন সমস্যার মীমাংসা পাঠনা-গৃহে চকিতের মত মাথায় আসিয়া যোগায়, অথচ ঘরে বসিয়া মাথামুড় খুঁড়িলেও তাহা যোগায় না।

আবার এমন লোকও আছেন যাঁহার হাত দু'ই সমান চলে। ইংরেজী সাহিত্যে জন্‌সন্, মেকলে, সিড্‌নি স্মিথ্, কার্লাইল্ এই শ্রেণীর। আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয়, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ এই শ্রেণীর।

(৬) সাহিত্য বনাম গণিত

একজন গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপক ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপককে টিটকারী দিয়াছিলেন,—'দেখুন, আপনাদের ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনা আমরাও স্বচ্ছন্দে চালাইতে পারি, কিন্তু আপনারা একদিন গণিত বা বিজ্ঞানের অধ্যাপনা করুন দেখি।' ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক উত্তর করিলেন,—'দেখুন, দৈবে-সৈবে ভাত রাঁধিতে সকলেই পারে, কিন্তু জুতা মেরামত করিতে সকলে পারে না। সেটা শিক্ষা-সাপেক্ষ। সাহিত্য সার্ব্বজনীন সার্ব্বভৌম পদার্থ, ইহাতে সকলেরই অধিকার আছে, কিন্তু গণিত ও বিজ্ঞান technical জিনিশ, রীতিমত তালিম (special training) না হইলে রপ্ত হয় না।'

টিপ্পনী:—তবে ভাত রাঁধারও তারিফ আছে, যেমন তেমন করিয়া চাউল কয়টা সিদ্ধ করিতে সকলেই পারেন, কিন্তু উপর-নীচে সব ভাত-গুলি সমান সুসিদ্ধ করিতে সকলে পারেন না। সাহিত্যপাঠনা-সম্বন্ধেও সে কথাটা খাটে।

(৭) মূল ও ফল (Root & Fruit)

এক শ্রেণীর বিলাতী টীকাব্যাখ্যায় শব্দের ব্যুৎপত্তি ও ইতিহাস লইয়া পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা অযথা ভারাক্রান্ত, কাব্যের সৌন্দর্য্য-বিশ্লেষণ, কলাকৌশল-প্রদর্শন, অতি অল্প স্থান অধিকার করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াগণ জানেন, শেক্‌সপীয়ারের নাটকের বিখ্যাত ক্যাম্বেণ্ডন প্রেস্

সংস্করণ এই শ্রেণীর। আজকাল এই ত্রুটি-সংশোধনের জন্য পিট্‌ প্রেস্‌, রাগ্‌বি, ওয়ারউইক প্রভৃতি সংস্করণের আবির্ভাব হইয়াছে, সেগুলিতে সৌন্দর্য্য-বিশ্লেষণ প্রাধান্য পাইয়াছে।

কলেজের অধ্যাপকদিগের মধ্যেও উক্ত দ্বিবিধ শ্রেণী দেখা যায়। একবার এক কলেজে প্রথমোক্ত শ্রেণীর একজন অধ্যাপক প্রশংসার সহিত বহুদিন অধ্যাপনা করিয়া অন্যত্র কর্ম্ম গ্রহণ করিলে, দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণীর একজন অধ্যাপক তাঁহার স্থান পূরণ করেন। ইঁহার অধ্যাপনায় প্রথম প্রথম ছাত্রগণ শব্দের ব্যুৎপত্তি-বিচারের অভাব দেখিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করিলে ইনি হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন,—"গাছের শিকড় ধরিয়া টানাহিঁচড়া না করিয়া বাছিয়া বাছিয়া পাকা ফলের রস আস্বাদ ও ফুটন্ত ফুলের সুঘ্রাণ উপভোগ করিলে বুদ্ধিমানের কায হয় না কি?"

(৮) মহৎলোক ও পর্ব্বত

কবিগণ পর্ব্বতের সহিত মহৎ লোকের উপমা দেন। কালিদাস বুঝাইয়াছেন, দুঃখ-দুর্দ্দিনে বিপদ্‌বাত্যায় পর্ব্বতের ন্যায় মহৎ লোকও অটল অচল। 'ক্রমসানুমতাং কিমন্তরং যদি বায়ৌ দ্বিতয়েঽপি তে চলাঃ।' মহীধর যেমন পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন, মহৎ লোকও সেইরূপ সমাজকে ধারণ করিয়া আছেন। তাঁহাদিগের মহত্ত্ব, পর্ব্বতচূড়ার ন্যায়, সমাজের চূড়াস্থানীয়। নগাধিরাজ হিমালয়ের ন্যায় তাঁহারা অনন্তরত্নপ্রভব।

একটু সূক্ষ্মভাবে ভাবিলে পর্ব্বতের সহিত মহৎলোকের আরও সাদৃশ্য পরিদৃশ্যমান হয়। পর্ব্বত হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, খুব কাছে আছে; একটু আগাইয়া গেলেই পর্ব্বতের পাদদেশে পৌঁছিব। কিন্তু হাঁটিয়া হাঁটিয়া যখন ক্লান্ত হইয়া পড়ি, তখনও দেখি পর্ব্বত যেমন দূরে ছিল তেমনি দূরে আছে। আবার পর্ব্বতে উঠিবার সময় মনে হয়, আর

খানিকটা উঠিলেই চূড়ায় আরোহণ করিব, কিন্তু এক্ষেত্রেও দেখা যায়, অনেকদূর উঠিয়াও চূড়ার নাগাল ধরা যায় না। মহৎলোকের চরিত্র-সমালোচনা করিতে গেলেও দেখা যায়, যত শীঘ্র তাঁহার সমগ্র মহত্ত্ব আয়ত্ত করিতে পারিব ভাবিয়াছিলাম, তত শীঘ্র পারি না। শেক্‌স্‌পীয়ারের অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিবার জন্য রাশি-রাশি গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, কিন্তু এখনও কি কেহ বলিতে পারেন যে কবির সমগ্র প্রতিভা আমাদের বুদ্ধিগম্য হইয়াছে? বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একাধিক জীবন-চরিত লিখিত হইয়াছে, বৎসর বৎসর স্মৃতিসভায় তাঁহার মহত্ত্ব-বিষয়ে প্রবন্ধ পঠিত হয়, বক্তৃতা প্রদত্ত হয়, কিন্তু আমরা কি তথাপি এই বিরাট্ ব্যক্তিত্বের (grand personality) সম্পূর্ণ প্রণিধান করিতে পারিয়াছি?

আর এক কথা, পর্ব্বত দূর হইতেই দেখি আর নিকট হইতেই দেখি, তাহার গায়ে কেমন ধোঁয়া ধোঁয়া দেখিতে পাওয়া যায়। খুব কাছে গেলে নীচের দিকে আর ধোঁয়া ধোঁয়া দেখায় না বটে, কিন্তু উপর পানে চাহিলে ঠিক তেমনই ধোঁয়া ধোঁয়া দেখায়। মহৎ লোকের চরিত্রেও যে (mysterious something) কেমন একটা রহস্য থাকে, তাহা হাজার কাছে গিয়া তাঁহার জীবন-চরিত অনুসন্ধান করি, তাঁহার চরিত্র বিশ্লেষণ করি, কিছুতেই ধরা পড়ে না।

(৯) নামকরণ

ঔরস-সন্তানের নামকরণ ও মানস-সন্তানের নামকরণ উভয়ই বিষম সমস্যা। সন্তানের নাম স্থির করিতে মাতাপিতা কত বিনিদ্র রজনী কাটান, কতশত নাম ওলট-পালট করেন, তবু সহজে নাম পছন্দ হয় না। গ্রন্থের নাম স্থির করিতেও গ্রন্থকারদিগের চক্ষুঃ স্থির হয়; প্রথম প্রথম

ভক্তির নিদর্শন-স্বরূপ দেবদেবীর নামে পুত্রকন্যার, তথা পুস্তক-পুস্তিকার নাম রাখা হইত। যথা, হরিনারায়ণ, শিবরাম, লক্ষ্মী, ভগবতী; শ্রীধর্ম্ম-মঙ্গল, মনসামঙ্গল, চণ্ডী। তাহার পর, শাদাসিধে নাম। যথা রাখাল, মতিলাল, কামিনী, যামিনী; বর্ণপরিচয়, শিশুশিক্ষা, কথামালা, নীতিবোধ। তাহার পর, পাণ্ডিত্যপ্রকর্ষ-পরিচায়ক নাম। যথা, যজ্ঞপূর্ণ, ইলাবন্ত, হীনাঙ্কশশী, প্রভঞ্জনসখা; প্রত্নকম্রনন্দিনী, অভেদী, শব্দসংজ্ঞাবিজ্ঞোলি, সারঙ্গরঙ্গদা। তাহার পর, কবিত্ব-মাধুর্য্যে মণ্ডিত মোলায়েম রসসিক্ত নাম। যথা প্রভাতকুসুম, প্রেমকুসুম, নীহারবিন্দু, অমিয়া, সুধা;* আঙুর, আপেল, ফুলের ফসল, মধুমল্লী। তাহার পর লোকের চোখে ধূলা দিবার জন্য—কাণা ছেলের নাম পদ্মলোচন, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ছেলের নাম কার্ত্তিক; তথা ব্যাকরণের গ্রন্থের নাম মনোরমা, দর্শনের গ্রন্থের নাম কুসুমাঞ্জলি ও পঞ্চদশী! ইহা ছাড়া, যমকে ফাঁকি দিবার জন্য হেলাফেলা নাম। যথা, ফেলারাম, কেনারাম, বেচারাম, তিনকড়ি, পাঁচকড়ি, সাতকড়ি। তথা, সমালোচককে ফাঁকি দিবার জন্য—ছাইভস্ম, মশলা-বাঁধা কাগজ, পাগলের প্রলাপ।

(১০) একাদশী ও একাদশ

স্ত্রীলিঙ্গ একাদশী, পুংলিঙ্গ একাদশ। (লেডীর মান রাখিবার জন্য স্ত্রীলিঙ্গ আগে দিলাম।) সুতরাং হিন্দু-বিধবার পক্ষে নির্জ্জলা একাদশীর ব্যবস্থা স্মার্ত্ত রঘুনন্দন করিয়াছেন। আর পুরুষের পক্ষে, পুংলিঙ্গে একাদশ অর্থাৎ একাদশে বৃহস্পতি। সুতরাং উক্ত তিথিতে চর্ব্ব্যচূষ্য লেহ্যপেয়ের

* শুভবিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্রে মেরিগোল্ড-হাসিনী নাম পাইয়াছি, আর কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিলে প্রিমরোজবাসিনী ভায়োলেট-ভাসিনী ও মার্শাল-নীল-নাশিনী নামও দেখিতে পাইব আশা করি।

ব্যবস্থা। একাদশের ফর্দ্দ নিম্নে দিলাম :—(১) সুক্ত (২) বেগুনের সময় বেগুনভাজি, পটোলের সময় পটোলভাজি (৩) আলুকুমড়োর ছক্কা (৪) আলুর দম (৫) কপির ডালনা, অভাবে ছানার ডালনা (মৎস্যমাংস নিষিদ্ধ বলিয়া নিরামিষ তরকারীর রকম বাড়াইতে হইল) (৬) হালুয়া (৭) চাটনী (৮) দধি (৯) ক্ষীর বা রাবড়ী (১০) সন্দেশ (১১) রসগোল্লা। (পাণ খাওয়া নিষিদ্ধ, অতএব দ্বাদশ প্রকার নহে।) সাধে কি চক্কোত্তি মশায় বলেন যে, 'ভাগ্যে মাসে দু'টো একাদশী আছে, তা'র জোরেই ত বেঁচে আছি।'

(১১) অপেরা

একটি গল্পে নায়িকার নাম অপেরা দেখিয়া আমার জনৈক বন্ধু মূর্চ্ছা যান। কিন্তু ইহাতে মূর্চ্ছার কারণ কি? অপেরায় 'পতন ও মূর্চ্ছা' আছে বলিয়া? যে দেশে কবিচন্দ্র যাত্রামোহন্ নাম রহিয়াছে, সে দেশে অপেরা-সুন্দরী নাম আশ্চর্য্য কি? তবে হাঁ, ইহার দেখাদেখি থিয়েটার-চন্দ্র, (farce) ফার্স-মোহন প্রভৃতি নাম চলিলে 'ভাব্‌বার কথা' বটে।

(১২) সিদ্ধ ও পোড়া

সিদ্ধ ও পোড়া এত ভাল লাগে কেন, এত মুখপ্রিয় কেন? অনেকে হয়ত বলিবেন, উড়িয়া বামুনের রান্না ঝোল-তরকারীতে অরুচি জন্মে; সিদ্ধ ও পোড়ায় রান্নার কায়দা দেখাইবার যো নাই, তাই উহা অরুচির রুচিকর, মশলা ও কাঁচা তেলের গন্ধওয়ালা ঝোল-তরকারীর পর মুখ বদলান হিসাবে ভাল। কিন্তু প্রকৃত কারণ তাহা নহে। মানুষের এমন একদিন ছিল, যখন সে কাঁচা খাইত, আগুনের ব্যবহার জানিত না। তা'র পর আগুনের ব্যবহার শিখিলে সিদ্ধ, ঝলসান, পোড়ান, জিনিশ খাইতে শিখিল। তাহার পর, পাঁচআনাজ মিশাইয়া তেল বা ঘী-মশলা

দিয়া রাঁধিতে শেখা সভ্যতার চরম উৎকর্ষ। সিদ্ধ ও পোড়া মানবের সেই পুরাতন অবস্থার পরিচায়ক। পূর্ব্বস্মৃতি বড় মধুর হয়, তাই সিদ্ধ ও পোড়া সভ্য মানবের এত মধুর লাগে।

(১৩) ফরাশ বনাম চেয়ার

ভারতীয় সমাজ ও ইউরোপীয় সমাজের প্রভেদ গরুর গাড়ী ও রেল-গাড়ী, গুড়ুক তামাক ও চুরুট সিগ্রেট, বটগাছ ও ওকগাছ প্রভৃতিতে ধরাইয়া দিয়াছি। ফরাশ বনাম চেয়ারেও আবার সেই একই তত্ত্ব। চেয়ারে বসায় স্বস্বপ্রধান, আত্মসর্ব্বস্ব ভাব—ব্যক্তিতন্ত্রতা পরিস্ফুট। আর ফরাশে বসায় একাত্মতা, অন্তরঙ্গভাব, 'ভাই ভাই এক ঠাঁই ভেদ নাই ভেদ নাই' মন্ত্রের প্রভাব দেদীপ্যমান। এক চেয়ারে দুই ইয়ারে মাণিকযোড় হইয়া অথবা প্রেমিক-প্রেমিকা যুগলে বসিতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতেও 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' ভাব নাই, আর দৃশ্যটা প্রণয়ীর পক্ষে মধুর হইলেও দর্শকের চক্ষে কদর্য্য।

(১৪) অস্ত্রের ক্রম-বিবর্ত্তন

পবন-নন্দন হনূমান্ ও ভীমসেন আস্ত গাছ লইয়া শত্রুর সঙ্গে যুঝিতেন, কৃত্তিবাস-কাশীদাসের কৃপায় আমরা ইহা জানিতে পারিয়াছি। যাহাদের অতটা শক্তি নাই, তাহারা গাছের ডাল বা খানিকটা অংশ লইয়া অস্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করে, লাঠিসোটা, সড়্‌কী-বল্লম, পাঁচনবাড়ী, বেত ও চাবুক ইহার উদাহরণ। রাজার রাজদণ্ড, রাজ-অনুচরের আশাসোটা, খ্রীষ্টান পাদরীর crook এই শাসন-ক্ষমতার নিদর্শন, যদিও এগুলি অস্ত্র-হিসাবে ব্যবহৃত হয় নাই, ব্যবহারের প্রয়োজনও হয় না। 'কা কথা বাণসন্ধানে' অথবা চল্‌তি কথায়, 'কাঠের বিড়াল হ'লেই-বা, ইঁদুর ধরা

নিয়ে কথা।' অস্ত্রের এইরূপ ক্রম-বিবর্ত্তনে সমালোচকের লেখনীর আবির্ভাব হইয়াছে। ইনিই বঙ্গের শেষবীর!

(১৫) ব্যাকরণ ও অভিধানে সমাজতত্ত্ব

সমাজতত্ত্বের উপকরণ খুঁজিতে জানিলে যে কতস্থানে মিলে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ব্যাকরণ ও অভিধান-পাঠে যাহা চোখে পড়িয়াছে, আপাততঃ তাহারই দু'চারিটা নমুনা দিতেছি—

(৵০) ব্রাহ্মণেরা যে ঔদরিক ছিলেন, তাহা তাঁহাদিগের রচিত ব্যাকরণে 'আলু' ও 'ঘিণুন্' প্রত্যয়েই মালুম। নীরস ব্যাকরণের চর্চ্চা করিতে বসিয়াও তাঁহারা উদরের চিন্তা ভুলিতে পারেন নাই।

(৶০) 'অনাদরে ষষ্ঠী'—ব্যাকরণের সূত্র। ফলেও দেখা যায়, দরিদ্রের ঘরে—যে ঘরে অর্থাভাবে সন্তানের আদর-যত্ন ভাল করিয়া হয় না সেই ঘরেই—মা-ষষ্ঠীর কৃপা।

(৷৵০) 'স্ত্রিয়াং বহুষ্প্সরসঃ'—অভিধানে লেখে। অর্থাৎ বহু স্ত্রীলোকই অপ্সরার মত সুন্দরী। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, পূর্ব্বকালে এদেশে স্ত্রীজাতির সৌন্দর্য্য খুবই সাধারণ ছিল।

(।০) 'অস্ত্রী পাপম্'—অভিধান, 'স্ত্রিয়ামাপ্'—ব্যাকরণ। অর্থাৎ স্ত্রীলোকে পাপ করে না, স্ত্রীলোককে মাপ করিতে হইবে। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, সেকালে নারীর প্রতি কতটা সম্মান দেখান হইত (মনুর 'যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে সর্ব্বদেবতাঃ' বাক্যের সহিত ব্যাকরণ অভিধানও এক সুরে সুরবাঁধা)।

ব্যাকরণের কচ্‌কচি পাঠক মহাশয়ের অধিকক্ষণ ভাল লাগিবে না অতএব এইখানেই ক্ষান্ত হইলাম। নতুবা আরও বহু দৃষ্টান্ত বিস্তার গবেষণার জন্য মজুত রহিয়াছে।

সাহিত্যের নেশা

(ভারতবর্ষ, আষাঢ় ১৩২৬)

[আমাদের কলেজ-ইউনিয়নের উদ্‌বোধন-উপলক্ষে একটী স্থান-কালোপযোগী হাল্‌কাধরণের হাস্যরসাত্মক প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্য ইউনিয়নের উৎসাহী সম্পাদক মহাশয় ও অপর কয়েকজন সভ্য কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াছি। এরূপ প্রবন্ধ-রচনায় আর প্রবৃত্তি নাই, বোধ হয় সে শক্তিও আর নাই। সুতরাং নূতন প্রবন্ধ-রচনার চেষ্টা না করিয়া ৺আমোদর শর্ম্মার দপ্তর হইতে একটি পুরাতন প্রবন্ধ সংগ্রহ করিয়া দিলাম। আশা করি, প্রবন্ধের অন্য কোন গুণ না থাকিলেও ইহা যে হাল্‌কা, হাস্যকর ও অসার, তদ্‌বিষয়ে মতদ্বৈধ হইবে না।]

"ছাড়িয়া জননী-স্তন্য ধরিয়াছি পুঁথি,
নিদ্রা নাই, ক্রীড়া নাই, আমোদ বিশ্রাম,
যথাকালে উপজিল মাথার ব্যারাম।"

কিন্তু তবু সাহিত্যের নেশা জমিল না। পাছে প্রথম-যৌবনে ছাত্র-জীবনে হৃদিবৃন্দাবনে সঞ্চিত কাব্যরস কর্ম্মজীবনের উত্তাপে শুকাইয়া যায়, এই ভয়ে হাকিমীর উমেদারী বা ওকালতীর দিগদারীতে রাজী হইলাম না, কাব্যশাস্ত্র-বিনোদেই সারাজীবন কাটাইব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম; কিন্তু তবু সাহিত্যের নেশায় বুঁদ হইতে পারিলাম না। বার্দ্ধক্যের গতিকে চুল পাকিল, কিন্তু তবু সাহিত্যের নেশা পাকিল না।

* বঙ্গবাসী কলেজ-গৃহে কলেজ-ইউনিয়নের প্রথম অধিবেশনে পঠিত। (২৩এ মার্চ্চ ১৯১৯)

সমস্তায় পড়িয়া বন্ধুদের বৈঠকে প্রশ্ন উত্থাপন করিলাম,—'এখন উপায় কি ?' বলিবামাত্র চারিধার হইতে বিনামূল্যে 'উপদেশ-বৃষ্টি' আরম্ভ হইল,—'কা'র সাধ্য রোধে তা'র গতি ?' [পীড়ার বেলায়ও দেখা যায়, প্রত্যেক নরনারী একটা না একটা মুষ্টিযোগ জানেন এবং তাহার প্রয়োগ করিতে অর্থাৎ medical advice gratis দিতে তাঁহাদের সবুর সহে না। অথচ নিজেরা যখন রোগে ভোগেন, তখন সে সব মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা করেন না কেন ? নিজের বেলায় বুঝি সেগুলি ফলে না ? তাই দেখি, চিকিৎসকেরা নিজের বা পরিজনের পীড়া হইলে অন্য চিকিৎসক ডাকেন! যাক্, বাজে কথা ছাড়িয়া এক্ষণে আসল কথা বলি।]

আমার প্রশ্ন-শ্রবণমাত্র রঙ্গলাল বাবু আরক্ত চক্ষুঃ অর্দ্ধ উন্মীলিত করিয়া বলিলেন :—"এ প্রশ্নের উত্তর ত অতি সহজ। যেমন জলেই জল বাঁধে, তেমনি নেশায়ই নেশা বাঁধে। অতএব যদি সাহিত্যের নেশা জমাইতে চাও, তবে একটু গোলাপী নেশা অভ্যাস কর, অর্থাৎ মধুপান করিতে শিখ। দেখিও ঠিকে ভুল করিও না। এ 'মধু' মক্ষিকা-বিশেষের উচ্ছিষ্ট বস্তু নহে। কাব্যরসিক হইয়া 'ঋতুসংহারে'র 'প্রিয়ামুখোচ্ছ্বাস-বিকম্পিতং মধু' ভুলিলে চলিবে কেন ? আর হিন্দু হইয়া 'গর্জ্জ গর্জ্জ ক্ষণং মূঢ় মধু যাবৎ পিবাম্যহম্' চণ্ডীর এই উক্তি ভুলিলেই বা চলিবে কেন ? যদি নজির চাও ত দেখ, নব্যবঙ্গের আদিকবি কলির বাল্মীকি 'দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন'-'সাহিত্য-কুসুমে প্রমত্ত মধুপ' এই মধুপানে বিভোর হইয়াই কল্পনা-মধুকরীকে সাধাসাধি করিয়াছিলেন—'কবিচিত্তফুলবনমধু লয়ে রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।' আর কবির ভক্ত শিষ্য উচ্ছ্বাসভরে গায়িয়াছেন—

'নামে মধু, হৃদে মধু, বাক্যে মধু যার,
এ হেন মধুরে ভুলে সাধ্য আছে কার ?'

আমিও কবির কথায় বলি, 'মধুহীন করো না গো তব মনঃ-কোকনদে।' আবার মধুসূদনের ঈষৎ পরবর্ত্তী কালের সাহিত্য-দিক্‌পালগণও এই রসের রসিক ছিলেন।"

কথাগুলা আমার বড়ই বেতালা লাগিল। কবি বলিয়াছেন, 'ন কেবলং যো মহতোঽপভাষতে। শৃণোতি তস্মাদপি যঃ স পাপভাক্।' অতএব মহতের নিন্দা সত্য হইলেও অশ্রাব্য। কিন্তু রঙ্গলাল বাবুর একবার মুখ ছুটিলে ছিপি আঁটিয়া দেয় কা'র সাধ্য? তিনি আরও রঙ্গ চড়াইয়া বলিতে লাগিলেন :—

"আবার দেখ, যে ইংরেজী সাহিত্যের বীজের গুণে আমাদের আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে এমন বিচিত্র দানা বাঁধিয়াছে, সেই ইংরেজী সাহিত্যের ওস্তাদগণ এই গুণেই দিগ্‌বিজয়ী সাহিত্যরথী হইয়াছিলেন।—শেক্‌স্‌পীয়ার, বেন্ জন্‌সন্ প্রভৃতির Mermaid Tavernএর কীর্ত্তিকথা সুবিদিত। যে Addisonএর রচনা-মাধুর্য্যে ও চরিত্রগাম্ভীর্য্যে তোমরা মুগ্ধ, সেই Addisonএর বর্গণ্ডির বোতল উপুড় না করিলে প্রতিভার বিকাশ হইত না, তাহা কি জান না? আর তাঁহার সহচর Steele ও পরবর্ত্তী কালের Goldsmith, Fielding, Sheridan, Burns, Lamb প্রভৃতির ত কথাই নাই। ইঁহাদের রচনা-মাধুর্য্যের মূল প্রস্রবণ যে পানপাত্র, তাহা কি আর বুঝাইতে হইবে? তাই কবিযশঃপ্রার্থী কীটস্ 'O, for a draught of vintage!' 'O, for a beaker full of the warm South!' বলিয়া ভাবে মসগুল হইয়াছেন। আর বাইবেলে লিখিতেছে, 'Wine which cheereth God and man'; আমাদের তন্ত্রশাস্ত্রেও সুরা 'দ্রবময়ী তারা'।"

রঙ্গলাল বাবুর বোতলবাহিনীর জ্বলন্ত ও জ্বালাকর গুণগান আরও কতক্ষণ চলিত জানি না, কিন্তু সুখের বিষয়, যেমন কণ্টক দ্বারা কণ্টক

উদ্ধার হয়, অথবা শেক্স্‌পীয়ারের ভাষায়, 'One fire drives out one fire ; one nail, one nail,' 'Falsehood falsehood cures, as fire cools fire', সেইরূপ এক বক্তার দাপটে অন্য বক্তার কণ্ঠরোধ হইল।

সিদ্ধেশ্বর বাবু বলিয়া উঠিলেন, "ধীরে, রঙ্গলাল, ধীরে! আর বাড়াবাড়ি করিও না। তুমি বাইবেলের বেদবাক্যই ঝাড় আর তন্ত্র-শাস্ত্রেরই দোহাই দাও, ব্রাহ্মণসন্তান আমি 'মদ্যমদেয়মপেয়মগ্রাহ্যম্' বলিয়াই জানি। আর বড়বড় লেখকদিগের যে পানদোষের কথা বলিলে সে 'তেজীয়সাং ন দোষায়'। তাই বলিয়া হারা-নরা দু'কলম লিখিতে পারে বলিয়া ঘোর মদ্যপ হইয়া দাঁড়াইবে, এ ব্যবস্থার সমর্থন করা যায় না। তবে, হাঁ তুমি যে বলিয়াছ—নেশায় নেশা বাঁধে, এ কথাটা লাখ কথায় এক কথা। কিন্তু মদ ছাড়া কি আর নেশা নাই? সদাশিব সিদ্ধির নেশায় ভোর হইয়া 'আগম'-শাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, ইহাই ত তন্ত্রের উৎপত্তির ইতিহাস। তিনি কি শেক্স্‌পীয়ার-মাইকেলের উপরে নহেন? আর দেখ, 'সিদ্ধিরস্তু' বলিয়া যখন লেখাপড়া আরম্ভ করিতে হয়, তখন 'সিদ্ধি খেলে বুদ্ধি বাড়ে' এবং তাহার ফলে নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভার স্ফূর্ত্তি হয়, ইহা কি আর বুঝাইতে হইবে? অতএব শুধু বিজয়াদশমীর রাত্রে কেন, প্রতিরাত্রেই সিদ্ধিপান কর, সাহিত্যসাধনায় সিদ্ধিলাভ ধ্রুব। 'সিদ্ধিঃ সাধ্যে সতামস্তু প্রসাদাত্তস্য ধূর্জ্জটেঃ'।" [আমিও মনে মনে বলিলাম, 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী'!]

সিদ্ধেশ্বর বাবুর কথা শেষ হইতে না হইতেই চিনিবাস-বাবু মিহিসুরে ধরিলেন, "সিধু ভায়া, চেপে যাও, ওসব সেকেলে অসভ্য নেশার কথা তুলিও না। উহা এখন গোপাল উড়ের যাত্রায় ও দরওয়ান-মহলে আশ্রয় লইয়াছে। এখন সভ্যসমাজের সুরুচিসম্মত নেশা—চা। 'স্বল্পাক্ষর-মসন্দিগ্ধং সারবৎ বিশ্বতোমুখম্।, অস্তোভমনবদ্যঞ্চ।' তীব্র হলাহল সুরা

ও উগ্র উত্তেজক ভাঙ্গ উভয়ই বর্জ্জনীয়। যদি জলপথেই যাইতে হয়, তবে চায়ের চেয়ে আর সাহিত্যচর্চ্চা চান্‌কাইবার মত নেশা কি আছে? শুধু 'এক পেয়ালা চা' খাইয়া ও গাইয়া দ্বিজেন্দ্রলাল কি কাণ্ডটা করিলেন, দেখ দেখি। গান, কবিতা, নাটক, সমালোচনা; কিছু কি বাকী রাখিয়া গিয়াছেন? শেষে গোটা 'ভারতবর্ষে'রই ভার বহিয়া বাসুকির সহিত প্রতিযোগিতায় অগ্রসর হইয়াছিলেন।

"আর যদি ইংরেজী নজির না পাইলে নিরস্ত না হও, তবে কুপরের বাক্যটি স্মরণ করহ:—'The cups that cheer but not inebriate', অর্থাৎ তাতায় কিন্তু মাতায় না, তীব্র সুরা ও উগ্র ভাঙ্গের মত জ্ঞানহারা বা মাথা গরম করে না, কেবল রক্তের জড়তা দূর করিয়া একটু চন্‌মনে করে। চুমুকে-চুমুকে এই চা পান করিয়া তিনি অবহেলে ষড়ধ্যায়ী Task কাব্যখানা লিখিয়া ফেলিলেন, যেন Task নহে,—sport (খেলা)! তোমার গোল্ড্‌স্মিথ্ Madeira মদিরা উদরস্থ করিয়া Vicar of Wakefield ও Deserted Villageএর মত সরস আখ্যায়িকা ও খণ্ডকাব্য লিখিয়া ফেলিলেন বলিয়া গুমর কর, কিন্তু দেখ ত তাঁহারই দোস্ত জন্‌সন্ একাসনে বসিয়া পঁচিশ পেয়ালা চা সাবাড় করিয়া তাহা অপেক্ষা নাগোগুণে (Solid) সারবান্ Rasselas ও Vanity of Human Wishes ত লিখিলেনই, তাহার উপর (বোঝার উপর শাক আঁটিটা!) বিরাট্ Dictionary খানা লিখিলেন, আর নিজ বাহুবলে দারিদ্র্য-সমুদ্র অক্লেশে সাঁতারে পার হইয়া Earl of Chesterfieldকে বেশ গরম-গরম দু' কথা শুনাইয়া দিলেন!—'Is not a patron, my lord, one who looks with unconcern on a man struggling for life in the water, and when he has reached ground, encumbers him with help'?"

চিনিবাস বাবুর কথাগুলি চিনির মতই মিষ্ট লাগিল। মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম, চায়ের কটুস্বাদ যদি ভাল না লাগে তাহা হইলে না হয় চায়ের জলটুকু ফেলিয়া দিয়া চিনি-মিশান গরম দুধ খাইয়া উদর-পূর্ত্তি, ও সাহিত্য-স্ফূর্ত্তি হইবে। কিন্তু চিনিবাস বাবুর কথা শেষ হইলে কালাচাঁদ বাবু চক্ষুঃ মেলিয়া মিটিমিটি চাহিয়া চাঁচা গলায় বলিতে আরম্ভ করিলেন :—"ভায়া হে, জলীয় চায়ের গুণ এত কি গাহিতেছ? উহাতে পদার্থ কতটুকু? আর ওটা ত বিদেশীর কাছ হইতে শেখা নেশা। নেশার ক্ষেত্রেও কি আমরা পরমুখপ্রেক্ষী হইব? বরং এই খাঁটি স্বদেশীর দিনে স্বদেশী নেশা অহিফেনের সেবা কর, যে 'চতুর্ব্বর্গফলপ্রাপ্তিঃ সুখাদল্পধিয়ামপি' হইবে। সুলেখক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তীর সাহিত্যকীর্ত্তি একবার স্মরণ কর দেখি। আর যদি স্বদেশী হইবার সময়ও তোমরা বিলাতী নজির খোঁজ—(তোমাদের ও রোগ আছে জানি)—তবে একবার অহিফেন-সেবী কোল্‌রিজ-ডিকুইন্সির অতুলনীয় রচনার কথা ভাব দেখি। শুধু কলমবাজিতে কেন, বৈঠকী আলাপেও তাঁহারা অদ্বিতীয় ছিলেন।"

এই সময়ে পণ্ডিত নসীরাম তর্কবাগীশ মহাশয় ফট্ করিয়া বলিয়া বসিলেন, "যদি স্বদেশীরই অত গোঁড়া হও, তবে নিতান্ত ঘরের জিনিশ নস্য কি দোষ করিল? ইহার এক এক টিপ্ লইলেই ত মাথা খোলসা হইবে, সাহিত্যরসও স্বতঃ নিঃসৃত হইবে। জানই ত 'নস্যপ্রিয়াঃ পণ্ডিতাঃ।' আর ম্লেচ্ছ সুইফ্‌ট্ জন্‌সন প্রভৃতিরও নস্যপ্রিয়তার কথা ইংরেজিনবিশদিগের প্রমুখাৎ শুনিয়াছি।" এই বলিয়া তিনি খুব এক টিপ নস্য নাসারন্ধ্রদ্বয়ে প্রবেশ করাইয়া একটা বিরাট হাঁচি হাঁচিলেন এবং নস্যদানিটি সোৎসাহে আমার দিকে আগাইয়া দিলেন।

এতক্ষণ তাকিয়া ঠেসান দিয়া গড়গড়ি দাদা আয়েস করিয়া গুড়গুড়ি

টানিতেছিলেন ; এখন তামাক পুড়িয়া আগুন নিবিয়া যাওয়াতেই হউক, অথবা তর্কবাগীশের বিরাট হাঁচির শব্দেই হউক ধ্যানভঙ্গ হওয়াতে, হাঁফ ছাড়িয়া বলিলেন, "কালাচাঁদ দা' ত বড় বড় করিয়া অনেক কথা বকিয়া গেলেন, কিন্তু আফিঙ কিরূপ অগ্নিমূল্য হইয়াছে তাহার খবর রাখেন কি ?"

এই বলিয়া তিনি আমার দিকে ফিরিয়া বলিতে লাগিলেন, "ভায়া, অত সাথরচে হইবার দরকার নাই, তা'র চেয়ে তামাক ধর, দেখিবে ধোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের কত খেয়াল গজাইবে। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের তামাকুসেবার সহিত সাহিত্যসেবার কত নিবিড় সম্বন্ধ ছিল, তাহা জাঁদরেল সমালোচকের মারফত জানিয়াছ ত ! বিলাতে গুড়ুকের চল না থাকিলেও কার্লাইল-টেনিসনের কড়া চুরুট টানার ব্যাপার কি কাহারও অবিদিত আছে ? নেশাতত্ত্বটা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বুঝাইতেছি, অবহিত হইয়া শুন। পদার্থের কঠিন, দ্রব ও বায়বীয়, এই তিন অবস্থা। সুরা, সিদ্ধি, চা, তিনই দ্রব অবস্থায় সেবন করিতে হয়, সুতরাং এ সব 'জলবত্তরলম্', উহাদের কোন অন্তঃসার নাই। আফিঙ কখনও জমাট আকারে কঠিন, কখনও laudanum-রূপে দ্রব, আবার কখনও গুলি চণ্ডু প্রভৃতির আকারে বাষ্পে পরিণত হইয়া, নেশাখোরের মৌতাত যোগায়। অর্থাৎ একটা নির্দ্দিষ্ট আকার নাই, মতিস্থির নাই, সুতরাং 'অব্যবস্থিতচিত্তস্য প্রসাদোঽপি ভয়ঙ্করঃ'। এই বিংশ শতাব্দীতে, এই বৈজ্ঞানিক যুগে, কঠিন স্থলপথ ও তরল জলপথ অপেক্ষা ব্যোম-পথই প্রশস্তব্য। সুতরাং তামাকের ধূমপানই শ্রেষ্ঠ নেশা; আর মাঝ হইতে নসীরাম পণ্ডিত যে ফেংড়া তুলিলেন, তাহার উচিত জবাব এই যে, কোন কোন রোগীকে নাসাপথে আহার (nasal feeding) করাইতে হয় বটে, কিন্তু নাসাপথে নেশা করা কখনই সুস্থ শরীরের চিহ্ন নহে।"

'কঃ পন্থাঃ' এই প্রশ্নের উত্তরে ষড় দর্শনের ন্যায় নিঃশ্রেয়স-লাভের ছয়টি পথ ছয়জনে নির্দ্দেশ করাতে কতকটা দিশাহারা হইয়া পড়িলাম—(রবীন্দ্রনাথও বলিয়াছেন, 'আমায় ছ'জনায় মিলে' পথ দেখায় ব'লে' পদে পদে তাই ভুলি হে')—কিন্তু সস্তা বলিয়াও বটে এবং সব চেয়ে নিরীহ নেশা বলিয়াও বটে, শেষ পরামর্শটাই শিরোধার্য্য করিয়া একেবারে আড্ডার ফেরত হুকা-কলিকা-তামাক-টিকা কিনিয়া ঘরে ফিরিলাম। কিন্তু টিকায় আগুন না দিতেই গৃহে আর এক আগুন জ্বলিল। সরঞ্জাম দেখিয়া গৃহিণী কে'ল-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়া ঝঙ্কার তুলিলেন—"এ সব আবার কি উৎপাত? ঘরদোর নোংরা হ'বে, তোমার কে দশজন চাকর-দাসী আছে যে পরিষ্কার করবে, লেপ তোষোক মশারী পুড়বে, খেসারত কি তোমার পরামর্শদাতা বন্ধুরা দেবেন?" আমি দ্বিরুক্তি না করাতে—(ইহাই সনাতন গার্হস্থ্য-নীতি)—একটু নরম হইয়া বলিলেন, "ও সব বদ নেশা অভ্যাস করিও না, বরং পাণের সঙ্গে একটু একটু সুরতি কি জরদা চাও ত দিতে পারি।" (গৃহিণীর পরামর্শটা কি নিতান্ত নিঃস্বার্থ?) আমি 'শয়নে পদ্মনাভ' স্মরণ করিয়া নিদ্রার ক্রোড়ে আশ্রয় লইলাম, এ সমস্যাসিন্ধুর কূলকিনারা কিছুই পাইলাম না।

পরদিন কলেজে আসিলে প্রস্তাবিত কলেজ-ইউনিয়নের সম্পাদক মহাশয় বুঝাইলেন—তিনি পূর্ব্বদিনের বৈঠকের বৃত্তান্ত সমস্তই জানিতেন—যে, "গড়গড়ি মহাশয় কঠিন, তরল ও বায়বীয় অবস্থা লইয়া যতই গাঢ় গবেষণা করুন না কেন, কঠিন পদার্থের মত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এমন আর কিছুই নাই। তাই ইংরেজিতে বলে, Nothing like leather; আর বায়বীয় পদার্থ সম্বন্ধে চূড়ান্ত কথা, It ended in smoke; অতএব কলেজে একটা ইউনিয়ন স্থাপন করিয়া যদি ভাল রকম ভক্ষ্যভোজ্যের

ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে সাহিত্যের নেশা না জমিয়াই পারে না *।"

তিনি পদার্থ-বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ সুতরাং জমাট বাঁধা (Solidification) সম্বন্ধে তাঁহার মীমাংসা মানিতেই হয়। আর আমিও ভাবিয়া দেখিলাম, কথাটা ঠিক। পূর্ণিমা-মিলন, সাহিত্য-সম্মিলন, পরিষদ্, সংসদ্, সঙ্গত, সঙ্ঘ, সর্ব্বত্রই এই নিয়ম খাটে। যেখানে খানাপিনার ঢালাও বন্দোবস্ত আছে, সেখানেই সাহিত্য-সাধনা সফলা হইয়াছে। যেমন দেখুন, চর্ব্বাচূষ্যের চাপেই সাহিত্যসম্মিলন বৎসর বৎসর জমে; এইরূপ ভূরিভোজনে পরিপুষ্ট হইয়াই ইহা দ্বাদশ বৎসরে পড়িয়াছে। পক্ষান্তরে, যেখানে এই আসল ঘরে ফাঁক, সামান্য চা-চুরুটে বা পাণ-তামাকে সারিবার চেষ্টা হইয়াছে, সেইখানেই উৎসাহের আগুন নিবিয়া গিয়াছে। পরিষদে একেবারেই ও ব্যবস্থা নাই, তাই অনেক সময় quorum হয় না! অতএব চা-চুরুটে না সারিয়া রীতিমত চপ্ কট্‌লেট্, কচুরি নিমকি, সন্দেশ রসগোল্লা প্রভৃতির ব্যবস্থা করিলে, ইউনিয়নের সফলতা অবশ্যম্ভাবিনী, অত্র সন্দেহো নাস্তি। শুধু রুখু প্রবন্ধ গলাধঃকরণ করিতে সুধীসমাজ নারাজ। তাঁহাদিগকে ত আর লেক্‌চারে percentage রাখিতে হইবে না যে বাধ্য হইয়া কমঠ-কঠোর বক্তৃতা কর্ণগোচর করিতেই হইবে।

* লেখক ছয় রকম নেশাকে ষড়্‌দর্শনের সহিত উপমিত করিয়াছেন। এটা কি ষড়্‌দর্শনের অতিরিক্ত চার্ব্বাক-দর্শন?—সংগ্রাহক।

ব্যর্থ প্রয়াস।*

[illegible]কা॥হনা।

(আগমনী ১৩২৬)

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"কবি হয়ে জন্মেছি ধরায়।' আমার এতটা পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি নাই, কিন্তু তথাপি আমার 'বয়োগতে কবিতা-বিলাসে'র সাধ হইল। হঠাৎ একদিন কবি হইবার খেয়াল মগজে উঠিল। (পাঠক বলিবেন, এত বিলম্বে কেন? মনে রাখিবেন, আমাদের কৈশোরে অকালপক্কতার, আজকালকার মত, অতটা বাড়াবাড়ি হয় নাই।) কালিদাসের 'মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্' আমার জপমন্ত্র হইল। স্থির করিলাম, 'যেমন করিয়া হউক, আমাকে কবি হইতেই হইবে। কলিকাতা-সহরের অনেক ফ্যাশান-দোরস্ত কবিকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। তাঁহাদের মত ধরণধারণ চলনবলন করিতে লাগিলাম। আমার মস্তকের কেশ ছিল 'শঙ্কিত সজারুপৃষ্ঠে কণ্টক যেমতি' 'Like quills upon the fretful porpentine (porcupine)'; হেয়ার-কাটারের বাড়ী গিয়া উচ্চ হারে সেলামী দিয়া উগ্র যন্ত্রণা সহ্য করিয়া কেশ কুঞ্চিত করিয়া লইলাম। শরীরের বর্ণ ছিল ভ্রমরকৃষ্ণ, প্রত্যহ অল্প-পরিমাণে আর্সেনিক উদরস্থ করিয়া বর্ণটা মেটেমেটে করিয়া লইলাম। জীরো নম্বরের চশমা ধরিলাম, চুড়ীদার, লপেটা, ঢাকাই ধুতী, সিল্কের চাদর সবই 'ব্যবহারে আনি'লাম,—বাকী রহিল কেবল inspiration অর্থাৎ কবিপ্রেরণা।

* বঙ্গবাসী কলেজ-ইউনিয়নের প্রথম অধিবেশনে পঠিত। (২১এ সেপ্টেম্বর ১৯১৯)

কবিপ্রেরণার উৎস-সন্ধানে কবিগণের গ্রন্থাবলী ঘাঁটিতে লাগিলাম। দেখিলাম, কেহ বলিয়াছেন—'বাশুলী আদেশে, কহে চণ্ডীদাসে'; কেহ বলিয়াছেন—'দেবী চণ্ডী মহামায়া, দিলেন চরণছায়া, আজ্ঞা দিলেন রচিতে সঙ্গীত'; কেহ বলিয়াছেন—'ভবানীর আজ্ঞায় ভারতচন্দ্র গায়।' এমন কি, নব-যুগের মহাকবি মাইকেল মধুসূদন খ্রীষ্টানী মত ভুলিয়া খাঁটী হিন্দুর মত (কারে পড়িলে মানুষের এমনিই হয়!) 'বন্দি চরণারবিন্দ অতি মন্দমতি আমি, ডাকি আবার তোমায়, শ্বেতভুজে ভারতি' বলিয়া বাণীর আবাহন করিয়াছেন। প্রতীচীর প্রাচীন কবিরাও Muse অর্থাৎ বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর আবাহন করিয়াছেন, খ্রীষ্টান কবি মিল্‌টন পর্য্যন্ত সেই গোড়ে গোড় দিয়াছেন—তবে Heavenly Muse বলিয়া পৌত্তলিকের দেবতাকে শোধন করিয়া লইয়াছেন! বৈদ্যসঙ্কটে রোগী মারা যাইবার মত আমি এইরূপ দেবীসঙ্কটে মারা যাইবার মত হইলাম, নানাদেবীর মধ্যে একটু দিশাহারা হইয়া পড়িলাম, ঋগ্বেদের ঋষির মত 'কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম' বলিয়া আকুল হইলাম। (ছোটমুখে বড় কথা!) যাহা হউক, এই ধাক্কা সামলাইয়া লইয়া কৃষ্ণনগরাধিপের সভাকবি ভারতচন্দ্রের 'ভারতের ভারতী ভরসা' এই বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া বাগ্‌দেবীর স্মরণগ্রহণ করাই শ্রেয়ঃকল্প মনে করিলাম।

কালী, কলম, কাগজ লইয়া একটি সরস্বতীবন্দনা ফাঁদিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় গৃহিণী তাম্বূলসেবার জন্য সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। লেখার সরঞ্জাম দেখিয়া, কৌতূহলের বশবর্ত্তিনী হইয়া তিনি চেয়ারের পিঠে ঝুঁকিয়া পড়িলেন, এবং দেখিলেন, বড় বড় হরপে '**সরস্বতী-বন্দনা**' কথাটা লিখিয়াছি। দেখিয়াই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "এ কি? এখনকার দিনেও তুমি সেকেলে সরস্বতী-বন্দনা লিখিতেছ? তুমি কি পড় নাই? হেমবাবু লিখিয়াছেন—

'দেবতা অসুরগণ, ক্রমে হয় অদর্শন,
ঈশ্বরেরই সিংহাসন উঠিতেছে কাঁপিয়া।'

তা' ছাড়া এখনকার দিনে বীণাপাণির পূজা কেবল এক শ্রেণীর স্ত্রীলোক-মহলে প্রচলিত আছে, তোমার মত কৃতবিদ্যগণ এখন জীবন্ত চলন্ত পুংসরস্বতীর পূজা করেন। তুমি তাঁহার পূজায় নারাজ হইয়া কি বিশ্ববিদ্যা-জননীর ত্যাজ্যপুত্র হইতে চাও?" (শ্বশুর মহাশয় আমার মাথা খাইতে ইঁহাকে মেয়ে-কলেজে পড়াইয়াছিলেন। এখন এই 'অল্প-বিদ্যা ভয়ঙ্করী'র দাপটে আমি অস্থির। ইতি জনান্তিকে।) আমি গত্যন্তর না দেখিয়া কবি হইবার গুপ্তবাসনা গৃহিণীর কাছে ব্যক্ত করিলাম।

এই কথা শুনিয়া তিনি একগাল হাসিয়া 'দন্তরুচিকৌমুদী' বিকাশ করিয়া বলিলেন, "তা, এর জন্য অন্য দেবতার দুয়ারে ধর্না কেন? তুমি কি জান না, হাল আইনে পত্নীই পতির আরাধ্য দেবতা? পত্নীর প্রেমে বিভোর হও, 'সেই ধ্যান সেই জ্ঞান' কর, আপনিই কবিপ্রেরণা আসিবে। 'অর্কে চেন্মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্বতং ব্রজেৎ।' ঘরে বসিয়া যদি গতিমুক্তি হয়, তবে আকাশবৃত্তি হইয়া দেবতার মুখ চাওয়া কেন? দেখ, মহাজনেরা বলিয়াছেন, গৃহস্থকে 'গৃহিণীসচিব' হইতে হয়; কবি কালিদাসও স্বীকার করিয়াছেন—'গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ'। অতএব আর ইতস্ততঃ না করিয়া আমার পরামর্শ লও, সিদ্ধিলাভ হইবে।"

আমাকে সুবোধ বালকের মত তাঁহার বাক্যে মনোযোগী দেখিয়া তিনি আরও উৎসাহের সহিত বলিতে লাগিলেন—"কালিদাসের কথায় আর এক কথা মনে পড়িল। কালিদাস সরস্বতীর বরে কবিশক্তি লাভ করিয়াছিলেন, ইত্যাকার কিংবদন্তী শুনিয়া তোমার, বোধ হয়, এইরূপ মতিগতি হইয়াছে। কিন্তু এটি তোমার ঠিকে ভুল। তাঁহার

কবিশক্তি-লাভের মূলকারণ পত্নীর তিরস্কার। বিদুষী রাজকন্যা তাঁহাকে অপমান না করিলে তিনি কোনও দিনই কবি হইতে পারিতেন না। তাই বলিতেছি, তুমিও আমার তিরস্কারে কবি হইয়া উঠিবে। দেখ, কালিদাস অকৃতজ্ঞ ছিলেন না, তিনি প্রিয়াকে সম্বোধন করিয়া 'ঋতুসংহার' ও 'শ্রুতবোধ' রচনা করিয়া ঋণস্বীকার ও কতক পরিমাণে ঋণ-পরিশোধও করিয়াছেন। এখনও অনেক কবি পত্নীকে পুস্তক উৎসর্গ করিয়া পত্নীর নিকট ঋণ স্বীকার করেন।

"এই ত গেল কালিদাসের কথা। তা'র পর 'ভারতের কালিদাস' ছাড়িয়া 'জগতের' কালিদাস—অর্থাৎ শেক্‌স্‌পীয়ারের কথা। ইংরেজ-বাচ্ছা শেক্‌স্‌পীয়ার্ বাপের সুপুত্র হইয়া কথাটা কালিদাসের মত এমন সহজে এমন সৌজন্যের সহিত স্বীকার করেন নাই বটে, কিন্তু পত্নীর প্রভাবেই যে তাঁহারও কবিত্বস্ফূর্ত্তি হইয়াছিল, তাহা তাঁহার প্রথম মানসসন্তান ('First heir of my invention') 'ভীনাস্ এণ্ড এডোনিস্' কাব্য পাঠ করিলেই, যাহার চক্ষুঃ আছে, সে দেখিতে পাইবে। যখন রসিকা বয়োঽধিকা বাগ্‌বিদগ্ধা ভীনাস্-দেবী লাজুক তরুণ যুবক এডোনিসের নিকট গদ্গদবচনে প্রেম জ্ঞাপন করিতেছেন, এই দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত হয় তখন কি কাহারও বুঝিতে বাকী থাকে যে, ছদ্মনামের অন্তরালে রসিকা বয়োঽধিকা বাগ্‌বিদগ্ধা এন্ হ্যাথাওয়ে (Anne Hathaway) লাজুক তরুণ যুবক শেক্‌স্‌পীয়ারের প্রসাদনে ব্যাপৃত? অর্থাৎ কবি নিজের প্রণয়িনীর পূর্ব্বরাগ হইতেই কবিপ্রেরণা পাইয়াছেন। তাঁহার রচিত অনেক মিলনান্ত নাটকে যে প্রগল্‌ভা প্রেমিকা নায়িকা নায়কের প্রসাদনে ব্যগ্র, এইরূপ চিত্র দেখা যায়, তাহাও ইহারই পুনরাবৃত্তি।

"আবার কবিবর ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থেরও পত্নীর নিকট ঋণ কম নহে। তাঁহার পত্নী তাঁহাকে শুধু কবিপ্রেরণা দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, নিজের

রচিত দু'চারি ছত্র কবিতাও তাঁহার কবিতার মধ্যে গছাইয়া দিয়াছেন। এমনটুকু কালিদাসের বিদুষী পত্নীও পারেন নাই। কবিও কৃতজ্ঞহৃদয়ে একাধিক কবিতায় ঐ-হেন পত্নীর গুণগান করিয়াছেন। শেলি দুইবার বিবাহ করিয়াছিলেন। দুই পত্নীর প্রেমেই ডগমগ হইয়া তাঁহাদিগের উদ্দেশে কবিতা লিখিয়াছেন ও উৎকৃষ্ট কাব্যগুলি তাঁহাদের নামে উৎসর্গ করিয়াছেন। টেনিসনের পত্নীপ্রীতি ইহারও অনেক উর্দ্ধে। আর ব্রাউনিং-দম্পতীর অন্যোন্যানুরাগ তাঁহাদিগের সুমধুর প্রেমকবিতায় সপ্রকাশ। স্পেন্‌সার্ ভাবী পত্নীর উদ্দেশে লিখিত সুমিষ্ট সনেটে 'You frame my thoughts and fashion me within' বলিয়া কবিপ্রেরণার মূল কে তাহা খোলসা স্বীকার করিয়াছেন এবং পরিণয়-উপলক্ষে এমন সুন্দর কবিতা লিখিয়াছেন যে, এখনকার প্রীতি-উপহারগুলি তাহার কাছে কবিতাই নহে। জার্মাণ কবি গেটেও ভাবী পত্নীর উদ্দেশে সুন্দর কবিতাবলি লিখিয়াছেন। মিল্‌টন্ মৃত পত্নীর উদ্দেশে যে সনেট্ লিখিয়াছেন, তাহা কেমন প্রাণস্পর্শী! ফীল্‌ডিং কবি না হইলেও নভেল লিখিয়া কল্পনাকুশলতার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন যে, পত্নীকে আদর্শ করিয়াই তিনি নায়িকার চিত্র আঁকিয়াছেন।

"তা'র পর বাঙ্গালা ভাষায় না হইলেও বাঙ্গালা দেশের প্রাচীন কবি 'মধুর-কোমল-কান্তপদাবলী'-রচয়িতা জয়দেব গোস্বামীর কবিতা-সরস্বতী যে পত্নীর প্রেরণায় উৎসারিত হইয়াছিল, তাহা তিনি নিজেকে 'পদ্মাবতী-চরণচারণচক্রবর্ত্তী' বলিয়া পরিচয় দিয়া সগৌরবে স্বীকার করিয়াছেন। *

* এইখানে গৃহিণী একটু ঠিকে ভুল করিয়াছেন। নামসাম্যে এইটুকু ঘটিয়াছে। জয়দেবের পত্নীর নাম পদ্মাবতী বটে, কিন্তু এস্থলে পদ্মাবতী শ্রীরাধার নামান্তর। (শ্লেষ নাই ত?) কিন্তু গৃহিণীর বাক্যের প্রবাহে বাধা দিয়া রসভঙ্গ করিতে প্রবৃত্তি হইল না।

আর বাঙ্গালার নবযুগের মনীষী ভূ-দেব ভূদেবের 'পারিবারিক প্রবন্ধে'র উৎসর্গপত্রটা একবার পড়িয়া দেখ, তিনি নূতন পুরাণে প্রচারিত কোন্ দশমহাবিদ্যা-লীলাময়ী দেবীমূর্ত্তির প্রভাবে, প্রসাদে ও প্রেরণায় জননী বঙ্গভাষাকে অমূল্য চিন্তারত্নরাজিতে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। যে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালার সাহিত্যাকাশ 'শুভ্রজ্যোৎস্নাপুলকিত' করিয়াছেন, তিনি কবুলজবাব দিয়াছেন—"একজনের প্রভাব আমার জীবনে বড় বেশী রকমের—আমার পরিবারের।...তিনি না থাকিলে আমি কি হইতাম, বলিতে পারি না।...স্ত্রীই আমার জীবনের কল্যাণ-স্বরূপিণী।' শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় যে গল্পলেখক হইয়াও একমাত্র 'উদ্ভ্রান্তপ্রেমে' কবিত্বময়ী ভাষায় হৃদয়োচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়াছেন, পত্নীপ্রেমের প্রভাবই তাহার কারণ নহে কি? ইহার পরেও কি সন্দেহ করিবে যে, পত্নীই কবিপ্রেরণার মূল উৎস, কল্পনা-কল্পতরু-মূলাধারে কুলকুণ্ডলিনী?"

আমি নীরবে অবহিতচিত্তে বিদুষী বনিতার লম্বা লেক্‌চার শুনিয়া গেলাম; বুঝিলাম যে, লেক্‌চার দেওয়া আমার দৈনন্দিন কার্য্য হইলেও গৃহিণীর 'অশিক্ষিতপটুত্ব' আমাকে হারি মানাইতে পারে। 'মৌনং সম্মতিলক্ষণম্' মনে করিয়া তিনি বোধ হয় আমার উপর সুপ্রসন্ন হইতেছিলেন; কিন্তু আমি ভাবিলাম, লেক্‌চার-সমরে গৃহিণীর নিকট পরাজয় স্বীকার করিলে আমাকে ব্যবসা ছাড়িয়া দিতে হইবে, চাই কি, মণ্ডন-মিশ্রের মত মস্তকমুণ্ডন ও ডোরকৌপীন-ধারণ করিয়া গৃহত্যাগী হইতে হইবে, তাই [illegible] গৃহিণীর 'পূর্ব্বপক্ষে'র খণ্ডন করিতে বদ্ধপরিকর হইলাম। আরও ভাবিলাম, যিনি 'প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ' হইবার কথা, তাঁহাকে গুরুকরণ করিতে হইলে যে বিপরীত বিপর্য্যয় ব্যাপার দাঁড়ায়। এখনই গৃহিণীর যেরূপ প্রচণ্ড প্রতাপ, তাহার উপর তাঁহাকে শুধু গার্হস্থ্যজীবনে নহে, সাহিত্যজীবনেও প্রাধান্য দিতে হইলে

আর রক্ষা থাকিবে না। একেই ত তাঁহার আবদার অফুরন্ত, তবু যতক্ষণ সাহিত্যচর্চ্চায় মগ্ন থাকিব, ততক্ষণ তাঁহার তোয়াক্কা রাখিব না, এমন ভরসা ছিল, কিন্তু সে ক্ষেত্রেও যদি তাঁহাকেই ইষ্টগুরুর আসনে বসাইতে হয়, তাহা হইলে ত তাঁহাকে আঁটিয়া উঠা দায় হইবে। এইরূপে নানাভাবে বিষয়টির পর্য্যালোচনা করিয়া আমি স্পষ্টবাক্যে কান্তার উপদেশযুক্ত বক্তৃতার প্রতিবাদ করিলাম। (হায়! তখন ঝোঁকের মাথায় বুঝি নাই, এই স্পষ্টবাদিতার কি পরিণাম হইবে!)

আমি বলিলাম, "দেখ, তান্ত্রিক সাধনার ন্যায় সাহিত্যিক সাধনায়ও যে একজন স্ত্রীলোকের, একজন 'শক্তি'র প্রয়োজন, তাহা তোমার কথায় বেশ বুঝিলাম। কিন্তু শাস্ত্রে বলে, এ সকল ক্রিয়ায় স্বকীয়া অপেক্ষা পরকীয়া শ্রেষ্ঠা। স্বকীয়া-পরকীয়া-তত্ত্ব ছাড়িয়া দিয়া প্রসঙ্গতঃ বলিতে পারি যে, জননী ভগিনী প্রভৃতির প্রভাবে বা প্রেরণায়ও স্থানে স্থানে কবিত্বস্ফুরণ হইয়াছে। তুমি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের পত্নীর প্রভাবের কথা স্বমতপ্রতিষ্ঠার আগ্রহে যতই বাড়াইয়া বল না কেন, ইহা সর্ব্বজন-বিদিত যে, তাঁহার কবিজীবনে সহোদরা কনিষ্ঠা ভগিনীর প্রভাব ও প্রেরণা অপরিসীম। তিনি পুনঃ পুনঃ এ কথা মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার সুহৃদ্‌ চার্লস্‌ ল্যাম্বের সহোদরা জ্যেষ্ঠা ভগিনীর নিকট ঋণও উল্লেখযোগ্য। স্যর্‌ ফিলিপ্‌ সিড্‌নি সহোদরা ভগিনীর প্রীতিকামনায় আর্কেডিয়া-নামক চম্পূকাব্য লিখিয়াছেন। উৎসর্গ-পত্রে ভগিনীকে 'most dear' বলিয়া সম্বোধন করিয়া 'you desired me to do this, and your desire to my heart is an absolute commandment' বলিয়া আত্মনিবেদন করিয়া গভীর ভগিনীপ্রীতির পরিচয় দিয়াছেন। কাব্যখানিও (The Countess of Pembroke's Arcadia) তাঁহার ভগিনীর নামের সহিত জড়িত হইয়া

প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।[১] কূপার্ মাতৃভক্তির প্রেরণায় তাঁহার শ্রেষ্ঠ কবিতা 'জননীর চিত্রদর্শনে' লিখিয়াছেন। শেন্‌ষ্টোন্ তাঁহার গুরু-মার প্রতি ভক্তি-প্রণোদিত হইয়া 'Schoolmistress' নামক খণ্ডকাব্য লিখিয়াছেন। ফরাসী নভেল-লেখক ব্যাল্‌জ্যাক্ তাঁহার সহোদরা ভগিনীর উৎসাহ ও সমবেদনা সম্বল করিয়াই সাহিত্যসাধনায় প্রবৃত্ত হন। ইংরেজ কবি শেলিও ভগিনীর সমবেদনা ও সাহচর্য্যে কবিতা লিখিতে প্রবৃত্ত হয়েন; তবে তিনি অতি শীঘ্রই গভীরতর প্রীতির পাত্র পাইয়াছিলেন। ষোড়শবর্ষ বয়স হইতেই তিনি প্রেমচর্চ্চা সুরু করেন।

"কিন্তু এই শ্রেণীর কবির সংখ্যা নিতান্ত অল্প। আবার ইঁহারাই যখন পরকীয়াপ্রেমে বিভোর হইয়া কবিতা লিখিয়াছেন, তখন সেই সব কবিতায় যে আন্তরিকতা ও তীব্রমাধুর্য্য ঢালিয়াছেন, তাহা জননী, ভগিনী, এমন কি, পত্নীর বেলায়ও দেখা যায় না। দৃষ্টান্তস্থলে কূপারের My Mary, To Mary কবিতাযুগল, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের লু'সর উদ্দেশে লিখিত কবিতাবলি, ল্যাম্বের Hester কবিতা, Annar উদ্দেশে লিখিত সনেট্‌গুলি ও ব্যর্থপ্রণয়ের স্মৃতিনিদর্শন Rosamund Gray ছোট-গল্প প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়। সাধে কি বায়রন্ বলিয়াছেন—

'Think you if Laura had been Petrach's wife
He would have written sonnets all his life?'

"ফলতঃ শেক্‌স্‌পীয়ার্ হইতে এণ্টুনি ফিরিঙ্গি পর্য্যন্ত বহু কবি এই পরকীয়াপ্রেমের অনুকূল। তুমি বলিতেছ, শেকস্‌পীয়ার্ বয়োঽধিকা পত্নীর প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া তাঁহার প্রথম কাব্য ও কয়েকখানি মিলনান্ত নাটক লিখিয়াছেন। তাহা অস্বীকার করি না। কিন্তু সেগুলিতে ত তিনি তাঁহার অন্তরের কথা প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার Sonnets অর্থাৎ চতুর্দ্দশপদী কবিতাগুলিতেই তিনি হৃদয়ের অন্তর্গূঢ়

বেদনা প্রকাশ করিয়াছেন, কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ এইরূপ রায় দিয়াছেন। এগুলি যে পরকীয়াপ্রেম-প্রণোদিত, ইহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই; ব্যাখ্যাকারগণ অসাধারণ অধ্যবসায়-সহকারে সেই dark ladyর নামধাম, জাতিকুল, পেশা পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিয়া নিজেরাও ধন্য হইয়াছেন, শেক্স্পীয়ারকেও ধন্য করিয়াছেন! তুমি স্পেন্সারের সনেট্‌গুলি পত্নীপ্রেমের প্রেরণায় রচিত বলিয়াছ, কিন্তু স্পেন্সারের অন্যতম মুরুব্বী ও দোস্ত স্যর্ ফিলিপ্ সিড্নির সনেট্‌গুলি সম্বন্ধে ত সে কথা বলিতে পার না। যে নারীকে উদ্দেশ করিয়া সিড্নি সনেট্‌গুলি লিখিয়াছেন, সেই নারীর সহিত এক সময়ে তাঁহার বিবাহ-সম্বন্ধ হইয়াছিল বটে, কিন্তু বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, সনেট্‌গুলির রচনাকাল ঐ নারী অপরের অঙ্কশায়িনী হইবার পর। অথচ আদর্শচরিত্র সিড্নি পরকীয়াপ্রেমে বিভোর হইয়া হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে কবিতাগুলি লিখিয়াছেন ('look in thy heart and write, and love doth hold my hand and makes me write') এবং উচ্ছ্বাসভরে প্রণয়িনীকে সম্বোধন করিয়াছেন—

> 'Stella the only planet of my light,
> Light of my life, and life of my desire
> Chief good whereto my hope doth only aspire
> World of my wealth, and heaven of my delight
> If thou praise not, all other praise is shame.'

পূর্ব্বে সিড্নির ভগিনীপ্রীতির কথা বলিয়াছি বটে, কিন্তু এই পরকীয়াপ্রীতি সর্ব্বাতিশায়িনী।

"তাহার পর সনেটের রাজা 'ফ্রান্সিস্কো পেত্রার্কা কবি'—আমাদের মাইকেল যাঁহাকে 'বড়ই যশস্বী সাধু কবি-কুল-ধন' বলিয়া সাধুবাদ করিয়াছেন—যে পরকীয়া লরার উদ্দেশে সনেট্ লিখিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, ইহা সর্ব্বজনবিদিত। ইতালীয় কবি দান্তে-ট্যাসো সম্বন্ধেও মোটের উপর ঐ একই

কথা। যে সব ইংরেজ কবি ইতালীয় কবিগণের অনুসরণে সনেট্ লিখিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই পরকীয়াপ্রেমের চর্চ্চায় এই পথ ধরিয়াছেন।

"মহাকবি মিল্‌টন একটিমাত্র সনেটে দ্বিতীয় পক্ষের পত্নীর দেহত্যাগের পর তাঁহার গুণগান করিয়াছেন, ইহা লইয়া তুমি খুব আস্ফালন করিয়াছ, কিন্তু পত্নীর মরণের পর ওরূপ ভাবোচ্ছ্বাস অনেক গদ্য-পদ্য-লেখকেরই হয়। (এইখানে গৃহিণী ফট্ করিয়া বলিয়া বসিলেন,—হয় ত তোমার মত হৃদয়হীনেরও হইবে। যাক্, সে কথা।) এই শুদ্ধশীল কবি যৌবনে ইতালী-প্রবাসকালে লিওনোরা-নাম্নী গায়িকার ও অপর একজন অজ্ঞাতনাম্নী ইতালীয় সুন্দরীর রূপগুণে মুগ্ধ হইয়া যে সব কবিতা লিখিয়াছেন, তাহাতে যে উচ্ছ্বাস ও উদ্দামতা আছে, তাহা মৃত পত্নীর উদ্দেশে রচিত সনেটে পাওয়া যায় না। ভাগ্যে সেগুলি ল্যাটিন্ ও ইতালীয় ভাষায় লিখিত, তাই ভক্তগণ অনেকে সে সংবাদ রাখেন না, সুতরাং তাঁহাদের ভক্তি অব্যাহত আছে। চরিত্রবান্ কবির এরূপ মতিগতি বোধ হয় বিলাসভূমি ইতালীর আবহাওয়ার গুণে। তাই ত পাকা স্কুলমাষ্টার এস্‌কাম্ (Ascham) ইতালীভ্রমণের উপর হাড়ে চটা ছিলেন। তাঁহার যৌবনে রচিত আর একটি ল্যাটিন কবিতা হইতে বুঝা যায় যে তিনি স্বদেশেও অল্পদিনের জন্য একটি অজ্ঞাতকুলশীলা সুন্দরীকে দর্শন করিয়া প্রেমবিহ্বল হইয়াছিলেন। ইহা যে যৌবনের ধর্ম্ম। সংযমী মিল্‌টনও ইহার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই।

"কূপারের My Mary, To Mary, কবিতা-যুগলের কথা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাঁহার দীর্ঘ কাব্য The Task যে পরকীয়ার প্রণোদনায়, ফরমায়েশে রচিত, তাহা তিনি ভাবগদ্গদকণ্ঠে কাব্যের মুখবন্ধেই স্বীকার করিয়াছেন,—'The theme, though humble, yet august and proud Th'occasion—for the Fair commands

the Song;' আবার রঙ্গপ্রিয়া পরকীয়ার পায়ায় পড়িয়া গম্ভীরপ্রকৃতি কবি কেমন বিমল হাস্য-রসের বান ডাকাইয়াছেন, তাহা তাঁহার John Gilpinএ সপ্রকাশ। ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে তিনি প্রথম যৌবনে খুল্লতাত-কন্যার প্রেমচর্চ্চা করিয়াই কবিতা লেখা সুরু করেন।

"বার্ন্স্ ও বায়রন্ একপ্রকার বাল্যকাল হইতেই প্রেমের চর্চ্চা করিতেন, ফলে পরকীয়াপ্রেমের প্রভাবেই তাঁহাদিগের গীতিকবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুরতা লাভ করিয়াছে। বায়রন্ একবার বলিয়াছেন:—'My first dash into poetry was as early as 1800. It was the ebullition of a passion for my first cousin Margaret Parker, one of the most beautiful of evanescent beings.' ইহা ছাড়া অপেক্ষাকৃত প্রবীণ বয়সে ইটালীবাস-কালে একজন বিদেশিনীর সংস্পর্শে বায়রনের উৎকৃষ্ট কাব্যগুলি প্রভাবিত। এইরূপ কীট্সের কবিতার উপর একটি নারীর প্রভাব জাজ্বল্যমান। ইহা ছাড়াও কীট্সের অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপসর্গ ছিল। তুমি শেলীর পত্নীপ্রেমের কথা না তুলিলেই ভাল করিতে। কেননা ইহা সর্ব্বজনবিদিত যে তিনি প্রথমা পত্নীর সহিত পাকাপাকি বিবাহচ্ছেদ না করিয়াই দ্বিতীয়া নায়িকাকে লইয়া ভাসিয়া পড়েন। এই চিত্রা-রোহিণী ছাড়া আরও যে কত কুমারী, সধবা ও বিধবা তারারূপে শেলি-চন্দ্রের হৃদয়াকাশ উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই প্রেমের প্রভাবে তিনি সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখিয়া হৃদয়ের ভার লঘু করিয়াছেন। শুনিয়াছি, ফরাসী কবি Alfred de Musset এক এক চোট প্রেমে পড়িয়া প্রেমের পিচ্ছিল পথে চোট খাইতেন, আর এক একখানি কাব্য লিখিতেন; বোধ হয়, এই কাব্যরসসিক্ত প্রলেপেই তাঁহার বেদনা দূর হইত, ভাঙ্গা হৃদয় আবার যোড়া লাগিত।

"রূসোর ব্যাপার ত একেবারে অবক্তব্য। তুমি আখ্যায়িকা-কার ফীল্ডিং-এর পত্নীপ্রীতির কথা বলিয়াছ। কিন্তু তাঁহার সমকালীন আখ্যায়িকা-কার ষ্টার্ণ্ পরকীয়াপ্রীতিতে মসগুল হইয়াই অপূর্ব্ব-ভাব-প্রবণতার পরিচয় দিয়াছেন। সুইফ্‌ট্ নীরস হইয়াও কুমারী 'ষ্টেলা' ও 'ভ্যানেসা'র প্রেমের দোটানায় সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখিয়া ফেলিয়াছেন। ঠিক পরকীয়াপ্রীতি না হইলেও ইহা ঐ গোত্রেরই। এই আমলে প্রায় সকল কবিই আইবুড় ছিলেন বটে, কিন্তু সকলেই এক একটি 'শক্তি' গ্রহণ করিয়াছিলেন।

"জন্ ষ্টুয়ার্ট্ মিল্ কবি ছিলেন না বটে, কিন্তু তিনি (ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের) কবিতার সমজদার ছিলেন সুতরাং তাঁহাকেও এ দলে টানা যায়। তিনি কবিজনোচিত ভাষায় সধবা বন্ধুপত্নী Mrs Taylorএর নিকট তাঁহার ঋণস্বীকার করিয়াছেন। দার্শনিক-প্রবর, বন্ধুপত্নী বিধবা হইলে তাঁহার বৈধব্যযন্ত্রণা দূর করিয়া, পরকীয়াকে স্বকীয়ায় পরিণত করিয়া, শেষরক্ষা করিয়াছিলেন। ফরাসী নভেল-লেখক ব্যাল্‌জ্যাক্‌ও ঠিক এই কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার ভগিনীর প্রভাব অপেক্ষা যে পরকীয়া শেষে তাঁহার স্বকীয়া হইয়াছিলেন, সেই মহিলার ও অন্যান্য প্রীতিশীলা পরকীয়ার প্রভাবেই তাঁহার কল্পনাশক্তির পূর্ণবিকাশ হইয়াছিল।

"তুমি বিদেশীয়দিগের নজীর খাড়া করিয়াছিলে, তাই আমিও এতগুলি বিদেশীর কথা বলিয়া সে কথার কাটান দিলাম। স্বদেশীর চেয়ে বিদেশীদিগের সঙ্গেই আমার ব্যবসায়সূত্রে পরিচয় বেশী, তাই একটুকু বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলিয়াছি। আর বিদেশী নজীর আওড়াইয়া তোমার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইব না। এইবার স্বদেশী কবিদিগের কথা বলি।

"তুমি কালিদাসের পত্নীর প্রভাবের উপর খুব ঝোঁক দিয়াছ। কিন্তু তিনি কবিতা লিখিয়াই মালিনীকে পড়িয়া শুনাইতেন, মালিনী না শুনিলে, না ভাল বলিলে, তাঁহার মন শুদ্ধ হইত না, এই যে প্রবাদ আছে, ইহা

একেবারেই উড়াইয়া দিলে চলে না। ন হ্যমূলা জনশ্রুতিঃ। অন্যে পরে কা কথা; স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র এ প্রবাদের পোষকতা করিয়াছেন ('বিষবৃক্ষ' দেখ)। ইহা ছাড়া, কালিদাসের অবাধ প্রণয়চর্চ্চার দু' একটি গল্পও আছে/তাহাতে মনে হয়, তিনি শুধু কবিপ্রতিভায় কেন, কবিজীবনের এ সব আনুষঙ্গিক ব্যাপারেও শেক্‌স্‌পীয়ারের সমকক্ষ ছিলেন।

"তাহার পর বাঙ্গালা সাহিত্যের পালা। বিদ্যাপতি মৈথিল কবি হইলেও বহু প্রসিদ্ধ সমালোচক তাঁহাকে বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে সম্মানিত স্থান দিয়াছেন। তিনি আশ্রয়দাতা রাজা শিবসিংহের রাণী লখিমার প্রতি প্রেমের প্রভাবে কবি হইয়াছিলেন, লখিমার দর্শনমাত্রেই তাঁহার কবিত্বস্ফুরণ হইত। অত্র প্রমাণং যথা। "লখিমা-রূপিণী রাধা ইষ্ট বস্তু যার। যারে দেখি কবিতা স্ফুরয়ে শতধার॥" ইতি নরহরি দাস। সম্প্রতি কেহ কেহ এই প্রবাদের প্রতিবাদ করিয়াছেন। কিন্তু বহু ভক্ত বৈষ্ণবের ইহাই দৃঢ় বিশ্বাস।

"তাহার পর শ্রেষ্ঠ প্রেমের কবি বড়ু চণ্ডীদাস। প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ-বৃত্তিধারী মনস্বী ৺উমেশচন্দ্র বটব্যাল বলিয়া গিয়াছেন, 'নান্নুরের একটি অবিবাহিত দরিদ্র ব্রাহ্মণ এবং একটি বিধবা দরিদ্রা রজকী পরস্পরকে ভালবাসিয়াছিল এবং সেই ভালবাসা হইতে বাঙ্গালা সাহিত্যের উদ্যানে সর্ব্বপ্রথমে একটি সুন্দর ফুল ফুটিয়াছিল।' এই 'রজকিনীরূপ কিশোরী-স্বরূপ,' এই 'রজকিনী-প্রেম নিকষিত হেম' যে বাশুলী দেবীর হাতের চড়ের চেয়ে চমৎকার, ইহা কি আর বলিতে হইবে? তাই 'গোপানী-চরণ-সার' চণ্ডীদাস প্রাণ খুলিয়া গায়িয়াছেন—'শুন রজকিনি রামি। ও দুটি চরণ শীতল জানিয়া শরণ লইনু আমি।'

"এইবার 'মধুরেণ সমাপয়েৎ'। যে নিধুবাবুর টপ্পা শুনিলে তোমরা একেবারে গলিয়া যাও, আর তোমাদের 'সখি আমায় ধর ধর' অবস্থা হয়,

তিনি তিন তিনটা বিবাহ করিয়াও দাম্পত্যপ্রেমের প্রভাবে প্রভাবিত হন নাই, শ্রীমতী-নাম্নী বারাঙ্গনার প্রভাবে তাঁহার কবিপ্রতিভা প্রভাবিত হইয়াছিল। তবে এই প্রণয় চণ্ডীদাসের পরকীয়াপ্রীতির মতই নির্ম্মল, 'কামগন্ধ নাহি তায়।' এই সংবাদ আমরা 'সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকা'র ন্যায় শ্রদ্ধেয় পত্রিকার মারফত পাইয়াছি, এবং এ ক্ষেত্রেও একজন শ্রদ্ধেয় প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ-বৃত্তিধারী উক্ত প্রবাদ বা অপবাদের প্রচার করিয়াছেন। অতএব বুঝা গেল, এই প্রেমেই তাঁহার টপ্পার উৎস। আবার বিরহের কবি রামবসু যজ্ঞেশ্বরী-নাম্নী গায়িকার প্রণয়াসক্ত ছিলেন, এসংবাদও আমরা উক্ত প্রেমচাঁদী পণ্ডিতের ইংরেজীতে লিখিত বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস হইতে জানিতে পারি। আশা করি, তোমাকে এতক্ষণে বুঝাইতে পারিয়াছি যে, স্বকীয়াপ্রেম অপেক্ষা পরকীয়াপ্রেমই কবি-প্রেরণার পক্ষে অধিকতর অনুকূল।"

এই সুদীর্ঘ বক্তৃতা শুনিয়া গৃহিণী কি কাণ্ড করিলেন, সে সব গুপ্তকথা ব্যক্ত করিয়া আর পাঠক মহাশয়ের ভীতি উৎপাদন করিতে চাহি না। এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আমার কবি হওয়া ঘটিল না, শেষটা এই দাঁড়াইল। সাজগোজ সবই বৃথায় গেল। চশমা লপেটা চুড়ীদার ঢাকাই ধুতী সিল্কের চাদর—সুট্‌কে সুট্ সৎপাত্রে অর্থাৎ শ্যালক-প্রবরকে দান করিতে বাধ্য হইলাম। আর্সেনিকের খরচ উঠাইয়া দিলাম, হেয়ারকাটারের বাড়ী গিয়া দ্বিগুণ দক্ষিণা দিয়া আবার কুঞ্চিত কল্লাপ সিধা করাইয়া লইলাম। এক কথায় 'পুনর্মূষিক' হইয়া আবার ছেলে-শেখানয় মন দিলাম।

—

ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য †

(নক্সা।)

(প্রবাসী, আশ্বিন ১৩১৬)
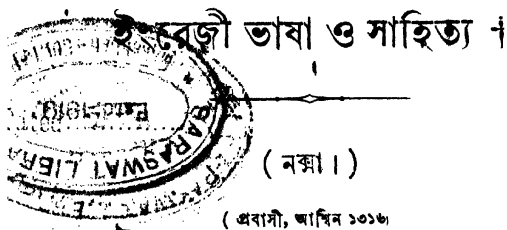
দার্শনিক-প্রবর ডিউগ্যাল্ড্ ষ্টুয়ার্ট্ প্রগাঢ় গবেষণাবলে স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পলাশীর যুদ্ধের পর Pax Britannicaর প্রসাদে যখন ভারতবর্ষ অক্ষুণ্ণ শান্তিরসে অভিষিক্ত, সেই সময় জন কতক নিষ্কর্ম্মা ব্রাহ্মণে মিলিয়া সংস্কৃতভাষার সৃষ্টি করিয়াছে! এমনতর একটা 'দুর্ব্বোধ্য ভাষার আবির্ভাবের মূলে কোনও কূট রাজনীতিক উদ্দেশ্য ছিল' এরূপ অনুমানও বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। পক্ষান্তরে, ইংরেজীভাষা সংস্কৃতভাষার ন্যায় অর্ব্বাচীন বা 'ভুঁইফোঁড়' ভাষা নহে; ইহা সুপ্রাচীন; ভুক্তভোগীরা বলেন ইহার আদি-অন্ত পাওয়া যায় না। অপিচ এই ভাষা সজীব, যাহাকে ইংরেজীতে বলে living and kicking; ধড়ফড় করিয়া নড়ে, হিব্রু-গ্রীক্-ল্যাটিনের ন্যায় 'বাসিমড়া' নহে। অনেক অনুসন্ধানে এই ভাষার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারিয়াছি, নিবেদন করিতেছি। আপনারা অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন।

সকলেই জানেন, হৃদয়ের ভাবগোপনের জন্যই ভাষার উদ্ভব (Language was given to man to conceal his thoughts); সুতরাং বুঝা গেল, সত্যযুগের সরলপ্রকৃতি মানবের এরূপ প্রয়োজন না

† কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট্-হলে পঠিত।

থাকাতে ভাষার আদৌ সৃষ্টি হয় নাই। প্রয়োজনের অভাবে কার্য্যের উৎপত্তি হয় না, ইহা দর্শনশাস্ত্রের একটা মোটা কথা।

ত্রেতাযুগে কিষ্কিন্ধ্যায় ইহার সূত্রপাত। প্রমাণ, এখনও আনন্দে অধীর হইলে পূর্ব্বপুরুষদিগের 'হিপ্ হিপ্'='হুপ্ হুপ্' ধ্বনি আদিম-সংস্কারবশে স্বতঃই বাহির হইয়া পড়ে। ডারউইন্‌তত্ত্ব অনুশীলন করিলেই আপনারা এ রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। পরে অনেক মারামারি কাটাকাটির পর লঙ্কা জয় করিয়া যখন এই বীরজাতি 'সাতসমুদ্র তের নদী' পার হইয়া উত্তর-মেরুর সন্নিকটস্থ প্রদেশসমূহে ক্রমশঃ ছড়াইয়া পড়িল, তখন সেই তুষাররাশির মধ্যে এই ভাষা জমাট বাঁধিতে আরম্ভ করিল। কালে এই অস্থিরপ্রকৃতি 'ভবঘুরে' জাতি শ্বেতদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিল। তথাকার মাটি ও আবহাওয়ার গুণে ভাষাটা বেশ জোর ধরিয়া উঠিল। তবে প্রথম প্রথম ব্যাকরণের বিষম বাঁধাবাঁধি থাকাতে প্রতিভাশালী লেখকদিগের সমূহ অসুবিধা ঘটিতে লাগিল। তাঁহাদিগের অনেকেই গত্যন্তর না দেখিয়া ফরাসী বা ল্যাটিন ভাষার শরণাপন্ন হইলেন। অস্মদ্দেশেও স্বদেশের ও স্বজাতির ভাষা পরিহার করিয়া বিদেশীভাষার আশ্রয়গ্রহণ করা বিদ্যার্থিসমাজে ও বিদ্বৎসমাজে প্রচলিত রীতি। যাহা হউক, ব্যাকরণের বাঁধন শেষে অনেকটা আল্‌গা হইয়া পড়াতে ভাষার হু হু করিয়া উন্নতি হইয়াছে। সম্প্রতি বাঙ্গালাভাষায়ও এই শুভ লক্ষণ দেখা দিয়াছে; দেখিয়া হৃদয়ে আশার সঞ্চার হয় যে, অচিরেই আমাদের সাহিত্য 'উন্মাদিনী কেশরী'র ন্যায় 'বহুবলধারিণী' হইয়া 'পতপতনাদে' কীর্ত্তিবৈজয়ন্তী তুলিতে 'সক্ষম' হইবে!

দীনেশ বাবুর সদৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া প্রথমে ভাষার কথা বলিয়া এক্ষণে সাহিত্যসম্বন্ধে কিছু বলিব। পরিচয় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হইবে, অনেকটা 'এক নিশ্বাসে সাতকাণ্ড রামায়ণে'র মত।

ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস, আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই একটি অদ্ভুত রহস্য চোখে পড়ে। গ্রন্থকারদিগের প্রকৃত নাম অনেক সময়েই দুর্জ্ঞেয়। আমাদের 'ভুবনমোহিনী' ও 'টেকচাঁদ ঠাকুরে'র ন্যায় এলিয়ট্, পীটার্ পার্লি, প্রভৃতি (Pseudonym) ছদ্মনাম পাঠক-সমাজে সুবিদিত। স্পষ্টই বুঝা যায়, লেখকগণ বড় হুঁসিয়ার লোক ছিলেন, সমালোচকশ্রেণীর তীব্র কষাঘাতের আশঙ্কায় নাম ভাঁড়াইয়াছিলেন। সংস্কৃতসাহিত্যেও বেদপুরাণাদির রচয়িতৃগণ সম্ভবতঃ এই আশঙ্কায় সকল বোঝা বেদব্যাসের ঘাড়ে চাপাইয়া নিশ্চিন্তমনে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। আমরা সচরাচর ইংরেজ গ্রন্থকারদিগকে যে সকল পরিচিত নামে জানি, সেগুলি (১) গুণকর্ম্মবিভাগশঃ (২) ধর্ম্মানুসারে (৩) জাতব্যবসা হিসাবে ও (৪) বর্ণানুক্রমে অর্থাৎ রঙের খাতিরে দেওয়া হইয়াছে, স্থূলতঃ এইরূপ শ্রেণীবিভাগ করা চলে। বলা বাহুল্য, নিতান্ত নিকৃষ্ট লেখকদিগের নামই বর্ণানুক্রমে প্রদত্ত হইয়াছে। ক্রমশঃ উদাহরণ দিতেছি। যথা (১) গুণকর্ম্মবিভাগশঃ—

(‌/০) (Sterne) ষ্টার্ন্ অত্যন্ত পরুষস্বভাব ছিলেন, এইজন্য তাঁহার এইরূপ নামকরণ। তাঁহার প্রণীত পুস্তকের নামও কাঠখোট্টা রকমের ; যথা—Tristram Shandy, Sentimental Journey ইত্যাদি, (উভয়ত্রই টকারের টঙ্কার)।

(৵০) (Steele) ষ্টীল্ প্রথমজীবনে সৈনিকপুরুষ ছিলেন, সেই অবস্থায়ই প্রথম পুস্তক প্রণয়ন করেন, সুতরাং অসিজীবীর উপযোগী এই নাম গ্রহণ করেন।

(৶০) (Lamb) ল্যাম্ব্ নিরীহপ্রকৃতির জন্য এই অভিধা লাভ করেন। এই একই কারণে সমালোচকেরা তাঁহাকে Gentle ও Saint বিশেষণে বিভূষিত করেন।

(।•) কৃষাণকবি (Burns) বার্ন্‌স্ সারাজীবন প্রেমবহ্নিতে পুড়িয়াছিলেন, তাই তাঁহাকে পাঠকসমাজ আদর করিয়া Burns আখ্যা দিয়াছেন।

(।/•) (Keats) কীট্‌স্ বৈষ্ণব বিনয় দেখাইয়া নিজেকে 'কীট' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, অথচ আবার তলায় তলায় আত্মগরিমাও ছিল, তাই গৌরবে বহুবচন ব্যবহার করিয়াছেন।

(।৶•) (Marlowe) মার্লোর স্বাভাবিক মৃত্যু হয় নাই, আমাদের কালিদাসের মত কুস্থানে ইতর লোকের হাতে অপমৃত্যু ঘটে, তাই তাঁহার নাম মরলো নহে—মারলো।

(।৵•) (Gay) গে অত্যন্ত স্ফূর্ত্তিবাজ ছিলেন, তাই, সাধ করিয়া এই খেতাব লইয়াছিলেন। তাঁহার Beggar's Opera, Polly প্রভৃতি নাটকে খুব স্ফূর্ত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি জীবন সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন—

'Life is a jest, and all things show it;
I thought so once, and now I know it.'

(॥•) (Swift) সুইফ্‌ট্ ক্ষিপ্রগতির জন্য এই আখ্যা পাইয়াছিলেন। তিনি এক এক লম্ফে শ্বেতদ্বীপ হইতে মরকতদ্বীপে (Emerald Isle) এবং মকরতদ্বীপ হইতে শ্বেতদ্বীপে যাতায়াত করিতেন। রাজনীতিক্ষেত্রেও হুইগ্ দল হইতে টোরী দলে পৌঁছিতে তাঁহার বিলক্ষণ ক্ষিপ্রকারিতা ছিল। আবার তিনি প্লবঙ্গগতিতে ষ্টেলার প্রেমতরু হইতে ভ্যানেসার প্রেমতরুতে আরোহণ করিয়াছিলেন, ইহাও তাঁহার দ্রুতগমনশীলতার আর একটা নিদর্শন। ইনি সমস্ত জীবন দেশভ্রমণ করিয়া কাটাইয়াছিলেন এবং তদ্‌বৃত্তান্ত Gulliver's Travels নামক ভ্রমণ-কাহিনীতে বিবৃত করিয়াছেন। [illegible]ণ,

ভূপ্রদক্ষিণ, দক্ষিণাপথভ্রমণ, হিমাদ্রি, প্রভৃতির ন্যায় সুপাঠ্য ও প্রামাণিক গ্রন্থ। ইংরেজীভাষায় অন্যান্য ভ্রমণ-কাহিনীও আছে; যথা :—Robinson Crusoe, Peter Wilkins, Pilgrim's Progress (ইহারই অনুকরণে Travels of a Hindoo লিখিত), Traveller, Wanderer, Excursion, The Wandering Jew ইত্যাদি।

২। চিরকুমারব্রতধারী ক্যাথলিক সন্ন্যাসী ছিলেন বলিয়া একজন কবি (Pope) পোপ আখ্যা পাইয়াছিলেন। তাঁহার Rape of the Loch (প্রাচীন বাণান—আমরা প্রাচীনের পক্ষপাতী) একটা পুকুরচুরির মামলা উপলক্ষে লিখিত। শুনা যায়—তাঁহার লিপিকৌশলে বাদী প্রতিবাদী উভয়পক্ষই এরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, মোকদ্দমাটী আপোষে মিটিয়া যায়। হায় রে সেকাল! সম্প্রতি ইঁহার Essay on Criticism নামক পদ্যময় কাব্যের একখানি গদ্যব্যাখ্যা ও বিবৃতি বাহির হইয়াছে, লেখক বিখ্যাত কবি ও সমালোচক ম্যাথু আর্নল্ড্। ইনি বিশেষ গুণগ্রাহী লোক ছিলেন, সমকালীন কবিগণের গুণগান করিয়া Iliad, Aeneid এর অনুকরণে একখানি মহাকাব্য লিখিয়া যান, নাম Dunciad বা মূর্খায়ণ। রাজারাজড়ার স্তুতি না করিয়া নিঃস্ব কবিগণকে কাব্যের নায়কনির্ব্বাচন করা কি কম উচ্চমনের পরিচয়? অথচ তিনি ক্যাথলিক ছিলেন বলিয়া তাঁহার চরিত্রসম্বন্ধে নানারূপ কুৎসা ইংরেজসমাজে প্রচলিত। ধর্ম্মান্ধতা কি ভয়ঙ্কর পদার্থ!

৩। (Goldsmith) গোল্ড্স্মিথ=স্বর্ণকার। ইঁহার গ্রন্থাবলী ছাত্রসমাজে সুপরিচিত। Blacksmith=কর্ম্মকার, পুরানামটা পাওয়া যায় না, কিন্তু ব্ল্যাক্ এবং স্মিথ্ এইরূপ আলাহিদা পাওয়া যায়। যেমন ভট্টাচার্য্যের পুত্রদ্বয় পৈতৃক সম্পত্তি 'চুলচেরা' ভাগ করিতে গিয়া পৈতৃক উপাধিটি পর্য্যন্ত দ্বিখণ্ডিত করিয়া দখল করেন, জ্যেষ্ঠ পুত্র ভট্ট ও কনিষ্ঠ

পুত্র আচার্য্য উপাধি পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগদখল করিয়া আসিতেছেন, এ ক্ষেত্রেও দেখা যাইতেছে সেইরূপ ঘটিয়াছে, পাখোয়াজ কাটিয়া বাঁয়া তবলা হইয়াছে। ব্ল্যাক্ শাখায় উইলিয়াম্ ব্ল্যাক্ কয়েকখানি চলনসই আখ্যায়িকা ও পূর্ব্বোক্ত স্বর্ণকার-কবির একখানি জীবনচরিত লিখিয়াছেন। স্মিথ্ শাখায় এডাম্ স্মিথ্ ধনবিজ্ঞান-সম্বন্ধে, বার্নার্ড্ স্মিথ্, হেম্‌লিন্ স্মিথ্, চার্লস্ স্মিথ্ প্রভৃতি গণিতসম্বন্ধে পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। আমাদের দেশেও যেমন দেখা যায় ভট্টশাখা অপেক্ষা আচার্য্যশাখাই বিদ্যাবত্তার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, এখানেও সেইরূপ ব্ল্যাক্ শাখা অপেক্ষা স্মিথ্ শাখাই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। আর একটি কথা প্রণিধান করিবেন। সভ্যদেশে ইতর ভদ্র সকলের মধ্যেই বিদ্যার চর্চ্চা আছে, কিন্তু কামার কুমার হাজারও বিদ্বান্ হউক, উচ্চদরের কাব্যরচনা করিতে সমর্থ হয় না। এক্ষেত্রে ইহার প্রমাণও হাতে হাতে পাইলেন। আবার 'সভ্যজাতি মধ্যে যারা সভ্যতার খনি' সেই সভ্যশিরোমণি ফরাসীজাতির মধ্যে দেখা যায়, (Zola) জোলায় পর্য্যন্ত কাব্য লেখে। তবে তাহা অবশ্য জঘন্যরুচিতে লিখিত। বংশের ধারা যাইবে কোথা ?

৪। (/০) (White) হোয়াইট্—ইঁহার মনটা বড় শাদা ছিল, ইনি শাদাসিধে লোক, শাদাসিধে ধরণে পাখীদের কথা লিখিয়া একখানা কেতাব পূরাইয়াছেন। (৵০) (Browne) ব্রাউন নামধারী কয়েকজন লেখক ছিলেন, সম্ভবতঃ ইঁহারা ফিরিঙ্গী। (৶০) (Gray) গ্রে—বিদ্যাচর্চ্চার জন্য ইঁহার অল্পবয়সেই চুল পাকিয়াছিল—'বার্দ্ধক্যং জরসা বিনা।' ইনি সুকবি ছিলেন। বিশ্বনিন্দুক জন্‌সন্‌ও ইঁহার এলিজির ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। ইনি সর্ব্বদা বিজ্ঞানালোচনায় নিমগ্ন থাকিতেন! ইঁহার Anatomy অনেকে পড়িয়াছেন! (।০) (Green) গ্রীন্—ইনি নিরামিষাশী (vegetarian) ছিলেন, সেই জন্য মাংসাশী

ইংরেজজাতি বিদ্রূপ করিয়া তাঁহাকে এই আখ্যা প্রদান করিয়াছে। ইঁহার রচিত ইতিহাস একখানি অমূল্য গ্রন্থ।

(Black) ব্ল্যাক্ ও শ্রেণীর নাম নহে। কারণ বিলাতে কালো রং নাই।

আর কতকগুলি নাম পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট কোনও শ্রেণীতেই পড়ে না। যথা :—

(Scott) স্কট্ :—ইঁহার প্রকৃত নাম অজ্ঞাত। জীবদ্দশায় ইনি (The Great Unknown) বিরাট্ অপরিচিত বলিয়া পরিচিত ছিলেন। সুবিধার জন্য লোকে তাঁহার জন্মভূমির নামে তাঁহাকে ডাকে। মাদ্রী, গান্ধারী, কৈকেয়ী, মৈথিলী, বৈদেহী, বৈদর্ভী প্রভৃতি নামের ব্যুৎপত্তিও ত ঐরূপ।

আর একজন কবি বড় বিদ্রূপপ্রিয় ছিলেন। বিদ্রূপের লক্ষণই এই যে যো পাইলে নিজেকেও ছাড়িয়া কথা কহে না। তাই তিনি কঠোর ব্যঙ্গের সুরে নিজের নাম রাখিয়াছিলেন (Dry-den) ড্রাই-ডেন্= শুষ্ক-গর্ত্ত, অর্থাৎ আহারাভাবে তাঁহার শরীরস্থ উদরনামক বৃহৎ গহ্বর সঙ্কুচিত হইয়াছিল। তাঁহার সমকালীনগণ যে তাঁহার প্রতিভার আদর করিল না, ইহাতে এই অনুযোগের ভাবটা প্রবল; ভারতের কালিদাসের 'অন্নচিন্তা চমৎকারা কাতরে কবিতা কুতঃ' এই অনুযোগবাণীর অনুরূপ। ইনি 'পেটের দায়ে' 'চরমপন্থী' 'মধ্যমপন্থী' নরম গরম সকল দলেই মিশিয়াছিলেন। (আমাদের দেশেও এরূপ স্বনামধন্য পুরুষ নিতান্ত অল্প নহে।) কখনও কখনও উত্তমমধ্যমও পাইয়াছিলেন। ইঁহার ছদ্মনামের ন্যায় গ্রন্থগুলির নামও কটমট; Absalom and Achitophel, Albion and Albanius, Amboyna, Annus Mirabilis, Astraea Redux, Aurangzebe; এক A তেই যথেষ্ট পরিচয় পাইলেন।

শেষোক্ত গ্রন্থখানি বিখ্যাত মোগল বাদশাহের জীবনবৃত্তান্ত, নাটকাকারে গ্রথিত; প্রামাণিকতায় Rulers of India Series এর গ্রন্থখানি অপেক্ষা কোনও অংশে নিকৃষ্ট নহে! পাদটীকায় মেকলের প্রশংসাপত্র নকল করিয়া দিলাম। *

সুষেণের বংশধরদিগকে সহজেই চেনা যায়, যথা—(Addison) এডিসন্=আদিসেন †, (Johnson) জন্সন্=জনসেন, (Pattison) প্যাটিসন্=পত্তিসেন, (Thomson) টমসন্=তমঃসেন, (Harrison) হেরিসন্=হরিসেন, (Tennyson) টেনিসন্=তনুসেন, (Hudson) হড্‌সন্=হঠসেন, (Richardson) রিচার্ড্‌সন্=ঋচার্দ্দসেন। ইঁহারা বঙ্গের সেনরাজগণের—বিশেষতঃ বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেনের—আত্মীয় কি না তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান আবশ্যক। বংশপ্রবর্ত্তয়িতা সুষেণের কথা মনে করিয়া সকলকেই 'বাপকা বেটা' বলিতে ইচ্ছা হয়। (Emerson) এমার্‌সন্=অমরসূনু ইঁহাদের কেহ নহেন।

পূর্ব্বে আমাদের দেশের মত বিলাতেও 'কবির লড়াই' হইত।

---

* The poet's Mussulman Princes make love in the style of Amadis, preach about the death of Socrates, and embellish their discourse with allusions to the mythological stories of Ovid. The Bramhinical metempsychosis is represented as an article of the Mussulman creed and the Mussulman Sultanas burn themselves with their husbands after the Bramhinical fashion. (History, ch 18.)

† এই Addisonই মার্কিনমুলুকে নামটি ঈষৎ (Eddison) বদলাইয়া (সম্ভবতঃ উদ্ভাবিত যন্ত্রগুলি বেনামীতে রাখার জন্য) বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা সভ্যজগৎকে চমৎকৃত করিয়াছেন।

ইংরেজী-সাহিত্য আলোচনা করিলে তাহার কিছু কিছু প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়। যথা :—ক্যাম্বেলের Pleasures of Hope, রজার্সের Pleasures of Memory, একেন্‌সাইডের Pleasures of Imagination, ওয়ার্টনের Pleasures of Melancholy এই 'চার রকমের চার' সুখের কাহিনী। এস্‌ক্যামের School-master এর 'উতোর' শেন্‌ষ্টোনের Schoolmistress, রাসেলাসের 'উতোর' Dinarbas, আইভ্যানহোর 'উতোর' Rebecca & R । স্কট্ 'সেয়ানা' হইয়া, Lady of the Lake লিখিয়া নিজেই আবার তাহার 'উতোর' Lord of the Isles লিখিয়াছেন।

প্রবন্ধবিস্তৃতিভয়ে আর অধিক কথা তুলিব না। এখন কয়েকজন প্রধান প্রধান কবির স্থূল পরিচয় দিয়া বক্তব্য শেষ করিব।

(১) আদিকবি চষারের কাব্য আমাদের 'আদিকাব্য' ঋগ্বেদের ন্যায় চাষার গান (নামেই প্রকাশ); সেইজন্য বিখ্যাত সমালোচক এডিসন্ ইঁহার রচনাকে unpolished strain বলিয়া অবজ্ঞাপ্রকাশ করিয়াছেন।

(২) স্পেন্‌সার্ একাধারে কবি ও দার্শনিক ছিলেন। বড় বড় সমালোচকেরা বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার Fairy Queen ও Data of Ethics উভয়ই তুল্যমূল্য!

(৩) শেক্‌স্‌পীয়ার্ শ্রেষ্ঠ ইংরেজ কবি। Shake-spear নামে সপ্রমাণ হয় ইঁহাদের বংশে ক্ষত্রিয়াচার প্রতিপালিত হইত; তাই তিনি মধ্যযুগের (knight) নাইটদিগের প্রথানুযায়ী সত্যনাম গোপন করিয়া এইরূপ অভিধা গ্রহণ করেন। হোমারের ন্যায় ইঁহারও জীবন-কাহিনী রহস্যে জড়িত। এমন কি ইঁহার জন্ম-তারিখের পর্য্যন্ত ঠিক পাওয়া যায় না। সেই জন্য একজন ইংরেজ কবি সাঁটে সারিয়াছেন,

"He was not of an age but for all time"; আর আমাদের হেমচন্দ্রও বলিয়াছেন 'ভারতের কালিদাস, জগতের তুমি।' ইঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ (Hamlet.) হেম্‌লট্। নামেই বুঝিতেছেন, ইহা একটি পল্লীচিত্র! বাস্তবিক এরূপ উৎকৃষ্ট স্বভাববর্ণন জগতের সাহিত্যে দুর্লভ! Not a mouse stirring প্রভৃতি কবিতার আর নূতন করিয়া কি পরিচয় দিব? পূর্ব্বকথিত স্বর্ণকার-কবি Deserted Village নাম দিয়া এই পল্লীচিত্রের একটা (sequel) উপসংহার লিখিয়াছেন; বলা বাহুল্য সেকরার হাতে পড়িয়া শেক্‌স্‌পীয়ারের খাঁটি সোণা মাটি হইয়াছে। শেক্‌স্‌পীয়ার স্বদেশভক্তিপ্রণোদিত হইয়া ইংলণ্ডের একখানি ধারাবাহিক ইতিহাস নাটকাকারে লিখিয়া গিয়াছেন; ইহা যুদ্ধবিগ্রহের বিচিত্র বিবরণে পরিপূর্ণ। ইহাতেও স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, কবি যুদ্ধব্যবসায়ী ছিলেন। বিখ্যাত রণবীর মার্ল্‌বরো ও বিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ ফক্স্‌ ইহা পড়িয়াই স্বদেশের ইতিহাসে পণ্ডিত হয়েন। স্বদেশের ইতিহাস মাতৃভাষার ন্যায় অল্পায়াসেই আয়ত্ত হয় ইহা কৃতবিদ্য বাঙ্গালীমাত্রেই জানেন।

(৪) বেকন্ (Bacon) ব্রাহ্মণসন্তানের অস্পৃশ্য, তবে বিদেশীয় জাতিনাশা বিশ্ববিদ্যালয়ের দৌরাত্ম্যে কিঞ্চিৎ পরিমাণে পঠনপাঠন করিতে হইয়াছে। অনেক হিন্দু স্ত্রী যেমন নিষ্ঠাসত্ত্বেও ব্যক্তিবিশেষের খাতিরে নিষিদ্ধমাংস রন্ধন ও পরিবেষণ করিতে বাধ্য হইয়াও অতিকষ্টে জাতিরক্ষা করেন, আমার অবস্থাও তদ্বৎ।

(৫) মিল্‌টন্ আর একজন শ্রেষ্ঠ কবি। ইনি ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে স্বর্গের দেবতা ছিলেন, মর্ত্ত্যধামে আসিয়াও সে দেবচরিত্রের অণুমাত্র পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। ব্রহ্মার শাপে ইনি স্বর্গভ্রষ্ট হয়েন ও পৃথিবীর পাপদৃশ্য দেখিতে পারিবেন না বলিয়া জন্মান্ধ হইয়া জন্মান! শেষোক্ত

কারণে অঙ্গুলিপর্ব্বে গণনাশিক্ষা করেন নাই, সুতরাং তাঁহার মহাকাব্যে ছন্দের বড় একটা মিল পাওয়া যায় না! বিখ্যাত সমালোচক জন্‌সন্‌ রোগটা ধরিয়াছেন, কিন্তু নিদাননির্ণয় করিতে পারেন নাই। ল্যাটিন্‌-ভাষারও ইঁহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল এবং এই কঠিন ভাষায় Eikonoclastes, Areopagitica ও Samson Agonistes এই 'কাব্যত্রয়মনাকুলম্‌' রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন! স্বাধীনতাসমরে তাঁহার স্বর্গভ্রংশের ও জীবনান্তে স্বর্গলাভের বৃত্তান্ত তিনি স্বরচিত দুইখানি মহাকাব্যে লিখিয়া গিয়াছেন!

(৬) (৭) পরবর্ত্তী কবি, ড্রাইডেন্‌ ও পোপের কথা প্রবন্ধের পূর্ব্বাংশে বিবৃত হইয়াছে।

(৮) কূপার্‌ (Cowper) পরিণতবয়সে কবিতারোগগ্রস্ত হয়েন। 'বুড়ো বয়সে ধেড়ে রোগে' ধরিলে যাহা ঘটে, ইঁহার বেলায়ও তাহাই ঘটিয়াছিল। ইঁহার কবিতার খরস্রোতে খাটিয়া ত ভাসিয়া গিয়াছেই (I sing the Sofa), কুকুর, বিড়াল, খরগোস, টেঁয়া * প্রভৃতি পশুপক্ষী পর্য্যন্ত ভাসিয়া গিয়াছে, ভাগ্যে ঐরাবত সে তোড়ের মুখে পড়ে নাই। তাঁহার (John Gilpin) 'জান্‌ গিল্‌পিন্‌' হাসির কবিতা; নামটা 'জান খিল্‌খিল্‌' হইলে আরও ঘোরালো হইত। 'Pairing-time anticipated' আদিরসাশ্রিত কবিতা, বাল্যবিবাহের দেশে ইহার বহুলপ্রচার বাঞ্ছনীয়। (On the Receipt of my Mother's Picture) 'জননীর চিত্রদর্শনে' কবিতার, শৈশবে মাতৃহীন আমি, আর কি বলিয়া পরিচয় দিব? আমার অদৃষ্টে চিত্রদর্শন পর্য্যন্ত ঘটে নাই।

* The Dog and the Water-lily, The Retired Cat, Epitaph on a Hare, The Faithful Bird, &c.

কবির কথায় মাতৃদেবীর উদ্দেশে বলিতে ইচ্ছা করে—'ত্বৎসাদৃশ্য-বিনোদমাত্রমপি মে দৈবং নহি ক্ষাম্যতি।'

(৯) বায়রন্ একজন গুণধর পুরুষ ছিলেন। উচ্ছৃঙ্খলপ্রকৃতি হইলেও তিনি আমাদের নবীনচন্দ্রের ন্যায় গৌরাঙ্গভক্ত ছিলেন এবং গৌরাঙ্গলীলাত্মক একখানি কাব্যও লিখিয়া গিয়াছেন। উচ্চারণবৈষম্যে উহা (Giaour) 'জৌর' নামে পরিচিত। ইনি বাল্যেই তীর্থযাত্রা করেন ও তীর্থক্ষেত্রেই তনুত্যাগ করেন! এই তীর্থদর্শনের বিস্তৃত ইতিহাস Childe Harold's Pilgrimageএ নিবদ্ধ আছে! ইনি যে শেক্‌স্‌পীয়ারের ন্যায় রণপণ্ডিত ছিলেন তাহা ত ইঁহার 'বায়-রণ' নামেই বুঝা যাইতেছে। ইনি স্কটের ন্যায় ঐতিহাসিকও ছিলেন এবং Don Juan নাম দিয়া স্পেন দেশের একখানি সামাজিক ইতিহাস লিখিয়া যান! ইহা অতি প্রামাণিক গ্রন্থ। বিশেষজ্ঞের মুখে শুনিয়াছি, Mr. Ameer Ali প্রণীত 'History of the Saracens ইহার নিকট অনেক অংশে ঋণী! পরীর উপন্যাস লিখিতেও বায়রন্ সিদ্ধহস্ত ছিলেন, (Parisina) 'পরীশিনা' তাহার পরিচয়! মার্কিন কবি হোম্‌সের (Holmes) ন্যায় ইনি চিকিৎসাবিদ্যায়ও বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং দুই প্রকারের ফুস্কুড়ি (The two Foscari) সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন! হোম্‌সের Puerperal Fever-তত্ত্ব অপেক্ষা ইহা কোনও অংশে ন্যূন নহে। 'গেঁয়ো যুগী ভিখ্ পায় না', কাযেই বিলাতে বুলিয়া thesis লিখিয়া বায়রন্ প্রশংসা পান নাই। আমাদের দেশের লোক গুণগ্রাহী; এখানে কেহ এরূপ গুণপনা দেখাইলে অবাধে ডি এস্ সি উপাধি পাইতেন। পরম্পরায় শুনিয়াছি, ইনি ও ইঁহার পরম বন্ধু শেলী (Shelley) সর্ব্ববিষয়ে স্বাধীনতামন্ত্রের উপাসক ছিলেন বলিয়া বিলাত হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন।

(১০) (১১) (১২) ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ, শেলী, ব্রাউনিং বুঝিতে যখন স্বতন্ত্র সভা (Society) ডাকিতে হয়, তখন এ সভায় তাঁহাদের কথা না তুলিয়া দূরে পরিহার করাই শ্রেয়ঃ।

(১৩) (১৪) ব্রাউনিংদম্পতী কাব্যজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রবাদ আছে, একের কবিতা পড়িয়া অপরা তাঁহার অনুরাগিণী হয়েন ও গুরুজনের অনভিপ্রায়ে তাঁহার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েন। আমাদের দেশেও নাকি এইরূপ একটি ঘটনা ঘটিতে ঘটিতে ঘটে নাই। আমরা যে হতভাগ্য!

(১৫) (১৬) ডিক্‌ন্‌স্‌ ডিক্‌ন্‌সীও (Dickens, De Quincey) স্বামিস্ত্রীতে কাব্য লিখিতেন! উভয়ে কিন্তু তত সম্প্রীতি ছিল না! ডিক্‌ন্‌স্‌ নাকি শ্যালিকার একটু পক্ষপাতী ছিলেন। তা' এটা ত মানুষের স্বভাবসিদ্ধ। ডিক্‌ন্‌সী কিন্তু তাহা সহিলেন না। কুন্দের ন্যায় অভিমানিনী হইয়া, আফিঙ খাইলেন। কিন্তু প্রেমের রীতি এই যে 'যদি করি বিষপান তথাপি না যায় প্রাণ।' লাভের মধ্যে তিনি অল্পে অল্পে পাকা আফিংখোর (বিশুদ্ধ ব্যাকরণে আফিংখোরা) হইয়া পড়িলেন। এবং স্বামীর মুখে চূণকালি দিবার জন্য 'Confessions of an Opium-eater' লিখিয়া হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিলেন (যাকে ইংরেজীতে বলে washing one's dirty linen in public)। ডিক্‌ন্‌স্‌ আর ইংরেজ-সমাজে মুখ দেখাইতে পারেন না। কি করেন, বেগতিক দেখিয়া কিছুদিনের জন্য মার্কিন-মুল্লুকে গা-ঢাকা দিলেন।

ডিক্‌ন্‌সের 'Pickwick Papers', State Papersএর সামিল, ইহাতে অনেক গুহ্য রাজনীতিক তত্ত্ব সন্নিবেশিত আছে! খনিজবিদ্যায় ইঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল, David Copperfield পাঠে তাহা বিলক্ষণ বুঝা যায়! ইঁহার 'Tale of Two Cities' ফরাশী

রাষ্ট্র-বিপ্লবের, 'Hard Times' দুর্ভিক্ষের ও 'Dombey and Son' যৌথকারবারের জীবন্ত চিত্র।

(১৭) (Thackeray) থ্যাকারের জন্ম কলিকাতায়। তাঁহারা তিন পুরুষ ভারতবাসী ছিলেন। এখন থ্যাকারের (Thacker) দোকান তাঁহার জন্মস্থানের স্মৃতিরক্ষা করিতেছে! তাঁহার 'Vanity Fair'এ ভবের হাটের অনেক খবর পাওয়া যায়। তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট নভেল 'Esmond'; ইহা পাঠ করিলে এই সৎশিক্ষা লাভ করা যায় যে, 'হব-স্ত্রী' হাতছাড়া হইলে 'হইলে-হইতে-পারিতেন' শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণীকে অনুকল্পে বিধবাবিবাহ বা নিকা করা চলে। বলিহারি রুচি!

(১৮) 'ভীষ্ম দ্রোণ চ'লে গেলেন শল্য হলেন রথী'। আর শেক্‌স্‌পীয়ার্ মিল্‌টন্ বায়রন্ শেলী ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ টেনিসন্ চলিয়া গিয়াছেন, কিপ্লিং (Kipling) এখন কবি। তাঁহার কথাও কিছু বলা চাই। ইনি আমাদের ব্যাসদেবের ন্যায় (অবশ্য জন্মের কথা বলিতেছি না), ইঁহার মরণ নাই। আবার বাল্মীকির সঙ্গেও ইঁহার সৌসাদৃশ্য আছে; প্রথম জীবনে (উভয়েই) ভিন্ন পন্থাঃ অবলম্বন করেন ও পরে একদিন হঠাৎ কবি হইয়া পড়েন। সম্প্রতি আমাদের নবীনচন্দ্রের ন্যায় ইনিও আত্মজীবন লিখিয়াছেন, একখণ্ড পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে, আর একখণ্ড সদ্যঃপ্রসূত। পুস্তকের নামটি অদ্ভুত, Jungle-book বা অরণ্য-কাণ্ড। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের কথাও কিছু কিছু আছে। বলা বাহুল্য জর্জ্জ ইলিয়ট, পীটার পার্লি, টেকচাঁদ ঠাকুর ও ভুবনমোহিনীর ন্যায় কিপ্লিং কল্পিত নাম (সংস্কৃত কৢপ্ ধাতু হইতে নিপাতনে সিদ্ধ); প্রকৃত নাম Mowgli (সংস্কৃত 'মৌদ্গল্য' শব্দের অপভ্রংশ?) আত্মজীবনচরিতে পাইবেন।

উপসংহারে দুইজন প্রকৃত মহাপুরুষের নামকীর্ত্তন করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

একজন (Burke) বার্ক। এই অকৃত্রিম ভারতবন্ধুর নাম (আজকাল অবশ্য নিষ্কারণ ভারতবন্ধু = Friend of India ভারতে ও বিলাতে খুব সস্তা) যে ভারতবাসী ব্যঙ্গের সুরে লইতে পারে তাহার মত ঘোর কৃতঘ্ন আর কে আছে ? মনে রাখিবেন, তিনি ইংরেজ ছিলেন না, খাঁটি আইরিশ্‌ম্যান ছিলেন। ভুক্তভোগী না হইলে আর পরাধীন ভারতবাসীর মর্ম্মব্যথা কে বুঝিবে ?

আর একজন (Macaulay) মেকলে। মেকলে বাঙ্গালীকে বিশ্বাসঘাতক কাপুরুষ নরাধম প্রবঞ্চক মিথ্যাবাদী জালিয়াত জুয়াচোর বাটপাড় যাহাই কেন বলুন না, সকলই শিরোধার্য্য। তাঁহার অজেয় লেখনীর প্রসাদে আমরা পাশ্চাত্যবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া সভ্যজগতে আত্মপরিচয় দিতে সমর্থ হইয়াছি, আর তাঁহার যত্নরোপিত জ্ঞানবৃক্ষের স্বর্ণফল এই যে, বাঙ্গালী সিংহ আজ তাঁহারই গৌরবের পদ অধিকার করিয়াছে। * হায় ! এই খাঁটি ইংরেজের ন্যায় এখনকার কালে আর কেহ আমাদিগকে গালি দিয়া শিক্ষা দেয় না। 'Such chains as his were sure to bind.'

আসুন, আমরা এই দুই মহাপুরুষের পুণ্যস্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া বিদায় গ্রহণ করি।
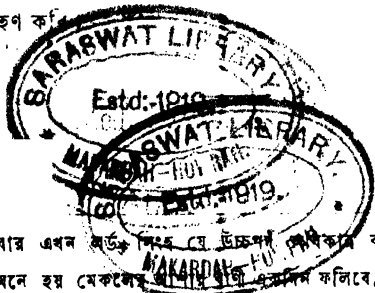
* আবার এখন লর্ড সিংহ যে উচ্চপদ অধিকার করিয়াছেন, তাহার কথা ভাবিলে, মনে হয় মেকলের আশার বাণী একদিন ফলিবে। 'এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন, আসিবে সে দিন আসিবে।'—(তৃতীয় সংস্করণের টিপ্পনী।)

ভাষাতত্ত্ব

(১) পঞ্চস্বর *
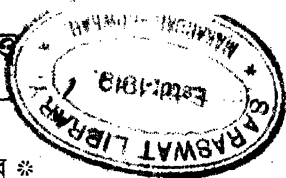
(বঙ্গদর্শন, কার্ত্তিক ১৩১৬)

রাজভাষায় দীক্ষালাভের নিত্যকর্ম্মপদ্ধতি Rowe's Hints এ পড়িয়াছি প্রবন্ধরচনা করিতে হইলে প্রথমে (definition) সূত্র ধরিয়া আরম্ভ করিতে হয়। এবং সূত্রপ্রান্তস্থ বঁড়শী দ্বারা মানসসরোবর হইতে ভাবশফরীগুলি ক্রমশঃ টানিয়া তুলিতে হয়। ভাল, সেই পথই ধরা যাউক। 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'। অদ্যকার প্রবন্ধের বিষয় 'ভাষাতত্ত্ব'। প্রথম দেখিতে হইবে 'ভাষা' কাহাকে বলে? যাহা ভাসে তাহাই 'ভাষা'। + মনটা একটা সমুদ্রবিশেষ, গভীর ভাবসলিলে কানায় কানায় ভরা; সেই ভাবসমুদ্রে জোয়ার লাগিলে যাহা ভাসিয়া বেড়ায় তাহাই 'ভাষা'। ফলতঃ ভাসা ভাসা জিনিস লইয়াই ভাষা; ভিতরকার গভীর-তত্ত্ব কখন মুখ ফুটিয়া ভাষায় প্রকাশ হয় না। ইহাই একটু ঘোরালো করিয়া সাহিত্যের ভাষায় বলিলে এইরূপ দাঁড়ায়—"ভাবসাগরের ফেনিল ঊর্ম্মিমালা—কবিতা; ও ভাবসরসীর ফুল্ল শতদল—কাব্য।" এই ত গেল ভাষার স্বরূপনির্ণয়।

তা'র পর 'তত্ত্ব'; যাহা 'তাহা' তাহাই সাধুভাষায় তত্ত্ব, অর্থাৎ সূত্র

* পূর্ণিমা-মিলন-উপলক্ষে পঠিত।

+ কুসংস্কারাচ্ছন্ন পাঠকগণ 'ষ' 'স' এর গোল হইয়াছে বলিয়া একটা কোলাহল তুলিবেন। বাস্তবিক বাঙ্গালা ভাষায় একটা বই 'স' নাই তাহা পরে বুঝাইব।

দাঁড়াইল এই :—that that that that is is তত্ত্ব। এখন দুইটি কথা এক করিয়া হইল 'ভাষাতত্ত্ব'। একপদীকরণং সমাসঃ।

'ভাষাতত্ত্ব' অনধিকারীর পক্ষে গীতাতত্ত্ব ও একাদশীতত্ত্বের ন্যায় শুষ্ক-নীরস, কেননা ইহাতে কণ্ঠ শুকাইয়া যায়, শরীর অবশ হয়, সীদন্তি সর্ব্বগাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি। কিন্তু অধিকারীর নিকট ইহা উদ্বাহ-তত্ত্বের ন্যায় সরস-রসাল পেলবকোমল, অথবা ভঙ্গান্তরে বলিতে গেলে, নবজামাতার বাটীতে প্রেরিত তত্ত্বের ন্যায় হৃদয়গ্রাহী।

ভাষা বাক্য লইয়া, বাক্য পদ লইয়া, পদ অক্ষর লইয়া। সুতরাং, ভাষাতত্ত্বে অক্ষরের স্থান বিজ্ঞানতত্ত্বে পরমাণুর ন্যায়। অতএব ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করিতে হইলে অক্ষর লইয়া আরম্ভ করিতে হয়। বৈয়াকরণ-সম্প্রদায়ের প্রথাও তাহাই।

'অক্ষর' কাহাকে বলে? যাহা নিত্য, যাহার ধ্বংস নাই, তাহাই অক্ষর —তা সে শ্রীরামপুরের কাঠে গড়াই হউক আর সীসায় ঢালাই হউক; কেননা শব্দ নিত্য, শব্দই ব্রহ্ম। এ কথা খোলসা করিয়া বুঝাইতে হইলে মীমাংসাদর্শন সম্বন্ধে লেক্‌চার্ দিতে হয়। সে ভার জরন্মীমাংসক-গণের মস্তকে চাপাইয়া আমরা অন্যান্য তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করি।

বাঙ্গালাভাষায় অক্ষরসংখ্যা লইয়া অনেকদিন হইতে গোলযোগ চলিতেছে। মীমাংসা সুদূরবর্ত্তিনী। তবে আমি যেমন বুঝিয়াছি তাহাই নিবেদন করিতেছি। সিদ্ধান্তের ভার আপনাদের উপরে।

প্রথম 'স্বর' ধরুন। কেহ বারো কেহ বা তেরো কেহ বা চৌদ্দর পক্ষপাতী। (ভয় নাই, আপনারা সম্মতিসঙ্কটে পড়িবেন না।) চান্দ্রমতে অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ; সৌর মতে ৠ ৡ মলমাস হিসাবে পরিত্যক্ত! কেহ কেহ তন্ত্রশাস্ত্রের ও ভারতচন্দ্রের দোহাই দিয়া ঐ ষর দুটিকে বজায় রাখিতে চাহেন। কি লজ্জা!

তন্ত্রশাস্ত্রে ভৈরবীচক্রের কথা আছে, ভারতচন্দ্রে বিদ্যাসুন্দরের কথা আছে। সুতরাং উভয়ই ঘোর অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ; কাযেই এই কারণেই ত ৠ ৡ ভদ্রসমাজ হইতে বিতাড়িত হওয়া উচিত। বাকী দ্বাদশটির দাবী-দাওয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া ইউক্লিডের জ্যামিতির প্রণালীতে খারিজ-দাখিল করিব।

দীর্ঘ ৠ দীর্ঘ ৡ গেল। হ্রস্ব ঋ হ্রস্ব ঌও যাওয়াই ভাল। দেখুন ও দুটার কদাকার চেহারার উপর আমার ছেলেবেলা হইতে রাগ আছে। দেখিলেই গা রি রি করে (তানপুরা সাধিতেছি না); যখন উহাদের কায 'রি লি' দ্বারা অনায়াসে চলে, তখন ও দুটাকে শুধু শুধু ভাত-কাপড় দিয়া পোষা কেন? ঝী বামুন দ্বারা যখন সংসার বেশ চলে, খামকা মাকে ঠাকুরমাকে পোষা কেন? এ সব মান্ধাতার আমলের কিম্ভূতকিমাকার অদ্ভুতকায় জীব mammoth, mastodon, megatherium হালের পৃথিবী হইতে লোপ পাওয়াই ভাল। যাক্ ও দুটা খসল; 'কৈ হইল কুড়ি' 'কৈ হইল কুড়ি' ইত্যাদি ছড়া মনে পড়ে ত?

তা'র পর হ্রস্ব-দীর্ঘর পালা। এক দিন ব্রাহ্মণীর সঙ্গে ঐ লইয়া তর্ক উঠিয়াছিল। তাঁহার ফরমায়েশ হইল, সব সময়ে বারো হাত কাপড়ে চলে না, গৃহস্থালীর কাযকর্ম্মের সময় এক যোড়া খাটো কাপড়ের প্রয়োজন। শুনিয়া বড় রাগ হইল। খাটো কাপড় পরিবে মা-ভগিনী, অর্দ্ধাঙ্গিনীর অঙ্গে কি তাহা শোভা পায়? গৃহিণীকে অনেক বুঝাইলাম, 'ছোট কখনও বড় হয় না, কিন্তু বড় কাপড় ত সময়বিশেষে খাটো করিয়া পরা যায়, তবে এ আব্দার কেন?' ইহাকেই বলে Law of parsimony! ব্রাহ্মণী বুঝিলেন কি-না বুঝিলাম না, কেননা তাঁহার বুদ্ধিটা নিউটনের * মতই সূক্ষ্ম। হ্রস্ব-দীর্ঘর বেলায়ও সেই কথা; এক প্রস্থতেই

* কথিত আছে, নিউটনের দুটী পোষা বিড়াল ছিল। তিনি তাহাদের

বেশ চলিয়া যায়, মিছামিছি আস্‌বাব বাড়ানর দরকার কি ? আর, এক কথা, হ্রস্ব দীর্ঘ যেন দুই প্রস্থ থাকিল, প্লুতের বেলায় কি করিবেন ? তখন কি আবার 'তেসরা নম্বর' হাজির করিবেন ? আপনারা, সকলেই নিরুত্তর। 'মৌনং সম্মতি-লক্ষণম্' ধরিয়া লইতে পারি। ফলতঃ অধিকাংশ লোকেরই যখন হ্রস্বদীর্ঘ-জ্ঞান নাই, তখন অনর্থক বহ্বাড়ম্বর কেন ? এ যে শিরোনাস্তি শিরোব্যথা।

ঐ=অই, ঔ=অউ ; তখন আর ও দুইটা ভিড় বাড়ায় কেন ?

ঐ যাঃ, করিয়াছি কি ? Rowe's Hints বহুকাল অভ্যাস নাই, বিষম ভুল করিয়া ফেলিয়াছি। প্রবন্ধ (essay) লিখিতে গেলে যে বিষয়টির পৌর্ব্বাপর্য্য রক্ষা করিয়া চলিতে হয়, সে কথা সাফ ভুলিয়া গিয়াছি। এখানে একটা ওখানে একটা অক্ষর ধরিতেছি, আর ছারপোকার মত টিপিয়া মারিতেছি। (method) শৃঙ্খলার ব্যতিক্রমের জন্য নম্বর কাটা যাইবে। যাক্, Better late than never, এখন সাম্‌লাইয়া লই।

স্বরবর্ণের প্রথম অক্ষর 'অ' ; ইহার উচ্চারণ লইয়া বিষম গোল, ইহাকেই বলে বিস্‌মোল্লায় গলদ বা সাধুভাষায়, স্বস্তিবাচনে প্রমাদ। ইহার প্রকৃত উচ্চারণ নাকি ' বাংলার মাটি বাংলার জল' সহে না, তাই পশ্চিম অঞ্চলে আশ্রয় লইয়াছে। এ দেশে সাধারণতঃ ইহার তিনটি উচ্চারণ শুনা যায়।

(১) প্রথমটি অনুচ্চারিত, তথাপি তাহাকেও উচ্চারণ বলিতে

বসবাসের জন্য একটি কাঠের বাক্স করিয়া দিয়াছিলেন এবং বড় বিড়ালটীর প্রবেশের জন্য একটি বড় ছিদ্র ও ছোটটির জন্য একটি ছোট ছিদ্র করিয়া দিয়াছিলেন। ছোটটিও যে বড় ছিদ্র দিয়া যাতায়াত করিতে পারে, এ বুদ্ধি তাঁহার ঘটে আসে নাই। ইতি পৌরাণিকী কথা।

হইবে, কেননা বৈশেষিকমতে অভাবও একটা পদার্থ। উদাহরণ, সকল-বর্ণের অভাব যে কৃষ্ণ (প্রমাণ যথা—মুচি হয়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে!) তাহাকেও কৃষ্ণবর্ণ বলি। সেই রকম, ছল, বল, কল, কৌশল, এই সকল স্থল (শেষের অ)।

(২) দ্বিতীয় উচ্চারণ বিকৃত কিন্তু অত্যন্ত প্রচলিত। (বাজারের সব মালই আজকাল যে ভেজালমিশান!) এই উচ্চারণ ওকারের সহিত অভিন্ন। যথা নরম, গরম, হজম, রকম, শরৎ, ভুবন, কাগজ, কলম (মাঝের অ)। 'অ'-এর এই উচ্চারণ বর্ত্তমান থাকাতে ওকারের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের প্রয়োজন দেখি না। যখন উভয়ে ভাগবাটওয়ারা করিয়া কায করিবে না, তখন জ্যেষ্ঠাধিকারই বলবান্ থাকুক্। 'ও'র জবাব হইল।

(৩) তৃতীয় উচ্চারণ স্বাভাবিক, কিন্তু রাঢ়ীয় কুলীনের ন্যায় ইঁহাকে স্বভাবে পাওয়া দায়। যথা, দশা, কলা, গলা, চলা।

এখানে বলিয়া রাখি, অ ও য় অভিন্ন, আ ও য়া অভিন্ন। করিয়াছে, চলিয়াছে, প্রভৃতি পদ করিআছে চলিআছে হইবে। ইংরেজীর নজীর রহিয়াছে, are doing, are going; ইংরেজীর নজীর অকাট্য। যদি বলেন, ইংরেজীর নজীর মিলিল না, ইংরেজী ধাতুরূপটা progressive আর আমাদেরটা present perfect। সে ত হইবেই, উহারা যে progressive race; আর আমাদের সব অতীত, তবে আজও ফলভোগ করিতেছি, ইহাই present perfect এর লক্ষণ! কেহ কেহ তর্ক তুলিতে পারেন, করি+আছে হইলে সন্ধি হইয়া কর্য্যাছে হইত, কিন্তু মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতেরা বলিয়া গিয়াছেন—খাঁটি বাঙ্গালায় সন্ধি নাই; (আমরা যে সকলেই এক এক মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ!) থাকিলে 'মই' মে হইত, 'সই' সে হইত, 'রাই' রে হইত, 'ধাই' ধে হইত, ইংরেজী হাই-কোর্টও বাঙ্গালায় হে-কোর্টে পরিণত হইত!

['অ' নিজে গোলমেলে লোক বলিয়া অপরের খেলায়ও বিঘ্ন ঘটায়, যেন ভাঙ্গা মঙ্গলচণ্ডী। তাঁহার কৃপায় কায অকায হইয়া উঠে, বেলা অবেলা হইয়া পড়ে, কাল অকাল হইয়া যায়, কুষ্মাণ্ডও ধরে !]

এখন বাকী রহিল, আ, আ, ই, উ, এ। 'অ'র স্বত্ব সাব্যস্ত হইয়াছে, অতএব তাহার license renew করা হউক। বাকী কয়েকজনের পাট্টা বা চিঠার অনুসন্ধান করা যাউক। এবার ব্যতিরেক-মুখে প্রমাণ দিব (ইউক্লিডের জ্যামিতি, প্রথম পরিচ্ছেদ, ষষ্ঠ প্রতিজ্ঞা)।

মুখবন্ধে বলিয়া রাখি, আকার সকল পদার্থেরই আছে, নিরাকারেরও আকার আছে—বাণানে ধরা পড়ে। অতএব 'আকার' ছাড়া যায় না।

সিম্‌সন্ ও প্লেফেয়ারের প্রমাণ—'আকার' না থাকিলে ঘট ঘাট চেনা যাইবে না, নগরী নাগরী চেনা যাইবে না, ধোপার পাট ও চিত্রকরের পটে প্রভেদ থাকিবে না, গালগলা গলগল করিবে, পাপীতে puppy জ্ঞান হইবে (যথা বৈদান্তিকমতে রজ্জুতে সর্পজ্ঞান), বাবা Bob হইবেন (বড় বাকী নাই)।

'আ' না থাকিলে মধুমাখা 'মা' বুলি আর শুনিতে পাইব না, 'বাবা' 'দাদা', 'কাকা', 'জ্যাঠা', 'মামা', 'শালা' প্রভৃতি প্রীতিকর সম্পর্ক উঠিয়া যাইবে। অতএব 'আ'র স্বত্ব বাহাল রহিল।

এবার 'ই'। ইকার না থাকিলে শিশু হি হি করিয়া না হাসিয়া প্রৌঢ়ের ন্যায় হা হা করিয়া বা সবার ন্যায় হো হো করিয়া হাসিবে, কিশোরী খিল খিল করিয়া না হাসিয়া পৈত্রীর ন্যায় খলখল করিয়া হাসিবে, প্রেমিক-প্রেমিকা ফিস্ ফিস্ করিয়া পীরিতির কাহিনী কহিবে না, বীণা-বিনিন্দিত রমণীবাণীর ধ্বনি শুনিতে পাইব না। আবার দেখুন, ইকার না থাকিলে ঘি ননী চিনি মিছরি রুটি লুচি কচুরি নিমকি শিঙ্গারা মিহিদানা মতিচুর মিঠাই সব চুলায় যাইবে, থাকিবে কেবল ডালভাত ;

ব্র্যাণ্ডি হুইস্কি শেরি শ্যাম্পিন সিদ্ধি আফিম জাহান্নমে যাইবে, থাকিবে কেবল তামাক আর গাঁজা ; বঙ্গবাসী সঞ্জীবনী হিতবাদী বসুমতী থাকিবে না, থাকিবে কেবল নায়ক ; বেঙ্গলি মিরার পত্রিকা পেট্রিয়ট ডেলিনিউস্ ইংলিশম্যান পাইয়োনিয়ার থাকিবে না, থাকিবে কেবল 'ভারতবন্ধু' ষ্টেট্স্ম্যান। শিক্ষাবিভাগের লোপ হইবে, শিক্ষক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্ত্তি করিবে না, বিচারালয়ে উকীল হাকিম জুরী সাক্ষী নথি আপীল ডিক্রী ডিস্মিস্ ছানির বিচার সব উঠিয়া যাইবে, ডাকবিভাগে পিয়ন চিঠিবিলি করিবে না, ইনসিওর রেজিষ্টারি হুণ্ডি টেলিগ্রাম মনিঅর্ডার কিছুই থাকিবে না, টিকিট বিক্রি হইবে না, বেয়ারিং চিঠিও চলিবে না। আরও অনেক বিভ্রাট্ ঘটিবে। হাকিম থাকিবে না হুকুম থাকিবে, তামিল থাকিবে না তেলুগু থাকিবে, তহবিল থাকিবে না তছরূপ থাকিবে।

অতএব ইকার বাহাল রহিল। তবে দীর্ঘটি ছাড়িতে হইবে, দেখিলেই ঈগল পাখী মনে পড়ে।

এবার উকারের পালা। উকার না থাকিলে শিশু উ উ করিয়া কাঁদিবে না, আর তাহার প্রসূতি ঘুম হইতে উঠিয়া মুখে চুমু দিবে না (কাহার ?) ; কচু কচ কচ করিবে, ফুল ফল হইবে, মধু মদে কলু কলে পরিণত হইবে (হচ্ছেও তাই), পুরুষ পরশ-পাথর হইয়া যাইবে, চুলোয় চলো হইয়া পড়িবে, ঘামাচি কুটকুট না করিয়া ফোড়ার মত কটকট করিবে, ভূমিতে দূর্ব্বা গজাইবে না, মরুতে উট চলিবে না।

অতএব উকারও বাহাল রহিল। তবে দীর্ঘটিকে 'সচিত্র বর্ণপরিচয়ে' ফাঁসিকাঠে লটকান হইয়াছে, আমরা সেই হুকুম মকুব করিতে পারিব না।

এবার একারের পালা। একার না থাকিলে যে সে লোকের সঙ্গে কথা বলা চলিবে না। কে রে হে বলিয়া ডাকা চলিবে না।

'এ'র আর এক উচ্চারণ অ্যা ; কেমন লাগ্‌লে, কেন ভাল লাগ্‌ল, জিজ্ঞাসা করিতে পাইব না। অতএব 'এ' কেও বাহাল রাখা গেল।

এখন বাদ-সাদ দিয়া পঞ্চস্বর দাঁড়াইল—অ, আ, ই, উ, এ।

বাঙ্গালা ভাষায় পাঁচটীর বেশী স্বর হওয়া উচিত নহে। যেহেতু ইংরেজী ভাষায় ইহার বেশী নাই। যাহা ইংরেজী তাহাই ভাল এবং তাহাই আমাদের গ্রহণ করা উচিত। একথা যদি কেহ অস্বীকার করেন, তবে মুক্তকণ্ঠে বলিব তিনি রাজদ্রোহী। আর এক কথা। চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই জানেন, হিন্দুসমাজে তেত্রিশ কোটি দেবতার চাপে কেহ মাথা তুলিতে পারে না, ছত্রিশজাতির গোলমালে জাতীয় একতার পথে বিঘ্ন ঘটে। ইউরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে সব একাকার হইয়াছে এবং তাহারা একেশ্বরবাদী। সুতরাং তাহারা সভ্য ও সর্ব্ব-বিষয়ে উন্নতি করিয়াছে। অতএব সপ্রমাণ হইল যে, বর্ণমালায়ও অক্ষরসংখ্যা যত কমিবে, ততই জাতীয় উন্নতির পথ প্রসারিত হইবে। ইউরোপীয় বর্ণমালার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই ইহা আপনারা প্রণিধান করিতে পারিবেন।

আর যদি এই স্বদেশীর দিনে বৈদেশিক অনুকরণ করিতে ইতস্ততঃ করেন এবং হিন্দুশাস্ত্রের দোহাই দেন তবে সেখানেও দেখুন—

পাঁচের মাহাত্ম্য অপরিসীম। পঞ্চপল্লব পঞ্চপ্রদীপ পঞ্চপাত্র পঞ্চো-পচার পঞ্চনীরাজন পঞ্চবর্ণের গুঁড়ি আমাদের পূজার অঙ্গ, পঞ্চগব্যে ও সময়-বিশেষে পঞ্চামৃতে শুদ্ধিলাভ হয়, 'গণেশাদি-পঞ্চদেবতাভ্যো নমঃ' বলিয়া ক্রিয়াকাণ্ড আরম্ভ করিতে হয়, পঞ্চযজ্ঞ হিন্দুর নিত্য অনুষ্ঠেয়, পঞ্চাগ্নি-পরিবেষ্টিত পঞ্চতপাঃ হওয়া কঠোর তপস্যা, পঞ্চানন বা পাঁচুঠাকুর জাগ্রৎ দেবতা, পঞ্চপিতা পরমপূজ্য, পঞ্চগোত্রের পঞ্চব্রাহ্মণ ও পঞ্চকায়স্থ বহু উচ্চবংশীয় বাঙ্গালীর পূর্ব্বপুরুষ, তীর্থশ্রেষ্ঠ কাশীধামে পঞ্চক্রোশী ও

পঞ্চগঙ্গা পবিত্র, রাসপঞ্চাধ্যায় বৈষ্ণবের চক্ষে ও পঞ্চ মকার শাক্তের চক্ষে পরমপবিত্র, পুরাণ পঞ্চলক্ষণ, পঞ্চতত্ত্ব আমাদের দর্শনের সার-সত্য, পঞ্চবটীবনে রামসীতা বাস করিয়াছিলেন, পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজাইয়া ধর্ম্ম-ক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধঘোষণা হইয়াছিল। কবিরাজীতে পঞ্চতিক্ত পঞ্চকষায় পঞ্চমূল পঞ্চকোল পঞ্চভদ্র মহাফলোপধায়ক, পঞ্চকোষ দেহে পঞ্চপ্রাণ বিরাজিত, পঞ্চেন্দ্রিয় ইহাতে প্রতিষ্ঠিত, পঞ্চভূতে এই দেহ নির্ম্মিত, পঞ্চাঙ্গুলি এই দেহের প্রান্তস্থিত, আর পঞ্চত্বপ্রাপ্তি এই দেহের শেষ পরিণতি। আরও দেখুন, পঞ্চনদ-প্রদেশ বীরত্বের জন্য বিখ্যাত, পঞ্চরত্ন মূল্যবান্, কথাচ্ছলে নীতিশিক্ষার গ্রন্থের মধ্যে পঞ্চতন্ত্র প্রধান, হাস্যরসে ইংরেজী Punch ও বাঙ্গালা পঞ্চানন্দ অদ্বিতীয়, সাহিত্যের আসরে পাঁচফুলের সাজি বরণীয়, সম্পাদকের মধ্যে পাঁচকড়ি বাবু অননু-করণীয়, তাস্লের মধ্যে পঞ্চমসোয়ারী জাঁকালো, মশলার মধ্যে পাঁচ ফোড়ং ঝাঁঝালো।

পরিশেষে আশা করি, আমার এই পঞ্চস্বর মদনের পঞ্চশরের ন্যায় শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে আমূল প্রোথিত হইবে। (পঞ্চমস্বর না হইলেও কোকিলের সঙ্গে লেখকের অন্যরূপ সাদৃশ্য আছে!)

(২) চতুর্দ্দশ ব্যঞ্জন *

(বঙ্গদর্শন, ফাল্গুন ১৩১৬)

এইবার ব্যঞ্জনের অগ্নিপরীক্ষা। এখানেও হাত খাটো করার প্রয়োজন। কী উপায়ে করা যায় তাহার আভাস দিতেছি।

প্রথম প্রস্তাব। কোন কোন অঞ্চলে আবহমান কাল হইতে বর্গের

---

* পূর্ণিমা-মিলন-উপলক্ষে পঠিত।

দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ এবং চন্দ্রবিন্দু বর্জ্জিত হইয়া রহিয়াছে, একটা 'র'তে দুইটার (র, ড়) কায চলিতেছে, অথচ সে অঞ্চলের লোকের জীবনযাত্রা স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইতেছে, এমন কি দুই এক জন হাইকোর্টের জজ পর্য্যন্ত হইয়াছেন, আরও দুই একজন হইবার ভরসা রাখেন। আমরা go-ahead বলিয়া গুমার করি, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের লোক বলিয়াই কি এ অংশে অন্য অঞ্চলের বাসিন্দাদিগের অপেক্ষা পশ্চাদ্‌বর্ত্তী থাকিব ?

দ্বিতীয় প্রস্তাব। চন্দ্রবিন্দু গেল, ং ঃ কেও বিসর্জ্জন দেওয়া উচিত। ং ঃ থাকিলে 'খাঁটি বাংলা'র সঙ্গে সংস্কৃতের প্রভেদ থাকিল কোথায় ? আপামরসাধারণ সকলেই জানেন যে, যেমন বাঙ্গালা কথার বিকৃত উচ্চারণ করিলেই ইংরেজী হয়, যথা দোর = door ভারী = very ইত্যাদি, সেইরূপ বাঙ্গালা কথায় ং ঃ দিলেই সংস্কৃত হইয়া যায়, যথা মন = মনঃ, কি = কিং ইত্যাদি ; এ অবস্থায় এ দুটি 'খাঁটি বাংলা'র অনুরাগিমাত্রেরই বিষনয়নে পড়া উচিত। আশ্চর্য্যের বিষয়, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 'খাঁটি বাংলা'র পক্ষপাতী হইয়াও অনুস্বারটিকে যেখানে সেখানে চালাইয়া 'খাঁটি বাংলা'কে সংস্কৃতের ভেজালে মাটি করিতে বসিয়াছেন। ইহাতে যে 'বাংলা' ভাষাটা অযথা সংস্কৃতানুগ হইয়া পড়িবে ইহা কি তাঁহার ন্যায় মনস্বী লোককেও বুঝাইতে হইবে ? সম্প্রতি একজন কট্‌কী পংডিতলোককে শংকুনির্ম্মাণে অনুস্বার চালাইতে প্রয়াসী দেখিয়াও ক্ষুণ্ণ হইয়াছি। 'অনুস্বারটি গেলে বাঙ্গালায় অনুনাসিকের অভাব হইবে,' কেহ কেহ এই আপত্তি তুলিতে পারেন ; কিন্তু তাঁহারা আশ্বস্ত হউন, যতদিন বাঙ্গালীর গৃহকোণে পত্নীর প্রভাব ও গৃহের কানাচে পেত্নীর প্রাদুর্ভাব থাকিবে, ততদিন অনুনাসিকের অভাব অনুভব করিতে হইবে না, ইহা সাহস করিয়া বলিতে পারি।

তৃতীয় প্রস্তাব। বর্গের পঞ্চমবর্ণগুলা সবই অনুনাসিক, একটা

রাখিলেই পাঁচটার কায বেশ চলিয়া যায়। অতএব আমার প্রস্তাব 'ম'কে বাহাল রাখিয়া বাকীগুলো খারিজ হউক। অন্যান্য পঞ্চমবর্ণ থাকিতে 'ম'কারের উপর এত টান কেন, এ কথা যদি কাহারও জিজ্ঞাস্য থাকে, তবে তাঁহাকে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে প্রবন্ধকারের শাক্তবংশে জন্ম।

চতুর্থ প্রস্তাব। এইবার সেই মামুলি ঝগড়াটা তুলিব। তিনটা স, দুইটা ন, দুইটা ব, দুইটা য, দুইটা র, এ সব বাহুল্য এই টানাটানির দিনে কেন? তবে নিতান্ত ঠেকিলে এক একটি রাখুন। স-এর মধ্যে দন্ত্য 'স' সর্ব্বথা রক্ষণীয়, কেননা ইহার অভাবে 'স্ত্রী' ও তদপেক্ষা প্রিয়তর 'সন্তান' হারাইতে হয় এবং মৎস্যমাংস ছাড়িয়া নিরামিষাশী হইতে হয়। আর দন্ত্য 'স' এর উপর আমার ন্যায় সদ্‌ব্রাহ্মণের অনুরাগ স্বাভাবিক, কেননা অমরকোষে লিখিতেছে—'দন্তবিপ্রাণ্ডজা দ্বিজাঃ' অস্যার্থঃ—দন্ত-ঘটিতব্যাপারে অর্থাৎ খাজা গজা প্রভৃতি চর্ব্ব্য বস্তুতে ব্রাহ্মণের মজা। 'শ' 'ষ' খারিজ করিলে কি লাভ-লোকসান হইবে তাহার একটা খতিয়ান দিতেছি, আপনারা নথিভুক্ত করিয়া রাখিবেন।

'শ' না থাকিলে—মাছের আঁষ থাকিবে না (স্ত্রীর পরিত্রাণ), আমের আঁশ থাকিবে না (নথিলিখিত না হইলেও সুসমাচার), শশ্রুর অভাবে লাঠি থাকিবে না, শ্লেষ্মলে কামড়াইবে না, শিকড় বাঁটিয়া কেহ ঔষধ করিয়া বশ করিতে পারিবে না, মরণে শঙ্কা থাকিবে না; তাল-শাঁসের উভয় দিক্‌ই দন্ত্য হইয়া যাইবে, কর্কশ মসৃণ হইবে, কপিশ পাংশুল মেটেরং ছিয়েরং হইবে, শ্বেতশুভ্র ধবল হইবে; আর অনেক দিন হইতেই ত শর্করা চিনিতে, শৃঙ্গী bugleএ, শাঁখা কাচের চুড়িতে ও শিকলি চেনে এবং কলিকাতা অঞ্চলে শালাশালী দাদাদিদিতে পরিণত হইয়াছে।

'ষ' না থাকিলে—শোষণ থাকিবে না শাসন থাকিবে, বিশেষ থাকিবে না সামান্য থাকিবে, শেষ থাকিবে না আরম্ভ থাকিবে (আমরা যে বাঙ্গালী), বিষয় থাকিবে না বক্তৃতা থাকিবে (যেমন এক্ষেত্রে), বৃষোৎসর্গ থাকিবে না তিলকাঞ্চন থাকিবে (অর্থাভাবে), আষাঢ় থাকিবে না মেঘদূত থাকিবে, আষাঢ়ে গল্প অসার গল্প হইবে, উষ্ণীষ থাকিবে না পাগড়ি থাকিবে, মেষ মহিষ মানুষ কেহই থাকিবে না সব গরু গাধা গাড়োল হইবে ('বাংলার মাটী, বাংলার জলে'র গুণে), কৃষ্ণ বিষ্ণু থাকিবেন না গৌরাঙ্গ থাকিবেন (কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতি-রন্যথা), ষণ্ডা সাধু হইবে, বিষ অমৃত হইবে, তুষ চাউল হইবে, ঈর্ষ্যাদ্বেষ দয়ামায়া হইবে ; আর অনেক দিন হইতেই ত যষ্টি cane হইয়াছে, মাষষ্ঠী লেডি ডাক্তার হইয়াছেন, ষাট পঞ্চাশ হইয়াছে, অষ্টপ্রহর চব্বিশ ঘণ্টা হইয়াছে।

'ণ'কার গঙ্গার ওপার হইতে উচ্চারণ করিলে ঙকারের মত শুনায়, বড় নোংরা জিনিশ ; ইংরেজী Knockerএর ন্যায় কর্ণজ্বালা উৎপাদন করে। অতএব ইহার উৎপাটনই শ্রেয়ঃ। তবে দন্ত্য 'ন' উঠাইয়া দিলে নিষেধের পাট উঠিয়া যাইবে, এই চা'ল আক্রার দিনে ভিক্ষুককে ফিরাইতে পারিব না, ইহা একটা বিবেচ্য বিষয়। বোধ হয় দন্ত্য 'ন' না ফেলিয়া রাখাই উচিত। 'জ' 'ব' এর যেটা—রাখুন। 'র' এর কঠোর উচ্চারণ 'ড়' ; এই কঠোরতার ফলে নরা মড়া হয়, পার পাড় হয়। দেশের এ অবস্থায় কঠোরতা ত্যাগ করিয়া মৃদুতা অবলম্বন করাই সুবুদ্ধির কায। পূর্ব্ববঙ্গের নজিরও রহিয়াছে। 'য়' ও 'অ'তে প্রভেদ নাই, স্বরপ্রকরণে বুঝাইয়াছি ; অতএব 'য়'র বহিষ্কারই শ্রেয়ঃ।

পঞ্চম প্রস্তাব। এইবার একটা সূক্ষ্মতত্ত্ব, রুচির কথা, সৌন্দর্য্য-বোধের কথা, æsthetic sense এর কথা পাড়িব। টবর্গটা অসভ্য

বর্ব্বর, অনার্য্য দ্রাবিড়ী জিনিশ, 'আর্য্য' বাঙ্গালীর ভাষায় থাকা অন্যায়। দেখুন, ইহা হাটেঘাটেবাটে গোঠেমাঠে পাওয়া যায়, নগরে সহরে ভদ্র-সমাজে ইহার স্থান নাই; ডোম ডোকলা চাঁড়াল হাড়ী শুঁড়ী প্রভৃতি অন্ত্যজবর্ণের মধ্যে দেখা যায়, ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ নবশাখ প্রভৃতি সৎ জাতির মধ্যে দেখা যায় না। বাস্তবিক টবর্গ তবর্গেরই কঠোর উচ্চারণ, সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে ইহার লোপ অবশ্যম্ভাবী। কর্ত্তন=কাটা, বর্ত্তুল হইতে বাঁটুল, তঙ্কা বা তন্থা হইতে টাকা, দণ্ড হইতে ডাণ্ডা, দাঁড়াও প্রাদেশিক উচ্চারণে ডাঁড়াও, দল্ ধাতু হইতে ডলা ও দ্বিদল শব্দ হইতে ডাইল, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়=ডি এল্ রায়; আর রবি বাবুর সাধের টা টো টে ইংরেজী 'the' এর অপভ্রংশ ও পরনিপাত নহে কি? আর এক কথা, যে জাতির মাথা নাই তাহার মূর্দ্ধন্য-বর্ণেরই বা প্রয়োজন কি? অতএব বর্গকে বর্গ বর্জ্জনই বিধি। ইহারও একটা লাভ-লোকসানের খতিয়ান পেশ করিলাম।

টবর্গ না থাকিলে—ঘাট থাকিবে না পুকুর থাকিবে, মাঠ থাকিবে না ময়দান থাকিবে, মঠ থাকিবে না মন্দির থাকিবে, খাট থাকিবে না পালং থাকিবে, পাট থাকিবে না ধনি থাকিবে, চট থাকিবে না কম্বল থাকিবে, কার্পেট থাকিবে না গালিচা থাকিবে, অট্টালিকাও থাকিবে না কুটিরও থাকিবে না সব বাক্স-প্রাসাদ হইয়া যাইবে, পট থাকিবে না ছবি থাকিবে, ঘট থাকিবে না নাগরী কলসী থাকিবে, হাঁড়ীকুঁড়ি ঘটীবাটী থাকিবে না তৈজসপত্র থাকিবে, কাপড়চোপড় থাকিবে না বসনভূষণ থাকিবে, রাবড়ী থাকিবে না মালাই থাকিবে, চণ্ডু থাকিবে না গুলি থাকিবে, চাট থাকিবে না মদ থাকিবে, মিঠেকড়া তামাক থাকিবে না ভ্যালসা থাকিবে, কপাট চৌকাঠ থাকিবে না দোরদরজা থাকিবে, ডালা থাকিবে না কুলা থাকিবে, ডোল থাকিবে না গোলা থাকিবে, ডোর

থাকিবে না কৌপীন থাকিবে, টব থাকিবে না বাল্‌তি গাম্‌লা থাকিবে, কণ্টক থাকিবে না কুসুম থাকিবে, টিক্‌টিকি থাকিবে না হাঁচি থাকিবে, এঁড়ে দাম্‌ড়া ষাঁড় হইবে পোকা থাকিবে, ঢাক ঢোল গণ্ডগোল হট্টগোল থাকিবে না গোলমাল থাকিবে (তবে চণ্ডীপাঠ চলিবে না), ঝাঁটা থাকিবে না কিন্তু জুতা ও গুতা দুইই থাকিবে, পৃষ্ঠ থাকিবে না কিন্তু জুতার দাগ থাকিবে, বিচারবিভ্রাট বিবাহবিভ্রাট থাকিবে না সমাজ-সংস্কার ও শাসন-সংস্কার হইবে, লুটপাট থাকিবে না চুরিচামারি থাকিবে, জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ ছোট বড় থাকিবে না সব এক সান্‌কির ইয়ার হইবে, ক্রিকেট ফুটবল কপাটি হাডুডুডু থাকিবে না তাস পাশা দাবা থাকিবে (বাঙ্গালীর জয়জয়কার), হেটকোট প্যাণ্ট শার্ট নেকটাই থাকিবে না ধুতী চাদর থাকিবে (স্বদেশীর জয়), সম্রাট্ বড়লাট ছোটলাট জঙ্গীলাট থাকিবে না বাঙ্গালী স্বরাজের স্বপ্ন দেখিবে, গ্যাড়্‌ম্যাড় বুলি থাকিবে না শতংজীব থাকিবে, ষ্টীমার গাধাবোট ফ্ল্যাট্ জেটি থাকিবে না জাহাজ থাকিবে, painter sculptor থাকিবে না চিত্রকর ভাস্কর থাকিবে; decanter দেশান্তর হইবে (এনি বেসাণ্ট আগে খেয়ায় আনী বাসন্তী হইয়াছেন, নতুবা বৈতরণীর খেয়াঘাটে গড়াগড়ি যাইতেন); টালি ইঁট কাঠ কড়ি থাকিবে না মার্ব্বেল পাথর ও লোহার বীম থাকিবে; টাকাকড়ি থাকিবে না গিনি মোহর কোম্পানীর কাগজ থাকিবে, টাকা ঠন্ ঠন্ করিবে না গিনি ঝন্ ঝন্ করিবে, কেঁউটেও থাকিবে না ঢোঁড়াও থাকিবে না সব হেলে হইয়া যাইবে (বাঙ্গালার দশাই তাই), জটিলা কুটিলা থাকিবে না ললিতা বিশাখা বৃন্দাদূতী থাকিবে, হিং টীং ছট্ থাকিবে না সত্যংজ্ঞান-মনন্তংব্রহ্ম থাকিবে, ট্রেন ট্র্যাম মোটর গাড়ী থাকিবে না aeroplane বেলুন বা ব্যোমযান থাকিবে, ঠেলাগাড়ি টানা-গাড়ি ট্রলি থাকিবে না পুস্‌পুস্ রিক্স থাকিবে, telegraph telephone

থাকিবে না marconigraphy থাকিবে; চটাপট্ বৃষ্টি পড়িবে না ঝুপ ঝুপ করিয়া জল হইবে, ফোটাফোটা বৃষ্টি পড়িবে না ঝুর ঝুর করিয়া জল হইবে।

ওষ্ঠ অধর হইবে, হস্ত হস্ত হইবে, মিষ্ট মধুর হইবে, শিষ্ট শান্ত হইবে, টক অম্বল হইবে, মিট্‌মাট্ ও ডিস্‌মিস্ রফা হইবে, ঠাট্টা বিদ্রূপ হইবে, পাড়া পল্লী হইবে, সাড়া সংজ্ঞা হইবে, হাড়্‌চামড়া অস্থিত্বক্ হইবে, পিঁপড়া পিপীলিকা হইবে, ঝড়ঝাপ্‌টা ঝঞ্ঝাবাত হইবে, ঠাণ্ডা শীতল হইবে, ডিঙ্গী নৌকা হইবে, বাটওয়ারা বিভাগ হইবে, ঠিকঠাক স্থিরনিশ্চয় হইবে, উঠাপড়া উত্থানপতন হইবে, খাটুনি পরিশ্রম হইবে, ঠাকুর দেবতা বা ব্রাহ্মণ হইবে (সাধুভাষার জয়জয়কার), জড় চেতন হইবে (জগদীশের প্রভাবে সকলই সম্ভব)। বেড়ান ভ্রমণ হইবে, বেড়া বৃতি হইবে, ডাল শাখা হইবে, ডা'ল ঝোল বা যূষ হইবে (অম্লরোগের দৌরাত্ম্যে), টঙ্কার ঝঙ্কার হইবে (বাংলার মাটীর গুণে), খ্রীষ্ট কৃষ্ণ বিষ্ণু ইঁহারা নারায়ণ নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র হইবেন, পূজার দালানে চণ্ডিকা অম্বিকা হইবেন, ঘরের উগ্রচণ্ডা রামরম্ভা হইবেন, বটতলা নিমতলা হইবে (কাছাকাছি ত বটে), ডিম ফুটিয়া ছানা হইবে, পাঠ সাঙ্গ হইবে, পীড়া আরোগ্য হইবে, কোষ্ঠ খোলসা হইবে, ইঁচড় কাঁঠাল সব পাকিয়া যাইবে, বেড়ি ভাঙ্গিবে (মাইকেলের হুকুমে), কপট লম্পট শঠ সব সাধু স্বামী সন্ন্যাসী হইবে, হাড়ী শুঁড়ী চণ্ডাল ডোম ডোকলা সব বামুন নিতান্তপক্ষে বৈশ্য হইবে, ছুঁড়ী বুড়ী সব যুবতী হইবে, টুকটুকে ফুট্‌ফুটে মেয়ে পাঁচপাঁচি হইবে, ছড়ী ঘড়ী বুড়ী গাড়ী অর্থাভাবে উঠিয়া যাইবে, blister, poultice, fomentation, ointment, liniment হোমিওপ্যাথির কল্যাণে পাততাড়ি গুটাইবে, vote, ballot উঠিয়া nomination হইবে, ভেট ডালি উপঢৌকন সার্কুলারে নিষিদ্ধ হইবে; ঘুড়ি-উড়ান আইন

করিয়া বন্ধ হইবে, লাঠিসোটা হুড়কোঠেঙ্গা ইঁটপাটকেল সব পুলিশ-আইনে উঠিয়া যাইবে, জোটপাট করিয়া চোটপাট করা বা ছুটছাট বলা ইংরেজের আমলে চলিবে না, পিঁড়েয় বসিয়া পেঁড়োর খবর দেওয়া ঘটিবে না, ছেলেরা আড়ি করিবে না, মেয়েরা আড়ি পাতিবে না, আড়ি-আড়ি ধান হইবে না (দেশে যে ঘোর অজন্মা), আড়মাছ ভদ্রলোকে খাইবে না, ইতি ভবিষ্যপুরাণে ফলশ্রুতিঃ।

দেখুন স্রোতের টানও ঐদিকে। আটভাজার স্থলে বত্রিশ ভাজা চলিয়াছে, খোলাপ্রাণের অট্টহাস্য মুচকি হাসিতে দাঁড়াইয়াছে, চণ্ডীর গান জাতীয় সঙ্গীতে পরিণত হইয়াছে, ঠিকুজী-কোষ্ঠী horoscope হইয়াছে, চণ্ডীমণ্ডপ হলঘর হইয়াছে, থিয়েটার নাচঘর হইয়া পড়িয়াছে, acting বক্তৃতায় দাঁড়াইয়াছে, খেমটা polka হইয়াছে, concert party ঐকতানবাদন হইয়াছে (গন্ধমাদনের কাছাকাছি, শব্দমাদন ত বটে), Emerald Classic এ লোপ পাইয়াছে, কোন্ দিন বা Star Minervaতে লোপ পাইবে, গণ্ডার rhino হইয়াছে, মাটি কলিকাতায় ভূঁই হইয়াছে, খুড়া খুড়ী কাকা কাকী হইয়াছে, ঠাকুরদাদা ঠান্‌দিদি দাদামহাশয় দিদিমা হইয়াছেন, আড্ডা আখড়া Club association বা অনুশীলন-সমিতি হইয়াছে, হোটেল আশ্রম হইয়াছে, কাঠের পিঁড়ির স্থান গালিচার আসনে বা চেয়ারে অধিকার করিয়াছে, কড়া গণ্ডা বুড়ি—পাই পয়সা পেনী আনী হইয়াছে, টাকা শিলিং এ দাঁড়াইয়াছে (এক্স্‌চেঞ্জের কৃপায়), স্বদেশী চড়চাপড়-চাঁটি বিদেশী kick cuffএ পরিণত হইয়াছে, পাঁঠাকাটা ছাগল-জবাইএ দাঁড়াইয়াছে, কড়াই কেৎলি হইয়াছে, মশলা বাঁটা মশলা পেশায় পরিণত হইয়াছে, ধানভানা কলের কল্যাণে ঢেঁকির স্বর্গপ্রাপ্তি হইয়াছে, হাঁটার পাট carএর প্রসাদে উঠিয়া গিয়াছে, কাযেই কেহ হোঁচটও খায় না পায়ে কাঁটাও পড়ে না, টীকাটিপ্পনী ফুটনোট annota-

tion commentary উঠিয়া নূতন, রেগুলেশনে original research হইয়াছে! অলমতিবিস্তরেণ।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে, মুক্তি বাদ দিয়া ব্যঞ্জনগুলি এইরূপ দাঁড়াইল :—ক গ চ জ ত দ ন প ব ম র ল স হ, এই চৌদ্দটী। ব্যঞ্জনের বেলায় ইংরেজী অপেক্ষাও বর্ণসংখ্যা সংক্ষেপ হইল। "শিষ্যবিদ্যা গরীয়সী।" সমাজতত্ত্বে দেখি ছত্রিশবর্ণে বিভক্ত থাকাতে আমাদের জাতীয় উন্নতি ও একতার পথে বিঘ্ন হয়; ভাষাতত্ত্বেও দেখি বর্ণবাহুল্যে ভাষার উন্নতি ঘটে না, শিক্ষার প্রসার হয় না। আমার এই প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইলে আর কোনও আশঙ্কা থাকিবে না। কর্ত্তাদের আমলের ছত্রিশ ব্যঞ্জনের স্থানে আমি যে চৌদ্দটি খাড়া করিয়াছি তাহা এই অন্নকষ্টের দিনে মঙ্গলজনক নহে কি?

আরও দেখুন, চতুর্দ্দশ সংখ্যার মাহাত্ম্য বড় কম নহে। চৌদ্দভুবন দেখা অনেক সুকৃতির ফলে ঘটে, পক্ষান্তরে অনেক পাপের ফলে চৌদ্দপুরুষ নরকস্থ হয়, সাতপাকের বিয়ে চৌদ্দপাকে ফেরে না, চৌদ্দপোয়া হইয়া শয়ন বড় আরামের, ভূত-চতুর্দ্দশীতে চৌদ্দশাক ও চৌদ্দ প্রদীপের বিধি আছে, চৌদ্দ অক্ষর গণিয়া পদ্য লেখা হয়, আর বাঙ্গালামুল্লুকে চৌদ্দয় নারীর যৌবনসঞ্চার, তাই কবি উচ্ছ্বাস-ভরে গাহিয়াছেন, 'চতুর্দ্দশ বসন্তের একগাছি মালা।' ফরাসী ইতিহাসে চতুর্দ্দশ লুই প্রথিতযশাঃ, হিন্দুর শাস্ত্রে চতুর্দ্দশ মন্বন্তর ও চতুর্দ্দশ বিদ্যার খ্যাতি আছে, শ্রীরামচন্দ্রের চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস হইয়াছিল, ব্রতশ্রেষ্ঠ শিবরাত্রিব্রত, সাবিত্রীব্রত ও অনন্তব্রত চতুর্দ্দশীতে অনুষ্ঠিত ও চতুর্দ্দশ বর্ষে প্রতিষ্ঠিত হয়।—আর কখন কখন সভাগণের সুবিধার জন্য পূর্ণিমামিলন চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে অধিষ্ঠিত হয়।

গবেষণার নিমন্ত্রণ ! *

(প্রবাসী, চৈত্র ১৩১৬)

মাসদ্বয় ধরিয়া অনাহারে অনিদ্রায় রোগশয্যায় শয়ান পুত্রের অহর্নিশ সেবায় শরীর ও মন শ্রান্তক্লান্ত, এমন সময় সাহিত্য-সম্মিলনের তরফ হইতে এক উকিলের চিঠি পাইলাম :—'যেহেতু মহাশয়ের মৌলিক অনুসন্ধান ও অসাধারণ বিদ্যাবত্তা সুবিখ্যাত, অতএব আপনাকে এতদ্দ্বারা জানান যাইতেছে যে অত্র সাহিত্য-সম্মিলনে আপনার একটি গবেষণাপূর্ণ, বিদ্বৎসভার উপযুক্ত, প্রবন্ধ পঠিত হয় অভ্যর্থনাসমিতির এই ইচ্ছা, তদর্থে মহাশয়কে বিবেচনার জন্য এক মাসের সময় দেওয়া গেল।' এই কোমল আমন্ত্রণপত্রে আবার একটা পরিশিষ্ট, উইলপত্রের কডিসিলহিসাবে যুড়িয়া দেওয়া আছে। উক্ত পরিশিষ্টে গবেষণার আমলে আসিতে পারে এরূপ বিষয়ের যে বিস্তারিত ফর্দ দেওয়া আছে, তাহাতে শূদ্রক-কবির 'ঋগ্বেদং সামবেদং গণিতমথ কলাং বৈশিকীং হস্তিশিক্ষাম্'কেও হার মানিতে হইবে। বুঝিলাম 'আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তম্' কোনও বস্তুই এই দিনত্রয়ব্যাপিনী বাণীপূজার নৈবেদ্য হইতে বাদ পড়িবে না।—কৃষ্ণনগরের রাজার দেওয়ানবংশ বনিয়াদি বংশ। বংশগত অভ্যাসবশতঃ সহকারী সভাপতি মহাশয়ের হাত দরাজ, নজর উঁচু, ফরমাএশ লম্বাচওড়া। অথচ কৃষ্ণনগরের রাজার প্রজা হইয়া এ হুকুম অমান্য করি কেমন করিয়া? এখন করি কি? কোন্ বিষয়টি নির্ব্বাচন করিয়া স্বকীয় 'সুবিখ্যাত বিদ্যাবত্তা

* ভাগলপুর-সাহিত্য-সম্মিলনে অপঠিত—অতএব অপাঠ্য।

ও মৌলিক অনুসন্ধানে'র পরিচয় দেই ও 'গবেষণাপূর্ণ, বিদ্বৎসভার উপযুক্ত প্রবন্ধ দ্বারা বঙ্গসাহিত্যকে অলঙ্কৃত' করি ? বিষয়ের বিরাট্ ফর্দ্দ দেখিয়া যে বাঁশবনে ডোমকাণা গোছ হইয়া পড়িয়াছি।

আচ্ছা, ধীরভাবে বিচার করিয়া দেখা যা'ক্। ইস্তু ধার্য্য করিবার পূর্ব্বে ফর্দ্দ-নির্দ্দিষ্ট বিষয়গুলি নম্বরওয়ারি করিয়া লই ও এক এক নম্বর ধরিয়া জারি করিতে থাকি।

১নং, সাধারণ সাহিত্য। এ সম্বন্ধে বিদ্যার দৌড় ত ছাত্রদিগের Exercise correction পর্য্যন্ত। দাগা বুলানর ঊর্দ্ধে কোনও দিন উঠি নাই। সুতরাং নিরস্ত থাকাই ভাল।

২নং, বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস ও ক্রমোন্নতি ইত্যাদি। এ কার্য্যে 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র ইতিহাসলেখক, 'সাহিত্য'-পত্রে মাসিক-সাহিত্য-সমালোচক ও পরিষৎ-পত্রিকায় বার্ষিক-সাহিত্য-সমালোচক, এই ত্র্যহস্পর্শ-দোষ ঘটিয়াছে। অতএব এ পথে যাত্রা নাস্তি।

৩নং, বাঙ্গালা ব্যাকরণ। আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের Board of Studies-এর জিম্মা, এই নূতন রক্ষকের হাত হইতে ছিনাইয়া লইলে ফৌজদারিতে পড়িতে হইবে।

৪নং, বৈজ্ঞানিক পরিভাষা। স্বয়ং পরিষদের মাননীয় সভাপতি মহাশয় হইতে অজাতশ্মশ্রু বৈজ্ঞানিক এম্-এ পর্য্যন্ত উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। ঐ ভিড় ঠেলিয়া প্রবেশ করে কাহার সাধ্য ? Impenetrability of matter ত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত।

৫নং, বিজ্ঞান। পরিষদ্ জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান-প্রচারের কার্য্যে নূতন ব্রতী হইয়াছেন, তথায় প্রদত্ত বক্তৃতাগুলি শেষ না হইলে কিছু বলা চলে না। কেননা, একটা মোটামুটি জ্ঞান লাভ না করিয়া মৌলিক অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই কিরূপে ? অতএব এ ক্ষেত্রে সময় প্রার্থনা করি।

৬নং, ভূত-তত্ত্ব। এই অতিমানুষিক বিষয় আলোচনা করিতে গেলে গা ছম্‌ছম্‌ করে—বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ভূতুড়ে কাণ্ড' ত রাত্রিকালে ব্যক্তিবিশেষের নিতান্ত বাধ্য করিয়া ফেলিয়াছে। আর অধিক বাড়াবাড়ি করিলে রক্ষা নাই।

৭নং, চিকিৎসা। এই প্রবন্ধ-শ্রবণের পর সভা হইতেই তাহার ব্যবস্থা হইবে।

৮নং, দর্শন, দর্শনের ইতিহাস ইত্যাদি। ফরমাএশ একটু অসময়ে হইতেছে না কি? আগে দেখি শুনি, দু'দিন এখানে বেড়াই চেড়াই, তবে ত দর্শনের ইতিহাস লিখিতে পারিব। এ যে দেখিতেছি 'রাম না হ'তে রামায়ণ'। তবে ইংরেজেরা আগে ডায়েরি লিখিয়া পরে দেশভ্রমণে বাহির হয়েন এরূপ একটা নজীর আছে বটে।

৯নং, ভাষাতত্ত্ব। শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন মহাশয় ঐ অজুহাতেই পেন্‌শন্‌ লইয়া কার্য্যে কৃতী হইয়াছেন। তিনি যেরূপ 'আদাজল খাইয়া' লাগিয়াছেন তাহাতে বাঙ্গালা ভাষা যে সংস্কৃত ভাষার লৌকিক বা প্রাকৃত সংস্করণ, এই সহজ সত্য প্রমাণ না করিয়া ছাড়িবেন না। এইবার রজ্জুতে আর সর্পজ্ঞান হইবে না।

১০নং, প্রত্নতত্ত্ব। নীরস প্রত্নতত্ত্বের পরিবর্ত্তে সরস পত্নী-তত্ত্ব অন্য-ক্ষেত্রে আলোচনা করিয়াছি।

১১নং, বেদান্ত। শুভক্ষণে কি অশুভক্ষণে জানি না, আদিব্রাহ্মসমাজ বাঙ্গালাদেশে বেদান্তচর্চ্চার সূত্রপাত করিয়াছিলেন। এখন আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, কালীবর বেদান্তবাগীশের দিন চলিয়া গিয়াছে। মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারও অস্তমিত। এখন গোলামখানার রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ বৃত্তিধারী হইতে স্কুলে প্রোমোশন-না-পাওয়া পড়ুয়া পর্য্যন্ত সকলেই বৈদান্তিক! আবার শ্রীগোপাল বসুমল্লিক-বৃত্তির প্রসাদাৎ

টোলের 'তৈলে ভাণ্ডমস্তি বা ভাণ্ডে তৈলমস্তি' হইতে সংস্কৃত কলেজের 'ইংরেজীর ঘিয়ে ভাজা সংস্কৃত ডিম্‌' পর্য্যন্ত বেদান্তরসে ওতপ্রোত। অবিদ্যাঘনে জগৎ অন্ধকার হইয়া পড়িয়াছে। অথচ বাঙ্গালামুল্লুকে বেদান্তজ্ঞানের পরিচয় 'অবিদ্যা' শব্দের গ্রাম্য অর্থ-প্রচারেই যথেষ্ট পাওয়া যায়। শঙ্করাচার্য্য গৃহী হইলে এই সব অত্যাচারে সন্ন্যাসী হইয়া বাহির হইয়া পড়িতেন; বেগতিক দেখিয়া অগত্যা থিয়েটারে আশ্রয় লইয়াছেন!

১২নং, ধর্ম্ম। 'জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ', কেননা 'ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্‌'। স্বয়ং নারায়ণ বরাহ-অবতারে উদ্ধারসাধন করিয়াছেন। সামান্য মানবের অসাধ্য।

১৩নং, গীতা। সে যে আজকাল নিষিদ্ধ বস্তু। বিস্ফোরকপ্রস্তুত-প্রণালীর সঙ্গে নিত্যসম্বদ্ধ। 'সর্ব্বং ততং ব্যোম এব মহিম্ন'। স্বয়ং ভগবান্‌ বলিয়াছেন 'কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো লোকান্‌ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।' ইহাতে inference, suggestion, allusion, metaphor, innuendo আর বাকী রহিল কি? মহর্ষির উপযুক্ত পুত্র শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ও সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তবে গীতাসম্পাদনে সাহসী হইয়াছেন, 'অন্যে পরে কা কথা'। আমি বেচারা কি চাকরিটুকু খোয়াইব? তবে রিস্‌লি সাহেবের হালের সার্টিফিকেটে কতকটা ভরসা হয়। *

১৪নং, বাইবেল ও কোরান। সামান্য একটু ভুল হইয়াছে, ত্রিপিটকের নামটা ছাড় পড়িয়াছে। আচার্য্য বিদ্যাভূষণের যে আজ-কাল

* ক্রুক্‌স্‌ নামক আর একজন সাহেবও সম্প্রতি গীতার গুণগান করিয়াছেন; পক্ষান্তরে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত চন্দ্রবরকর গীতা প্রলয়ঙ্করী ও ছাত্রগণের অস্পৃশ্য এইরূপ রায় প্রকাশ করিয়াছেন। এই সব দেখিয়া শুনিয়া বলিতে ইচ্ছা করে, 'বিধি হ'তে ব্যাধ ভাল'।

গড়্তা খারাপ। যাহা হউক কবিবর নবীনচন্দ্র ধারাবাহিক কাব্য লিখিয়া সব ধর্ম্মের সমন্বয় করিয়া গিয়াছেন। আর পিষ্টপেষণ কেন?

১৫নং, সুকুমার কলা। শুনিয়াছি পশ্চিমে সুবিধা-গোছ মেলে না, কাঁদি-নিবাসী পরিষদের সম্পাদক মহাশয় দুই এক কাঁদি আনিয়াছেন কি না জানি না। নতুবা লঙ্কা হইতে ডাক্তার কুমারস্বামী দ্বারা অথবা মার্কিন-মুল্লুক হইতে ভগিনী নিবেদিতা দ্বারা আমদানী করিতে হইবে। ইঁহারা বিশেষরূপে কলা-ভক্ত।

১৬নং, চিত্র। কবি রঙ্গলাল শেষ কথা বলিয়া গিয়াছেন—'কোন্ মূঢ় চিত্রকরে, পদ্মদেহ চিত্র করে, করিলে কি বাড়ে তার শোভা?'

১৭নং, শিল্প ও বাণিজ্য। ইহার দাপটে 'প্রবাসী' ক্রমেই গুরুপাক হইয়া পড়িতেছে। আর কেন?

১৮নং, রঙ্গালয় ও যাত্রা। আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের নববিধানে সঙ্গে সঙ্গে practical demonstration চাই। তাহার আয়োজন আছে কি?

১৯নং, ভূগোল। বিশ্ববিদ্যালয়ের নববিধানে ভূগোলের পাট এক প্রকার উঠিয়াছে। বাঙ্গালী ঘরবোলা হওয়াই ত প্রার্থনীয়। ভূগোল জানিয়া আবার গোলে পড়িবে, সিংহল যবদ্বীপ জাপানে উপনিবেশ করিবে। Prevention is better than cure; এইজন্যই ত কলিতে সমুদ্রযাত্রা-নিষেধ।

২০নং, গণিতশাস্ত্র। ব্যুৎপত্তির অভাবে কখনও চৌদ্দ মিলাইয়া পদ্য লিখিতে পারি নাই, সাংখ্যদর্শনে প্রবেশও ঐ জন্য ঘটিয়া উঠে নাই।

২১নং, বৌদ্ধধর্ম্ম। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র আচার্য্য বিদ্যাভূষণ থাকিতে অন্য কে ভার লইবে? কথায় বলে 'যার কর্ম্ম তা'রে সাজে'। তিনি লঙ্কা হইতে ফিরিয়াছেন, আর ভয় কি? এতদ্ভিন্ন

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার এই সব মহাদীপ-সমীপে নাম্নাঃ স্ফুরন্তি। পালিভাষায় পল্লবগ্রাহিতা শোভা পায় না।

২২ নং, স্থপতিবিদ্যা। ইহার আলোচনা করিতে হইলেই লর্ড কর্জনের (Ancient Monuments Act) গুণগান করিতে হইবে। তাহা কাহারও বরদাস্ত হইবে কি?

২৩ নং, ইতিহাস। ঐতিহাসিক গবেষণার হিড়িকে ঋগ্‌বেদ চাষার গান, প্রাচীন আর্য্যগণ বল্‌টিক-তীরবাসী, দেবাদিদেব মহাদেব বোধিসত্ত্বের হিন্দুসংস্করণ, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ, কৌশল্যা পুত্রের সিংহাসন-লাভার্থ ষড়যন্ত্রকারিণী, মুর্শিদ কুলি খাঁ সুব্রাহ্মণ, সিরাজদ্দৌলা আদর্শ প্রজারঞ্জক রাজা, আরঙ্গীব লর্ড কর্জনের ন্যায় বিচক্ষণ শাসনকর্ত্তা, অন্ধ-কূপ মৃগতৃষ্ণিকা, কালাপাহাড় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, আদিশূরের প্রকৃত নাম লক্ষ্মীনারায়ণ সেন, লক্ষ্মণসেন প্রবলপ্রতাপান্বিত, কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ-ব্রাহ্মণ-আনয়ন কবিকল্পনা—ইত্যাদি সারসত্য সাব্যস্থ হইয়াছে। যিনি সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাস লিখিতে বসিয়াছিলেন, ঐতিহাসিক তথ্যের সত্যতা সম্বন্ধে সেই স্যর ওয়াল্‌টার র‍্যালের মন্তব্য জানেন ত? এই অসত্যের অভ্যুত্থান-নিবারণমানসেই নবসংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাসপাঠ একপ্রকার উঠাইয়া দিয়া দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন।

এখন কোন্ পথে যাই? হয়ত যে বিষয় অবলম্বন করিব তাহাতেই এমন চূড়ান্ত পাণ্ডিত্য দেখাইয়া ফেলিব যে তাহার উপর আর কাহারও পাণ্ডিত্য-প্রকাশের অবসর থাকিবে না। পুত্রটি আসন্নসঙ্কট হইতে সদ্যোমুক্ত, কেন মিছামিছি পেশাদার লেখকদিগের অভিসম্পাত কুড়াই? এই বিষম সমস্যায় অকস্মাৎ মহাকবির বজ্রগম্ভীরধ্বনি 'তুড়ুপেনাস্মি (!) সাগরম্' মনে পড়িয়া গেল। আচ্ছা, রঙ্গের সাতা তুড়ুপ করিয়া

বদ্‌রঙ্গের অর্থাৎ নীরস গুরুগম্ভীর প্রবন্ধের টেক্কা জিতিয়া লইলে হয় না? রাশি রাশি 'নির্জ্জলা' দুধে আমি একঘটি জল ঢালিলে কি কেহ টের পাইবে? সাহিত্য-সম্মিলনের নবখনিত গবেষণা-পুষ্করিণী কানায় কানায় ভরিয়া ক্ষীরসমুদ্র হইয়া উঠিবে। আর যদিই বা কেহ টের পায়, সাহিত্য-মরালগণ নীরত্যাগ করিয়া অবশ্যই ক্ষীর গ্রহণ করিবেন। পরক্ষণেই আবার একটা খট্‌কা বাধিল; নাঃ, এরূপ বিরাট্‌ জনসংঘের সমক্ষে, অভিরূপ-ভূয়িষ্ঠা পরিষদের দরবারে, যশঃপ্রার্থী হইতে গিয়া উপহাস্য হওয়া ঠিক নহে। 'নাহি কায প্রবন্ধ লিখিয়া।' চিন্তাজ্বরে আকুল দেখিয়া গৃহিণী তারকেশ্বরে 'হত্যা' দিবার কথা তুলিলেন। 'স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী' জানিয়া সে কথায় কাণ দিলাম না।

যাহা হউক, নানারূপ দুশ্চিন্তায় সারারাত্রি কাটাইলাম। শেষরাত্রে একটু তন্দ্রা আসিল। কতক্ষণ তন্দ্রাগত ছিলাম জানি না, অকস্মাৎ কি একটা খসড়্‌ খসড়্‌ শব্দে চট্‌কা ভাঙ্গিয়া গেল। স্বপ্নের আবেশে চক্ষুঃ মেলিয়া দেখিলাম, সম্মুখে এক মহাপুরুষ দণ্ডায়মান। প্রথমে ভ্রম হইল, বিভূতিচর্চ্চিত ৺তারকেশ্বর মহাদেব বা ধড়াচূড়া-পরা বনমালী রাখালরাজ বা নিতান্ত-পক্ষে জটাজূটধারী নারদমুনি বুঝি আবির্ভূত হইয়াছেন। কিন্তু হায় হায়, তাঁহাদের কাল চলিয়া গিয়াছে—এখন বিপদে পড়িলে মধুসূদনের স্মরণ না করিয়া উকীলের বাড়ী ছুটিতে হয়। ভাল করিয়া চক্ষুঃ চাহিয়া দেখিলাম, লম্বাগাউনধারী মুণ্ডিতশ্মশ্রুগুম্ফ এক অপরূপ মূর্ত্তি। (অন্ধকারে গাউনটা কাল কি নীল রঙ্গের, তাহা ঠিক ঠাহর হইল না।) মহাপুরুষ শিয়রে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "কি ভয় বাছনি? আমাকে চিনিতে পারিতেছ না? ৺কালীঘাটের নিকটস্থ এক বিস্তীর্ণ জনপদে আমার অধিষ্ঠান। তোমাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখিয়া দয়াপরবশ হইয়া তোমার কাছে আসিয়াছি, এই

ফয়সাল্লা লইয়া স্বচ্ছন্দে সম্মিলনে গমন করিও।” আমি বলিলাম “আমি কি করিয়া ফয়সালা পাঠ করিব? আমার কোনও পুরুষে ওকালতী করে নাই, অধস্তন কেহ যে করিবে তাহারও ভরসা রাখি না। একবার হাইকোর্টে জুরি হইয়াছিলাম, আইন-আদালতের সঙ্গে আমার সম্পর্ক এই পর্য্যন্ত। তাও সে কিস্তিতে একজন পাহারাওয়ালাকে ঘুঁষ লওয়ার অপরাধে জেল দিয়াছিলাম। হয় ত সেই অবধি পুলিশ আমার উপর খর দৃষ্টি রাখিয়াছে। আমার হাতে ফয়সালা দেখিলেই চোরাই মাল রাখি বলিয়া ধরাইয়া দিবে।” মহাপুরুষ বলিলেন, “মাভৈঃ! সেখানে দেখিবে সবাই উকীল; অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক উকীল, সহকারী সম্পাদক উকীল, সহকারী সভাপতি উকীল, সম্মিলনের সভাপতি ভূতপূর্ব্ব উকীল ও জজ; দুইটা আইনের কথা তুলিলেই তাঁহারা জল হইয়া যাইবেন। তুমি নির্ভয়ে সুস্থশরীরে খোসমেজাজে বাহাল-তবিয়তে এই ফয়সালা-বর্ণিত মোকদ্দমাটি দায়ের করিবে, একতরফা ডিক্রী পাইবে ইহা ধ্রুব জানিবে। এ কথা যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে জানিবে আইন মিথ্যা, নজীর মিথ্যা, দলীল দস্তাবেজ ইষ্ট্যাম্প-কাগজ ডেমি বুড়া আঙ্গুলের টিপ্ সবই মিথ্যা।” এই বলিয়া মহাপুরুষ অন্তর্ধান হইলেন। দেখিলাম শয্যাপার্শ্বে এই অদ্ভুত ‘বর্ণমালার অভিযোগ’।

বর্ণমালার অভিযোগ *

(প্রবাসী, চৈত্র ১৩১৬)

আজকাল সাহিত্যিক মোকদ্দমার বিচারের জন্য সাহিত্য-পরিষদ্ নামে একটা Special Court বসিয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বর্ণপরিচয়ে'র আমল হইতে আমাদের একটা Grievance আছে, এতদিন বিচারের স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত না থাকাতে আমরা মোকদ্দমা দায়ের করিতে পারি নাই। আশা করি, অবস্থা-বিবেচনায়, সময় অতীত হইয়া গিয়াছে এই অজুহাতে আদালত আমাদের দাবী তামাদী হওয়ার আপত্তি তুলিবেন না। ভাগলপুর-অধিবেশনে মোকদ্দমা পেশ করিলাম, যেহেতু এখানকার অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক উকীল, সহকারী সম্পাদক উকীল, সহকারী সভাপতি উকীল, ওকালতনামা গ্রহণ করিবার উপযুক্ত লোকের অসদ্ভাব নাই। আর যখন হাইকোর্টে সুবিচারের জন্য খ্যাতনামা ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি পরিষদের সভাপতি মহাশয় স্বয়ং বিচারক, তখন এক্ষেত্রে নিরপেক্ষ বিচার হইবে এরূপ ভরসা করা বোধ করি অন্যায় হইবে না। পরন্তু "সাহিত্যিক সব ছোট বড়, এই খানেতে হ'য়ে জড়" সভার শোভা সংবর্দ্ধন করিতেছেন। সুতরাং জুরীরও অপ্রতুল নাই। অতএব যখন উকীল হাকিম ও জুরী তিনই মজুত, তখন আরজী দাখিল করিতে আর বিলম্ব করিব না।

---

* ভাগলপুর-সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত।

মোকদ্দমার বিবরণ।

আর্জ্জির প্রথম দফা। আমাদের প্রথম আপত্তি, আমাদের নাম-করণ লইয়া।

আমাদের সমগ্র সম্প্রদায়ের নাম হইয়া গিয়াছে 'বর্ণমালা।' এখন 'বর্ণ' শব্দটী নানার্থ-বোধক; কোষকার বলিয়া গিয়াছেন, 'বর্ণো দ্বিজাদৌ শুক্লাদৌ স্তুতৌ বর্ণস্তু বাক্ষরে'। কাযেই বর্ণমালা বলিলে কেহ বা বুঝিবেন, বাঙ্গালীর ব্রাহ্মণ কায়স্থ নবশাখ প্রভৃতি ছত্রিশ জাতির তালিকা, A Catalogue of Castes (রিস্‌লি সাহেব প্রণীত); কেহ বা বুঝিবেন নানান্ বর্ণী নানা ফুলের মালা—সরকারী অনুবাদক অশেষশাস্ত্রজ্ঞ শাস্ত্রী মহাশয়ের তর্জ্জমায় দাঁড়াইবে—a garland of (flowers of) many colours; আবার কোনও কোনও অতি-বুদ্ধিমান্ বুঝিবেন, রংগোলা নারিকেলের মালা, চাল্‌চিত্রের জন্য ব্যবহৃত। এইরূপে মালী, পটুয়া ও যজমানী ব্রাহ্মণ আমাদের নামের অদ্ভুত অদ্ভুত মনগড়া অর্থ বুঝিয়া বসিয়া থাকিবেন। তিন দিক্ হইতে টানাহিঁচড়ায় আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত, অবস্থা ত্রিশঙ্কু অপেক্ষাও শোচনীয়। ইহার উপর আবার 'গণ্ডস্যোপরি পিণ্ডঃ সংবৃত্তঃ'; প্রগাঢ় গবেষকগণ, বর্ণ (রং) হইতে বর্ণমালার উদ্ভব, picture-writing হইতে আধুনিক বর্ণগুলি ক্রমিক বিবর্ত্তন ইত্যাদি উদ্ভট যুক্তি দিয়া লাল কাল জরদা নীল প্রভৃতির সঙ্গে নাম-সাম্য ঘটাইয়া আমাদিগকে তাঁহাদের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসাইতে চাহেন, ইহা কি সামান্য আপ্‌শোষের কথা ?

অতএব আমাদের বিনীত প্রার্থনা, আমাদের এই দোরোখা নাম বদ্‌লাইয়া 'অক্ষর' বা সোজাসুজি 'ক খ' নাম দিয়া এই বিভ্রাট্ হইতে রক্ষা করুন। ইংরেজীতে A. B. C বা Absey Book

রহিয়াছে, পণ্ডিতজনের মুখরোচক alphabet শব্দ গ্রীক্ বর্ণমালার প্রথম দুইটী অক্ষর হইতে ব্যুৎপন্ন, এই দুইটি নজীর হুজুরদিগের গোচর করিতেছি। আজকাল সরকার বাহাদুরের সমীপে দরখাস্ত করিয়া অনেক জাতি নাম বদ্‌লাইয়া লইতেছে, আমরা কি ঐ নজীর-দৃষ্টে সুবিচারের প্রার্থনা করিতে পারি না?

আবার আমাদিগকে যে দুইটি প্রধান বিভাগে ভাগ করা হইয়াছে, সে শব্দ দুইটিও দ্ব্যর্থবোধক। 'স্বর' বলিলে সংগীতের কথা মনে আসে, 'ব্যঞ্জন' বলিলে জিহ্বায় জল আসে। ভাষাতত্ত্বের ন্যায় exact scienceএ এরূপ তরল-ভাব-সঞ্চারক শ্লিষ্ট পদের ব্যবহার নিতান্ত গর্হিত। সাহিত্য-পরিষদ্ পরিভাষা-সঙ্কলনে ব্রতী হইয়াছেন, এই গোড়ার গলদ শোধ্‌রাইতে এত উদাসীন কেন?

আমাদের দ্বিতীয় দফা নালিশ, আমাদের পৃথক্ বা সমগ্রভাবে অপব্যবহার। যেমন ইঁট-কাঠে চূণ-সুরকীর মশলা-সংযোগে সুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মিত হয়, সেইরূপ অক্ষর ও ছেদ-চিহ্নে যুক্তি বা কবিত্বের মশলা-সংযোগে সুপাঠ্য গদ্য-পদ্যের সৃষ্টি হয়। এই মহৎ কার্য্যের জন্যই আমাদের উদ্ভব, ইহাতেই আমাদের জীবন ধন্য। ভাষা ও সাহিত্যবস্তুর নির্ম্মাণে আমরা পরমাণুর কার্য্য করি। কিন্তু কতকগুলি দুর্বৃত্ত লোকে আমাদিগের সম্ভ্রমের হানি করিয়া আমাদিগকে বেগার ধরিয়া নানাপ্রকার নীচ কার্য্যে লাগাইয়া আমাদিগকে অযথা ব্যবহার করিতেছে। ইহা দণ্ডবিধি আইনে গুরুতর অপরাধ বলিয়া পরিগণিত। আমরা অত্র আদালতে এই অত্যাচারের প্রতিবিধান প্রার্থনা করিতেছি।

অত্যাচারীদিগের নামের তালিকা এবং অত্যাচারের প্রকৃতি ও পরিমাণ নিম্নে তালিকাভুক্ত করিয়া দিলাম :—

প্রথম আসামী, ব্যবস্থাশাস্ত্রকার ও ব্যবহারাজীবগণ। ইঁহাদের

পেশা নাকি দুষ্টের অত্যাচার হইতে শিষ্টকে রক্ষা করা। কিন্তু আমাদের অদৃষ্টের ফেরে এক্ষেত্রে 'যে রক্ষক সেই ভক্ষক' হইয়াছে! তাঁহারা কোন্ ধারামতে আমাদের ন্যায় নিরীহ ক্ষুদ্র সাহিত্যপ্রাণ জীবের উপর জুলুম করেন, তাঁহারাই বলিতে পারেন। দেখিতেছি, আইন গড়া ও ভাঙ্গা উভয়ই তাঁহাদের হাতে। আইনের কেতাব খুলিলেই দেখিবেন (ক) (খ) (গ) করিয়া ধারা সাজান, (ক) (খ) (গ) করিয়া খরচার হার বাঁধিয়া দেওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। এরূপ জঘন্য নীচ কার্যের জন্য ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন (মীমাংসাদর্শনের মতে শব্দ ব্রহ্ম) আমাদিগকে ধরিয়া কুলি খাটান কিরূপ ভদ্রতা? এসব কার্যের জন্য ত গণিতের সংখ্যাগুলিই রহিয়াছে। সেই নম্বরওয়ারী পুলিশ পল্টন থাকিতে খামখা ভদ্র-সন্তানকে ধরিয়া Special Constable করা কেন?

দেখাদেখি দর্শন-শাস্ত্রের, তর্ক-শাস্ত্রের, মহারথীরাও আমাদিগকে ধরিয়া তাঁহাদিগের যুক্তি, প্রমা, উপপত্তি, প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয়, নিগম প্রভৃতি সাজানর কার্যে সহায়তা করাইতেছেন। কেন, আবহমানকাল প্রচলিত 'প্রথমতঃ' 'দ্বিতীয়তঃ' বলিতে কি তাঁহারা থতমত খান?

২নং আসামী, জ্যামিতি-পরিমিতি-ত্রিকোণমিতিকারগণ। তাঁহাদের বৃত্ত বৃত্তাভাস ত্রিভুজ চতুর্ভুজ বহুভুজ পুরুভুজ প্রভৃতি অষ্টাবক্র মূর্তি খাড়া করিতে হইলেই আমাদের ডাক পড়ে। আমরা যেন রেখাগণিতের বাসি ছাই ফেলিতে ভাঙ্গা কুলা। কেন এ কার্যের জন্য নিজেদের জ্ঞাতিগোষ্ঠীকে পাটীগণিতের ঘর হইতে না ডাকিয়া সাহিত্যের ঘরে ডাকাতি করিতে আসেন, ইহার কি কোনও জবাবদিহির দরকার নহে? আজকাল সৎকারের সময় আত্মীয়-স্বজন কাঁধ দিতে চাহে না,

গুলিখোর ডাকিয়া কায সমাধা করিতে হয়; এ ব্যাপারেও কি সেই জন্ত স্বঘর পাটীগণিতের সংখ্যাগুলির গায়ে হাত না দিয়া আমাদিগকে ধরিয়া টান দেন? অনেক সৌখীন ব্যক্তি নিজের জিনিশটি ময়লা হইয়া যাইবে আশঙ্কায় সেটিকে তাকে তুলিয়া রাখিয়া পরের জিনিশ লইয়া কায সারেন, নিজেরটি ফিট্‌ফাট রাখেন, ইঁহারাও দেখিতেছি সেই প্রকৃতির। অথবা আমাদিগকে ব্যবহারে আনিয়া তাঁহারা সাহিত্য-চর্চ্চার ভান করেন, পাঠকের মনে একটা ভ্রান্তি জন্মাইয়া দিতে চাহেন যে তাঁহারাও সাহিত্যিক। দার্জ্জিলিঙ্গে কাঠের বাড়ী এমন করিয়া নির্ম্মিত যে ইঁটের বাড়ী বলিয়া ভ্রম হয়। এক্ষেত্রেও কি শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় নীরস (wooden) গণিতশাস্ত্রকে সাহিত্য বলিয়া ভ্রম জন্মাইয়া দেওয়ার অভিসন্ধি? তাহা হইলে এ ত ঘোরতর প্রতারণা (Cheating) বা ছদ্মবেশে বঞ্চনা (false personation)।

কোনও কোনও মহাপণ্ডিত আবার প্রগাঢ় গবেষণার পরিচয়-প্রসঙ্গে পরিশিষ্টে চিহ্ন-হিসাবে আমাদিগকে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। জানি না, তাঁহারা অক্ষর-পরিচয় আছে তাহারই প্রমাণ দিবার জন্য এই প্রণালী অবলম্বন করেন কি না (দুষ্ট লোকে যে তাহাতেও সন্দেহ করে)। পরিষদ্ হইতে ইহার একটা প্রতীকার না হইলে অগত্যা বিশ্ববিদ্যালয়ের সরস্বতীর নিকট হাইকোর্ট করিতে বাধ্য হইব।

আমাদের তৃতীয় দফা নালিশ, আমাদের সংখ্যার দিন দিন নানারূপ স্বাভাবিক ও কৃত্রিম উপায়ে হ্রাস হইতেছে। যখন সত্ত্বপ্রধান আর্য্যগণ স্মরণাতীত কালে যথাস্থানসমীরিত স্বরগ্রাম উচ্চারিত করিয়া ভারতী ও ভারতকে চরিতার্থ করিয়াছিলেন, তখনকার দুইচারিটা অক্ষর এখনকার দিনে লোপ পাইয়াছে, তাহাতে ক্ষোভ নাই। কালসহকারে এরূপ ক্ষয়, এরূপ ঝড়্তি-পড়্তি (wear and tear), স্বভাবের নিয়ম।

যোগ্যতমের উদ্‌বর্ত্তন, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব পরিষদে ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধপাঠের কল্যাণে আমাদের অবিদিত নাই। কিন্তু বিদ্যাদিগ্‌গজেরা যে কৃত্রিম-নির্ব্বাচন-প্রণালীতে আমাদিগের সংখ্যাহ্রাসের চেষ্টায় আছেন, ইহাতে আমাদের আন্তরিক অশান্তির কারণ হইয়াছে। যাঁহার হ্রস্বদীর্ঘজ্ঞান নাই, তিনি হ্রস্বদীর্ঘভেদে পৃথক্ পৃথক্ স্বরবর্ণ চাহেন না। যাঁহার শ্রুতিশক্তি অপ্রখর, তিনি বর্গ্য ব অন্তঃস্থ ব, তালব্য শ মূর্দ্ধন্য ষ দন্ত্য স, বর্গ্য জ অন্তঃস্থ য, স্বরের অ অন্তঃস্থ য়, এগুলির প্রভেদ মানিতে চাহেন না। কয়েকমাস হইল একজন ইংরেজীনবীশ বিশ্ববিদ্যালয়ের চাপরাশওয়ালা ইংরেজীর আসরে কলিকা না পাইয়া আমাদিগকে লইয়া পড়িয়াছেন, ইংরেজীর দরবারে মুখ না পাইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিয়া মাতৃভাষার পিণ্ডদানে উদ্যত হইয়াছেন, (ইহাকেই বলে কায না থাকিলে খুড়াকে তীরস্থ করা!) তিনি নাকি স্বরসংখ্যা পাঁচটিতে ও ব্যঞ্জনসংখ্যা চতুর্দ্দশটিতে দাঁড় করাইয়া তবে নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। ভাগ্যে তিনি বিদ্যালয়-পাঠ্য-পুস্তক-প্রণেতাদিগের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা পাঠ্য-পুস্তক-নির্ব্বাচন-সমিতির সদস্য নহেন, সেই রক্ষা। নতুবা ত দেখিতেছি বাঙ্গালা হইতে আমাদিগকে পাত্‌তাড়ি গুটাইতে হইত। ন্যূনকল্পে দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে হিন্দুর ক্রিয়াকাণ্ড সম্পন্ন হয়, কিন্তু অনেক ইংরেজীনবীশ তাহাতেও রাজী নহেন। এই ইংরেজীনবীশ ব্যক্তিটির ও ছয়টি স্বরও চক্ষুঃশূল। গৃহস্থের অন্নযজ্ঞে চৌষট্টি ব্যঞ্জন আজ্‌কালিকার দিনে ডাল-ডালনায় দাঁড়াইয়াছে; অপর পক্ষেও ব্যঞ্জন-সংখ্যা-হ্রাসের আশঙ্কা সেইরূপই প্রবল। দুঃখের বিষয়, এই দুর্দ্দিনে আমাদের হইয়া কেহ 'A Dying Race' বা 'মরণোন্মুখ জাতি' বলিয়া প্রবন্ধ বা বিলাপ-কাব্য লেখে না। যেমন হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস হইতেছে কিন্তু বৃদ্ধির কোন উপায় অবলম্বিত হইতেছে না, আমাদের অবস্থাও কি

সেইরূপ শোচনীয় নহে ? অতএব এই সঙ্কটে আমরা আদালতের শরণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছি। পরিষদ্ কোনরূপ বিনিয়োগের ব্যবস্থা করিয়া আমাদের সংখ্যাহ্রাস বন্ধ করুন।

আমাদের চতুর্থ দফা নালিশ, আমাদিগকে নানাভাবে রূপান্তরিত বিকৃত করিবার, ভেজাল দিবার চেষ্টা, অনেকদিন হইতে পুরাদমে চলিতেছে। ইহাকে adulteration এর ধারায় ফেলিবেন কি না, তাহা সুযোগ্য আইনজ্ঞগণ বলিতে পারেন ; এ সভায় কি তাঁহাদের পরামর্শ পাইব না ? অক্ষরসংযোগের সময় আমাদিগের নানারূপ অদ্ভুত রূপান্তর হয়। সেকালের (transcriber) লিপিকরগণের উপদ্রব মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণে অনেকটা নিবারিত হইয়াছে, তবে এখনও আদালতের দলিল-দস্তাবেজে ও পরিষদের সংগৃহীত হাতের লেখা পুঁথিতে ইহার প্রকোপ দেখা যায়, ও মাঝে মাঝে ঘোর বিড়ম্বনার সৃষ্টি হয়। সম্প্রতি কাশীরাম দাসের জন্মস্থান লইয়া সিঙ্গিগ্রাম বনাম সিঙ্গিগ্রাম এক নম্বর স্বত্বসাব্যস্তের মোকদ্দমা রুজু হইয়াছে, ইহা আপনাদিগের অবিদিত নাই। * দুই একজন উদারপ্রকৃতি ব্যক্তি দুই একটি সংস্কারের সূচনা করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা অবশ্য তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ ইহা প্রকাশ্য আদালতে জানাইতেছি। একজন কবি কদাকার ও প্রযত্নসাধ্য 'ঙ্গ' উঠাইয়া দিয়া যেখানে সেখানে অনুস্বার চালাইতে প্রয়াসী হইয়াছেন এবং আর একজন 'সুপংডিত' ব্যক্তি অন্য কতকগুলি যুক্তবর্ণ-বর্জ্জনের প্রণালী উদ্ভাবন করিয়া লেখক, পাঠক ও কম্পোজিটরের ভার লঘু (?) করিয়া দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু আমরা তদপেক্ষাও সুদূরগামী

* সুখের বিষয়, মোকদ্দমাটি অদ্যকার তারিখে অর আপসেতে নিষ্পত্তি হইয়া সিঙ্গিগ্রাম মায় খরচা ডিক্রী পাইল।

সংস্কারের প্রার্থী। স্থূল কথা এই :—সংযুক্ত বর্ণমাত্রই উঠাইয়া দিতে হইবে নতুবা বর্ণসঙ্কর-নিবারণ নিতান্ত অসাধ্য হইবে। একজন সাহেব বলিয়াছেন—সাহেবের উক্তিমাত্রই বেদবাক্য—মানুষে মানুষকে বয় আর অক্ষরে অক্ষরকে বয়, ইহা কেবল এই গোলামের দেশেই সম্ভবে। কথাটা বড় পাকা। এই স্বাধীনতা-সাম্য-মৈত্রীর আমলে, এই democracy-র দিনে, এই স্বরাজের বাজারে, এরূপ প্রথা নিতান্ত হেয়। অতএব আপনারা নিয়ম করিয়া দেন যে, ইহারা কেহ উপরে কেহ নীচে ঠেসাঠেসি ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া না বসিয়া—এরূপ বসিতে গেলে অনেকেরই হাড়গোড় অস্থিপিঞ্জর ভাঙ্গিয়া যায়—পাশাপাশি বসিবে, স্বাধীনভাবে পূর্ণ পরিণতি লাভ করিবে। স্বরবর্ণগুলি ত (হিন্দুস্ত্রীর ন্যায়) নিজের স্বাধীনতা হারাইয়া ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে অঙ্গে অঙ্গ মিলাইয়া রেখামাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে ; বেচারা 'অ'এর ত একেবারে অস্তিত্বের চিহ্নমাত্রও থাকে না ; (এই জন্যই কি ইহাকে লুপ্ত অক্ষর বলে ?) বায়ু যেমন সর্ব্বত্র বহে অথচ অদৃশ্য, অকার তেমনি সকল ব্যঞ্জনে (লবণের ন্যায়) থাকে অথচ অদৃশ্য। কিন্তু এখনকার দিনে এরূপ লুকোচুরি সন্দেহ-জনক। বিবাহ যেমন দাসত্ব বা দাসীত্ব নহে, Civil Contract মাত্র, (অর্দ্ধাঙ্গিনী অর্দ্ধনারীশ্বর প্রভৃতি শব্দ কেবল কবিকল্পনা-প্রসূত), সেইরূপ যুক্তাক্ষরের বেলায়ও উভয়ের স্বাতন্ত্র্যরক্ষা করিয়া পাশাপাশি বসানই স্বাভাবিক ও শোভন। সভ্যজাতিমাত্রেরই এই নিয়ম। এ কথাও যেন অর্দ্দলিতের স্মরণ থাকে যে যাহা কিছু ইংরেজীপ্রথাসম্মত, তাহাই উৎকৃষ্ট। রাজভক্তিহিসাবেও আজকালকার বাজারে ইহার প্রয়োজন। এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে যে শুধু আমাদের উপকার হইবে, তাহা নহে। মানবশিশুগণও দ্বিতীয়ভাগের বিভীষিকাময় কবল হইতে উদ্ধার পাইবে (সভাস্থ সকলেই ত ছেলেপুলে লইয়া ঘর করেন) এবং গৃহলক্ষ্মীদিগের

প্রেমপত্র লিখিবার পথও নিষ্কণ্টক হইবে। এই প্রস্তাবানুযায়ী এক পংক্তি স্বরলিপির ন্যায় লিখিয়া দেখাইতেছি—

শ্‌ র্‌ ঈ´ শ্‌ র্‌ ঈ´ দ্‌ উ´ র্‌ গ্‌ আ´ = শ্রীশ্রীদুর্গা।

আমাদের পঞ্চম ও শেষ দফা নালিশ, আমাদের উচ্চারণ লইয়া অনেক অকথা-কুকথা শুনিতে হয়। 'বাংলার মাটী বাংলার জল' নাকি অক্ষরমাত্রেরই বিকৃত উচ্চারণের অনুকূল। প্রথম অক্ষর 'অ' এর উচ্চারণ লইয়াই মতভেদ; ইহাকেই বলে 'বিস্‌মোল্লায় গলদ' অথবা সাধুভাষায়, স্বস্তিবাচনে প্রমাদ। ভরসা করি, বেহারে সাহিত্য-সম্মিলন ঘটাইয়া উচ্চারণের বিশুদ্ধীকরণে বাঙ্গালা ভাষার অদৃশ্য ভাগ্যবিধাতা সহায় হইবেন।

'বোধোদয়ে'র ব্যাখ্যা

(সাহিত্য, বৈশাখ ১৩১৬)

বহুকাল পূর্ব্বে স্বনামধন্য শ্রীযুত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পঞ্চানন্দ-অবতারে 'বোধোদয়ে'র সমালোচনা করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, উকীলের জেরার মুখে সাহিত্য-সমালোচনা একটা ঘোর বিড়ম্বনায় পরিণত হইয়াছিল। শাস্ত্রে—সংস্কৃত শ্লোকমাত্রই যে শাস্ত্র, ইহা বোধ হয় সকল হিন্দুসন্তানই জানেন—শাস্ত্রে এই জন্যই 'অরসিকে রসস্য নিবেদনম্' নিষিদ্ধ আছে; যাহাকে 'অস্যার্থঃ' করিয়া বলা হয়,—'রাখালের হাতে শালগ্রামের মরণ'। এইখানে তর্ক উঠিতে পারে, শালগ্রামের রস আছে কি না? এ কথার আর আমি কি উত্তর দিব? শীতকালে কলিকাতাস্থ সকলেই ইহা হৃদয়ঙ্গম—শ্রীবিষ্ণুঃ—রসনাঙ্গম করিয়াছেন। সংস্কৃত 'শালগ্রাম'ই যে পালি ভাষার ভিতর দিয়া আসাতে 'শালগম' আকার ধারণ করিয়াছে, বৌদ্ধ সুত্তনিকায়ে ইহার ভূরি ভূরি উদাহরণ আছে; আপনাদের বিশ্বাস না হয়, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র আচার্য্য বিদ্যাভূষণ পি, এইচ্, ডি, মহোদয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া জানুন। ফলতঃ, উকীল বাবু আইনের কূটতর্কে 'বোধোদয়ে'র অনেক গলদ বাহির করিয়াছেন। অদ্য আমি ছানির বিচারের প্রার্থী হইয়া আপনাদের নিকট উপস্থিত। কাব্যশাস্ত্রে আমার দখল ষোল আনা; কাব্যালোচনাই আমার জাত-ব্যবসা, শেক্স্পীয়ার্ মিল্টন্ গুলিয়া খাইয়াছি (ব্রাহ্মণের ছেলে হইয়া বেকন্-ল্যাম্বের নাম ত রসনাগ্রে লইতে পারিব না!) শেলী-

* পূর্ণিমা-মিলন-উপলক্ষে পঠিত।

ব্রাউনিং দুষ্টসরস্বতীর স্থায় আমার স্কন্ধে নৃত্য করিতেছেন (নরীনৃত্যাতি), বায়রন্ টেনিসন্ আমার জপমালা। আমি যদি কাব্য না বুঝিব, তবে বুঝিবে কে ? যাক্. আর অধিক আত্মশ্লাঘিকথনায় প্রয়োজন নাই। এক্ষণে প্রকৃত অনুসরণ করি।

'বোধোদয়' বস্তুপরিচয় শিখাইবার একখানি নীরস গ্রন্থ নহে, তাহার জন্য ত পণ্ডিত ৺ রামগতি ন্যায়রত্নের 'বস্তুবিচার'ই রহিয়াছে। যে লেখনী হইতে 'বেতালপঞ্চবিংশতি', 'ভ্রান্তিবিলাস', 'সীতার বনবাস', 'প্রভাবতী-সম্ভাষণ', প্রসূত, যে লেখনী 'শকুন্তলা', 'উত্তররামচরিত' প্রভৃতি নাটকের সৌন্দর্য্যবিশ্লেষণতৎপর, যে লেখনী 'বিধবাবিবাহ', 'বহুবিবাহ' প্রভৃতি রসাল-বিষয়নির্ব্বাচনপটু, সে লেখনী কি কখনও শুষ্কনীরস বিজ্ঞান-ভাণ্ডার-প্রণয়নে অগ্রসর হইতে পারে ? (ইহাকেই বলে ব্যতিরেকমুখ প্রমাণ !) বাস্তবিক 'বোধোদয়' একখানি কাব্য, পরন্তু একখানি খণ্ড-কাব্য। যে সকল শ্রোতা খণ্ডকাব্য কাহাকে বলে জানেন না, তাঁহাদিগকে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের 'মেঘদূত-সমালোচনা' একখণ্ড সংগ্রহ করিতে অনুরোধ করি। যাহারা খাঁড়গুড় খাইয়াছেন, 'খণ্ডকাব্য' বুঝিতে তাঁহাদিগের বাধিবে না। অন্যান্য কাব্যে নব রস থাকে ; 'বোধোদয়' খণ্ডকাব্য, পূর্ণ কাব্য নহে, কাযেই ইহাতে ছয় রস আছে। বিশ্বাস না হয়, পুস্তকের ৩৪ পৃষ্ঠা খুলিয়া 'জিহ্বা' বাহির করিয়া দেখুন। ইহাই হইল অন্বয়মুখ প্রমাণ !

অতএব সপ্রমাণ হইল যে, 'বোধোদয়' একখানি কাব্য। সংস্কৃত সাহিত্যে 'প্রবোধচন্দ্রোদয়', 'বীরমিত্রোদয়' (!) প্রভৃতি কাব্য দেখিতে পাওয়া যায়। মিলের খাতিরে মিল্টনের 'Tale of Troy', ডিকেন্সের 'Nicholas Knuckle-boy' ও রুষীয় গ্রন্থকার টলষ্টয়ের নাম গ্রহণ করা যাইতে পারে !

এক্ষণে প্রশ্ন—কাব্যখানির কেন এরূপ নামকরণ হইল? স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, নায়ক-নায়িকার নামে ইহার নামকরণ হইয়াছে; নায়িকা 'বোধা' ও নায়ক 'উদয়'। রমণীজাতিকে সম্মান দেখাইবার জন্য নায়িকার নাম পূর্ব্বে যায় (যাহাকে সংস্কৃত ব্যাকরণে পূর্ব্বনিপাত বলে)। এই নিয়ম সকল ভাষাতেই দেখা যায়; যেমন ইংরেজীতে Ladies and Gentlemen বলিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিতে হয়; সংস্কৃতে 'মালতীমাধব', মালবিকাগ্নিমিত্র', বাঙ্গালায় 'যুগলা-স্বুরীয়', 'সম্ভা-বশতক'। অনেকে 'সম্ভাব-শতক' ইত্যাকার অশুদ্ধ উচ্চারণ করেন! প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি, এই 'সম্ভা',—প্রভা, বিভা, প্রতিভা প্রভৃতি সুন্দরীগণের কনিষ্ঠা, রম্ভার গর্ভ-জাতা। নায়ক 'বশতক' করটক-দমনকের সাক্ষাৎ জ্যেঠতুত ভ্রাতা,—বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বহু অনুসন্ধানে স্থির করিয়াছেন। শেক্স্‌পীয়ার্ সব সময়ে তাল ঠিক রাখিতে পারেন নাই, তাই লিখিয়া ফেলিয়াছেন, 'Romeo & Juliet', 'Antony & Cleopatra' ইত্যাদি; এই জন্যই ব্রাউনিং আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন,—'Did Shakespeare? If so, the less Shakespeare he!' (দেখিলেন আমার ইংরেজীসাহিত্যে অধিকার!)

সমালোচ্য গ্রন্থের নায়িকা 'বোধা' সম্ভবতঃ বৌদ্ধভিক্ষুণী, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বৌদ্ধধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থ অনুসন্ধেয়। নায়ক 'উদয়'—শিলাদিত্যের পুত্র উদয়াদিত্য (অস্তাদিত্যের জ্যেষ্ঠ), কি উদয়পুরের রাণা উদয় সিংহ, কি সংস্কৃত কাব্যে বর্ণিত রাজা উদয়ন ('টের্লোপো ডিতি' এই সূত্রে নকারলোপ), কি প্রসিদ্ধ কুসুমাঞ্জলি-নামধেয় অন্বর্থনামা কাব্যখানির (!) প্রণেতা উদয়নাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, তাহা সঠিক জানি না; সমস্যাপূরণের জন্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর নাই;

তাম্রশাসন, উৎকীর্ণ লিপি, অথবা প্রাচীন পুঁথি-দৃষ্টে তিনি অবশ্যই ইহার একটা কিনারা করিয়া দিতে পারিবেন। শেষোক্ত সিদ্ধান্তটি সমীচীন বলিয়া প্রমাণিত হইলে, এই 'আচার্য্য' উপাধিটির বেমালুম লোপে আপনারা উৎকণ্ঠিত হইবেন না। কোটপ্যাণ্টধারী মানব যেমন হস্তদ্বয় কোথায় রাখিবেন ঠিক পান না, পশুরা যেমন লাঙ্গুল লইয়া শশব্যস্ত (ডারউইন্-তত্ত্বে উভয় দৃষ্টান্তের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ঐক্যসূত্র আছে), সেইরূপ এই 'আচার্য্য' উপাধি লইয়া সময়ে-সময়ে অনেক গোলযোগ ঘটে। ইহার কখনও পূর্ব্বনিপাত (যথা সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের 'মায়াবাদ' পুস্তকে আচার্য্য-শঙ্কর), কখনও পরনিপাত (ইহাই সাধারণ নিয়ম), এবং কখনও বেমালুম লোপ ঘটে (আধুনিক দৃষ্টান্ত বিরল নহে)।"

এই ত গেল কাব্যের নামতত্ত্ব। মল্লিনাথ অভিজ্ঞান-শকুন্তলের নাম লইয়া কত ঘনঘটা করিয়াছেন; আর দেখুন, আমি কত সহজে, কত অল্প কথায়, 'বোধোদয়' নামের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিলাম। এই মৌলিক গবেষণাত্মক প্রবন্ধটি পরিষৎ-পত্রিকার অতিরিক্ত সংখ্যায় মুদ্রিত করিয়া বঙ্গসাহিত্যের গৌরববৃদ্ধি করা অবশ্যকর্ত্তব্য নহে কি?

গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদটি লইয়া শ্রীযুত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অনেক রঙ্গরস করিয়াছেন। পাঠকেরাও ইহার একটা ভাসা ভাসা অর্থ বুঝেন। অথচ ইঁহারাই আবার বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠে'র প্রথম পরিচ্ছেদ পড়িয়া ভাবে বিভোর হইয়া পড়েন। হায় রে পক্ষপাত! সে যে বামুনপণ্ডিত বিদ্যাসাগর, মাথা কামান, পায়ে তালতলার চটি; আর এ যে বঙ্কিম চট্টো, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্! কিন্তু সেই পাকা কলমের পাকা লেখা একবার প্রণিধান করিয়া পড়ুন দেখি।

'পদার্থ তিন প্রকার, চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ্।' এই 'পদার্থ'

জিনিশ্‌টা কি, একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? এই 'পদার্থ', এই 'কিমপি বস্তু', এই 'মহাদ্রব্যম্‌', কবি ও কাব্যের প্রধান উপজীব্য প্রেম ভিন্ন আর কিছুই নহে। অপদার্থ বঙ্গীয় পাঠক ইহা বুঝিল না। এখন দেখুন দেখি—প্রেম তিন প্রকার নহে কি?

(১) চেতন, যে প্রেম ইচ্ছামত এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমনাগমন করিতে পারে; 'যে যাহারে ভালবাসে সে যাইবে তা'র পাশে'; যথা বসন্তসেনার প্রেম, শূর্পণখার প্রেম, 'বিষবৃক্ষে'র হীরার প্রেম, আয়েষার নিশীথে বন্দীসহবাস, বিমলার 'আমি এখন অভিসারে গমন করিব'! আর কত দৃষ্টান্ত দিব? পূর্ণিমা-সম্মিলনে সম্মিলিত ভদ্রমণ্ডলীর প্রেম এই জাতীয়, উচিত কথা বলিব, ভয়-ডর কি? তাঁহারা যখন ইচ্ছা সভামণ্ডপে আসিতে ও তথা হইতে প্রস্থান করিতে পারেন; ইহা স্বাধীন-যৌবনার প্রেম!

(২) অচেতন, যাঁহার সংজ্ঞা নাই, সাড়া নাই, ডাকিলে উত্তর পাওয়া যায় না, 'নাড়িলে না নড়ে রামা, এ কেমন প্রেম?' যথা, বঙ্গগৃহে বালবধূর প্রেম। (সভায় এই মধুমাসে নববিবাহিত যুবক কি কেহ নাই যে, আমার এ কথায় সায় দিবেন?) এ স্থলে একটি উদাহরণই যথেষ্ট, কারণ ভারতচন্দ্র বলিয়া গিয়াছেন, 'বরমেকাহুতিঃ কালে', ইংরেজীতে বলে Brevity is the soul of wit!

(৩) উদ্ভিদ্‌, যে প্রেম মাটীতে শিকড় গাড়িয়া আছে, ঠাঁইনাড়া হইতে চাহে না, যেখানে অঙ্কুরিত হয়, সেইখানেই পল্লবিত পুষ্পিত ফলিত হয়, 'দিনে দিনে সা পরিবর্দ্ধমানা' 'সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব'। এই প্রেম আদর্শ হিন্দু গৃহিণীতে প্রত্যক্ষ করেন নাই কি? 'লতায়ে লতায়ে যায়, ভ্রমরে তুষি সুধায়, লাজে অবনতমুখী তনুখানি আবরি'; 'থাকে পতিমুখ চেয়ে মধুমাখা সরমে।' অনেক হিন্দু পুরুষেও ইহা প্রত্যক্ষ করা যায়;

যাহারা গৃহকোণ ছাড়িয়া অন্তকার সভাক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে পারেন নাই, তাঁহারা ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ!

এই উদ্ভিদ-জাতীয় প্রেম পোড়া বাঙ্গালীজীবনের সাররত্ন, ইহারই গুণে বাঙ্গালীর ঘরের লক্ষ্মী এখনও ঘরের লক্ষ্মী আছেন, সভ্যসমাজের রমণী-কুলের ন্যায় জঙ্গমতীর্থে পরিণত হয়েন নাই। যেমন উদ্ভিজ্জ আহার (vegetable diet) শ্রেষ্ঠ আহার, তেমনই এই উদ্ভিদ-জাতীয় প্রেমই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, উভয়ই সাত্ত্বিক প্রকৃতির। আসুন, আমরা সকলে এই প্রেমের জয়-ঘোষণা করিয়া আজিকার মত পালা শেষ করি।

কৃষ্ণ-ক...

(সাহিত্য, আশ্বিন ১৩১...

শ্রীবৃন্দাবন-লীলা সাঙ্গ হইয়াছে; ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এখন দ্বারকায় রাজা। আর সে বনে-বনে ধেনু চরান, বনফলে উদর পূরান, বনফুলের মালা গাঁথা, থাকিয়া থাকিয়া রাধানামে সাধা বাঁশী বাজান, যমুনাকূলে কেলিকদম্বমূলে পরকীয়া-প্রীতি সে সব কিছুই নাই। এখন কেবল রাজতক্তে বসিয়া চামরের বাতাস খাওয়া, আর চাটুকারের চাটুবাণীতে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করা। তাহার পর প্রহরে প্রহরে চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয়, রাজভোগ। এত রাজসম্পদ্, এত ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে করিতে যে 'রাখালরাজ সেই বংশীধারী'র মনে একটু বিকার, একটু মদগর্ব্ব হয় নাই, সে কথাও বলা যায় না। নরলীলা করিতে গেলে যে দেবতারও একটু দুর্ব্বলতা, একটু মতিভ্রংশ আসিয়া পড়ে।

দ্বারকার প্রজারা যখন রাজভক্তির উচ্ছ্বাসে নূতন রাজার জন্মোৎসব-উপলক্ষে ঘরে ঘরে আমোদ-প্রমোদের আয়োজন করিতেছে, তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আদেশ করিলেন, "এক বৃহৎ অন্নসত্র বসাও, তাহাতে জগতের সমুদয় প্রাণী স্ব স্ব রুচির অনুরূপ সুখাদ্য উদর পূর্ণ করিয়া খাইতে পাইবে, এইরূপ ব্যবস্থা থাকিবে। 'চব্বিশ প্রহর' ধরিয়া এই 'অন্নকূট মহোৎসব' চলিবে। অকাতরে অর্থ ব্যয় কর, আমার রাজ-ভাণ্ডারে অভাব কিসের?" আদেশমাত্র কর্ম্মচারিবর্গ সমস্ত আয়োজন করিল। স্বয়ং ভগবান্ সুবর্ণরথে আরোহণ করিয়া বিশাল অন্নক্ষেত্র পরি-দর্শন করিয়া গেলেন। দেবগণ স্বর্গ হইতে দ্বারকাপতির অতুল বিভব

দেখিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের মনে কনিষ্ঠের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া ঈর্ষ্যার সঞ্চার হইল কি না, কে জানে?

অন্নসত্রে পৃথিবীর সর্ব্বজীবের প্রবেশের সময় উপস্থিত। এমন সময় গরুড় স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়া সত্রের দ্বারে দণ্ডায়মান হইলেন, এবং প্রবেশের অনুমতি চাহিলেন। অন্ন নিমন্ত্রণক্ষেত্রে অবারিত দ্বার, কেহই গরুড়ের পথ রোধ করিল না। গরুড় শনৈঃ শনৈঃ সজ্জিত অন্নস্তূপের সমীপবর্ত্তী হইয়া তিন গ্রাসে রাশীকৃত ভোজ্য নিঃশেষ করিলেন। দেবতারা সবিস্ময়ে গরুড়ের কার্য্য দেখিতে লাগিলেন। সত্রের কর্ম্মচারীরা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রাজদরবারে সংবাদ দিল।

এই অভাবনীয় সংবাদ পাইবামাত্র ভগবান্ রথারূঢ় হইয়া অন্নসত্রে আসিয়া পঁহুছিলেন। বহুদিন পরে গরুড়কে দেখিয়া বৈকুণ্ঠের কথা মনে পড়িয়া গেল, ভগবান্ উন্মনাঃ হইলেন; মানুষী মায়ায় অভিভূত ভগবানের চক্ষুঃ হইতে দরদরধারে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। মহাভক্ত গরুড়ও প্রভুকে পাইয়া হর্ষগদ্গদ হইয়া চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ এই ভাবে গেল। ভক্ত ও ভগবান্ উভয়েই আত্মহারা। কাহারও চোখের পলক পড়ে না। মুহূর্ত্ত-পরে ভগবান্ শূন্য অন্নস্থালীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, “হায়! হায়! গরুড়, কি করিলে? আমি যে জগতের নিখিল জীবকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি, ভোজনবেলা উপস্থিত, বুভুক্ষু অতিথি দ্বারে, কিরূপে তাহাদের ক্ষুধা শান্ত করিব? আমার দারুণ অধর্ম্ম হইবে, আমার ‘করুণাময়’ নামে কলঙ্ক পড়িবে।” গরুড় বলিলেন, “প্রভু! বিচলিত হইবেন না। নরলোকে বাস করিয়া আপনার নির্ম্মল সাত্ত্বিক প্রকৃতিতে রজোগুণের ঈষৎ ছায়া পড়িতেছিল, রাজভোগে প্রমত্ত হইয়া আপনার হৃদয় বিষয়মদে আচ্ছন্ন হইতেছিল, অতুল বিভব প্রদর্শন করিয়া গৌরবলাভের আকাঙ্ক্ষায় আপনি

এই মহাযজ্ঞের আয়োজন করিয়াছিলেন; আপনাকে দেখাইলাম, পার্থিব সম্পদ্ কি অকিঞ্চিৎকর! প্রকৃত অতিথিসৎকারে ব্যাঘাত ঘটিবে না, আমি তাহার উপায় করিয়া দিতেছি।"

এই বলিয়া গরুড় বিশাল পক্ষ-বিস্তার-পূর্ব্বক আকাশমার্গে উড্ডীন হইয়া চক্ষুর নিমেষে চন্দ্রলোকে প্রস্থান করিলেন এবং তথা হইতে অমৃতভাণ্ড আহরণ করিয়া গগনতল হইতে সুধাবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ধরাধামের নিখিল বুভুক্ষু প্রাণী পরিতৃপ্ত হইল; ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্রান্তি, অবসাদ সমস্তই দূর হইল। ভগবান্ আনন্দে বিহ্বল হইয়া গরুড়কে কোল দিলেন।

২

ইহার পর কিছু দিন গেল। ভগবান্ ষোড়শসহস্র রাণী লইয়া বিহার করিতেছেন। কিন্তু মনে শান্তি নাই। রাণীদিগের মান, অভিমান, কলহ-কোলাহল, ঈর্ষ্যা-দ্বেষ সময়ে সময়ে প্রবল হইয়া উঠে। তখন সেই অশান্তির মধ্যে কেবল অচলা লক্ষ্মীসদৃশী রুক্মিণী-সত্যভামার নিষ্কাম সেবায় ও পতিভক্তিতে চিত্তের চাঞ্চল্য প্রশমিত হয়। যখন হৃদয় নিতান্ত অশান্ত হয়, তখন পুরী-সংলগ্ন বৃক্ষবাটিকায় কুসুমচয়ন করেন, এবং আনমনে ভ্রমর-ভ্রমরীর গুঞ্জন-প্রেমাভিনয় দেখিতে দেখিতে ব্রজের কথা মনে পড়ে। রুক্মিণী-সত্যভামা আড়াল হইতে পতির ভাব দেখেন, নিকটে আসিতে সাহস করেন না। ভগবান্ কতবার মনে করিয়াছেন, দৈবী শক্তি প্রকাশ করিয়া রাণীদিগকে স্তম্ভিত করেন; কিন্তু পাছে তাহাতে আবার রজোগুণের বিকাশ হয়, এই ভাবিয়া নিরস্ত হয়েন। গরুড়-প্রদত্ত শিক্ষার পর তিনি অন্তর হইতে রাজসিক ভাব একেবারে উন্মূলিত করিয়াছেন।

একদিন ষোড়শসহস্র রাণীর আদর-আব্দার সহ্য করিতে না পারিয়া

তিনি পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া পুষ্পোদ্যানে পরিভ্রমণ করিতেছেন, এবং মুগ্ধনয়নে প্রকৃতির শোভা নিরীক্ষণ করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন, এক ভ্রমর-দম্পতীর মধ্যে প্রণয়কলহের সূত্রপাত হইয়াছে। প্রণয়িনী কুপিতা ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জিতেছেন, প্রণয়ী তটস্থ। ভগবান্ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে ভাবিলেন, "হায়! যে মায়ায় আমি বদ্ধ, এই সামান্য ভ্রমর-পতঙ্গও দেখিতেছি সেই মায়ায় বদ্ধ। দেখি, ইহাদের কি অবস্থা দাঁড়ায়?"

ভ্রমর কিছুক্ষণ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া যখন দেখিল, প্রণয়িনীর স্বর ক্রমেই পঞ্চম হইতে সপ্তমে উঠিতেছে, তখন বেশ বুঝিল, পুরুষোচিত পরুষ-ভাব অবলম্বন না করিলে ইহার নিবৃত্তি হইবে না। এই সিদ্ধান্ত করিয়া সে চোখ ঘুরাইয়া মুখ বাঁকাইয়া রোষভরে বলিয়া উঠিল, "জান, আমি মানুষের ন্যায় দুর্ব্বল দ্বিপদ নহি, নির্ব্বোধ পশুদিগের ন্যায় চতুষ্পদও নহি, আমি ষট্পদ; ইচ্ছা করিলে পদাঘাতে পৃথিবী রসাতলে দিতে পারি। তুমি অবলা স্ত্রীজাতি, আমার সঙ্গে বলপরীক্ষা করিতে আস?" শুনিয়া ভ্রমরীর তর্জ্জনগর্জ্জন থামিয়া গেল। মুখে আর রা নাই। সুড়-সুড় করিয়া ভ্রমরের বামপার্শ্বে বসিয়া মধুপানে প্রবৃত্ত হইল।

ভগবান্ এইরূপ 'বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া' দেখিয়া ত একেবারে অবাক্! তিনি অতি সন্তর্পণে ভৃঙ্গরাজকে কনিষ্ঠ অঙ্গুলিতে উঠাইয়া লইয়া অন্তরালে আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, তুমি এখনই ভ্রমরীকে যে ভয়প্রদর্শন করিলে, সত্যসত্যই কি তোমার সে শক্তি আছে?" ভ্রমর করযোড়ে মৃদুস্বরে বলিল, "প্রভু, আমার শক্তি বা শক্তিহীনতা কি আপনার অজ্ঞাত? কি করি? এইরূপ উপচারের আশ্রয় না লইলে যে মানভঞ্জন হয় না। শাস্ত্রকারেরাও নাকি এইরূপ মিথ্যাকথায় পাপ নাই বলিয়া গিয়াছেন।" ভগবান্ মৃদু হাসিয়া ভৃঙ্গরাজকে ছাড়িয়া দিলেন। সে উড়িয়া গিয়া ভ্রমরীর পাশে বসিল।

এই ঘটনা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের একবার মনে হইল, "আমিও ত এই উপায়ে কলত্রবর্গকে বশীভূত করিতে পারি। আমার পক্ষে এরূপ ভয়-প্রদর্শন মিথ্যাচরণও ত হইবে না।" আবার মনে হইল, "না, এ ত রজোগুণের ক্রিয়া, এ চিন্তাকে মনে স্থান দিব না। পুরুষোচিত গাম্ভীর্য্যের সহিত অশান্তি সহিয়া থাকিব, স্থিরচিত্ততাই ত সত্ত্বগুণের প্রকৃত লক্ষণ।"

এখন, ঘটনাটি রুক্মিণী-সত্যভামা আড়াল হইতে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাঁহারা একটা মতলব আঁটিয়া ভ্রমরীকে বসনাঞ্চলে উড়াইয়া গৃহাভ্যন্তরে লইয়া আসিলেন। তাহার পর দুই সখীতে যুক্তি করিয়া ভ্রমরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, তুমি যে তোমার প্রণয়ীর আস্ফালন শুনিয়া একেবারে নির্ব্বাক্ হইলে? তুমি কি সত্যসত্যই বিশ্বাস কর যে, সেই বীরপুরুষ এক পদাঘাতে পৃথিবী রসাতলে দিতে পারে?" ভ্রমরী একটু মুচ্‌কি হাসিয়া বলিল, "ঠাকুরাণী, আমি কি বুঝি না যে, ভৃঙ্গরাজ কেবল মুখসাপটে দড়? বুঝিয়াও চুপ করিয়া যাই। আপনারাও ত ঘরকন্না করিতেছেন, আপনারা কি জানেন না যে, পুরুষের কাছে হার না মানিলে বড় হায়রান হইতে হয়?" কথাটা শুনিয়া একমুখ হাসিয়া তাঁহারা বলিলেন, "তোমাকে এক কর্ম্ম করিতে হইবে। এবার ভ্রমর ওরূপ ভয় দেখাইলে, তুমি বলিবে যে, 'আচ্ছা, তোমার যাহা সাধ্য থাকে, তাহাই কর।'—আমরা একটু রঙ্গ দেখিব।" ভ্রমরী ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া উড়িয়া গেল।

ভ্রমরী কলহ বাধাইতে অদ্বিতীয়। অর্দ্ধদণ্ড না যাইতেই আবার সেই প্রণয়-কলহ। সেই কথাকাটাকাটি, মাথাকুটাকুটি, সেই তর্জ্জন-গর্জ্জন। যথাকালে ভ্রমরের সেই ভয়প্রদর্শন। আর রুক্মিণী-সত্যভামার শিক্ষামত ভ্রমরীর সাঙ্ঘাতিক উত্তর। ভ্রমর সে কথা শুনিয়া ত একেবারে

আকাশ হইতে পড়িল! উপায়ান্তর না দেখিয়া একেবারে শ্রীকৃষ্ণের চরণে লুটাইয়া পড়িয়া বিপদ্‌বার্ত্তা জানাইল।

লীলাময় দেখিলেন যে, ভ্রমরের জিদ্ বজায় না থাকিলে পুরুষজাতির গৌরব চিরদিনের মত ক্ষুণ্ণ হয়। ভবিষ্যতে আর স্ত্রী স্বামীকে মানিবে না, সংসারযাত্রা-নির্ব্বাহ দায় হইয়া উঠিবে। তিনি আপদুদ্ধারকল্পে গরুড়কে স্মরণ করিলেন।

গরুড় ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গপ্রণিপাত করিয়া করযোড়ে জিজ্ঞাসিলেন, "প্রভু, অধীনকে অদ্য কি জন্য স্মরণ করিয়াছেন?" শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত ব্যাপার গরুড়কে শুনাইলেন। গরুড় বলিলেন, "প্রভু, এখন আমাকে কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।" ভগবান্ বলিলেন, "যখন ভ্রমর ভূমিতে প্রথমবার পদাঘাত করিবে, তখন তুমি দ্বারকাপুরী রসাতলে প্রেরণ করিবে; আবার যখন ভ্রমর দ্বিতীয়বার ভূমিতে পদাঘাত করিবে, তখন তুমি দ্বারকাপুরী রসাতল হইতে উদ্ধার করিয়া যথাস্থানে স্থাপন করিবে। তাহা হইলেই আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।" গরুড় তাহাই করিতে স্বীকৃত হইলেন।

সাহস পাইয়া ভ্রমর আবার উড়িয়া গিয়া ভ্রমরীর গায়ে পড়িয়া ঝগড়াটা পাকাইয়া তুলিল। ভ্রূকুটী করিয়া বলিয়া উঠিল, "কি, এত বড় আস্পর্দ্ধা! আমার সঙ্গে সমান উত্তর? তবে দেখিবে?" এই বলিয়া ভ্রমর সজোরে ভূমিতে পদাঘাত করিল। বৃক্ষে-বৃক্ষে কুসুমকিশলয় কাঁপিয়া উঠিল। গরুড়ও প্রস্তুত ছিল; তৎক্ষণেই দ্বারকাপুরী রসাতলে নীত হইল। আর্ত্ত নরনারীর কোলাহলে দিগ্‌বলয় মুখরিত হইল। ভ্রমরী ভয়ে মৃতপ্রায় হইয়া ব্যাকুলকণ্ঠে ভ্রমরকে বলিল, "ক্রোধং, প্রভো, সংহর সংহর।" তখন ভ্রমর ভ্রমরীর বাক্যে শান্ত হইয়া পুনরায় ভূমিতে পদাঘাত করিল। তৎক্ষণাৎ গরুড় দ্বারকাপুরী রসাতল

হইতে উদ্ধার করিয়া যথাস্থানে স্থাপন করিলেন। ভ্রমর-ভ্রমরীর কলহ মিটিয়া গেল।

এ দিকে এই প্রলয়ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শসহস্র রাণীর মুখ ভয়ে পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। তাঁহারা কম্পমানকলেবরে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে 'বিপত্তৌ মধুসূদনম্' স্মরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়ভিক্ষা করিতে ছুটিলেন। পথিমধ্যে রুক্মিণী-সত্যভামার সঙ্গে দেখা। তাঁহাদিগকে দেখিয়া রাণীরা সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "দিদি, এ কি সর্ব্বনাশ! কেন এমন বিনামেঘে বজ্রাঘাত হইল?" রুক্মিণী-সত্যভামা গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "জান না, ভ্রমরীর কলহে ভ্রমরকে মনঃক্ষুণ্ণ দেখিয়া প্রভু সৃষ্টি রসাতলে দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পরে অনুতপ্তা ভ্রমরীর অনুরোধে প্রভু ক্রোধ-সংবরণ করিয়াছেন। তোমরা কি জান না, পতিপত্নীতে অপ্রীতি ঘটিলে সৃষ্টি রসাতলে যায়?"

রুক্মিণী-সত্যভামার কথা শুনিয়া ষোড়শসহস্র রাণী এ উহার মুখপানে চাহিতে লাগিলেন। সকলেরই মনে এক কথা। "আমরা যে প্রতি-নিয়তই প্রভুর সঙ্গে কলহ করি। ধন্য তাঁহার প্রেম যে, তিনি ইহা সহ্য করিয়া থাকেন। হায়, আমরা এতদিন এমন উদার প্রেমের, এমন ধৈর্য্যশালিতা ও ক্ষমাশীলতার মর্ম্ম বুঝি নাই।" এই ভাবিয়া তাঁহারা সকলেই গললগ্নীকৃতবাসে পরমপ্রভুর পা জড়াইয়া ধরিলেন, প্রকাশ্যে বলিলেন, "প্রভু, আমরা অজ্ঞান নারী, ক্ষমা করুন, আমরা আর কখনও আপনার সঙ্গে কলহ করিয়া আপনার প্রশান্ত-সাগর-সদৃশ হৃদয় সংক্ষুব্ধ করিব না।" শ্রীকৃষ্ণ সবিস্ময়ে চাহিলেন; দেখিলেন, স্মিতমুখী রুক্মিণী-সত্যভামা সম্মুখে দাঁড়াইয়া। চোখের ঈশারায় কি কথা হইল, জানি না। 'ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন' সকল বুঝিলেন। বুঝিয়া 'অনেক-বাহুবক্ত্র' হইয়া তিনি প্রসন্নমনে ষোড়শসহস্র রাণীকে বাহুবেষ্টনে বাঁধিয়া

ফেলিলেন, এবং প্রীতিচিহ্নস্বরূপ তাঁহাদের বিম্বাধরে প্রণয়চুম্বন দিলেন। তাঁহারা আনন্দাতিশয্যে শিহরিয়া উঠিলেন।

পরম সতী রুক্মিণী-সত্যভামা ও পরম ভক্ত গরুড় অনিমেষলোচনে লীলাময়ের লীলা দেখিতে লাগিলেন, এবং আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। দেবগণ স্বর্গ হইতে সেই মধুর দৃশ্য দেখিয়া হর্ষাকুল হইলেন। আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইল, দিঙ্মণ্ডল প্রসন্ন হইল, মৃদুমন্দ সমীরণ বহিতে লাগিল—"দিশঃ প্রসেদুঃ মরুতো ববুঃ সুখাঃ"। ভগবানের চিদাকাশে সাত্ত্বিক ভাবের পূর্ণবিকাশে জগৎ আনন্দময় হইল; কলহ, বিবাদ, রাগ, দ্বেষ, মান, অভিমান, জগৎ হইতে তিরোহিত হইল। গরুড় করযোড়ে বলিলেন, "ঠাকুর, আমার মনস্কামনা পূরিয়াছে, এত দিনে আপনার সাত্ত্বিকী প্রকৃতির প্রভাবে মর্ত্তলোক শান্তিময় সুধাময় দেখিলাম, আপনার জয়জয়কার। ইচ্ছাময়, আপনার ইচ্ছায় যেন জগতে আজ হইতে চিরশান্তি বিরাজমান থাকে।" এই প্রার্থনা করিয়া গরুড় প্রভুর নিকট সবিনয়ে বিদায় লইয়া বৈকুণ্ঠে প্রস্থান করিলেন। ভগবান্ ষোড়শসহস্র রাণী ও রুক্মিণী-সত্যভামাকে লইয়া পরমানন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন। *

শ্রীকৃষ্ণচরিতং হ্যেতদ্ যঃ পঠেৎ প্রযতঃ শুচিঃ।
শৃণুয়াদ্ বাঽপি যো ভক্ত্যা গোবিন্দে লভতে [illegible]

'চিত্রাঙ্গদা'র আধ্যাত্মিক

(সাহিত্য, অগ্রহায়ণ ১৩১৬)

"চিত্রাঙ্গদা" কাব্যখানি সুনীতি কি দুর্নীতির প্রচার করিতেছে, নায়িকা অজাতোপযমা নবযৌবনা চিত্রাঙ্গদা সলজ্জা কি নির্লজ্জা, নায়ক মাতুলীকন্যাহারী কৃষ্ণসখা অর্জ্জুন লম্পট কি জিতেন্দ্রিয়, এবং কাব্যপ্রণেতা রবীন্দ্রনাথের রুচি সু কি কু, এই সব কথা লইয়া কয়েক মাস ধরিয়া সাহিত্যের আসরে একটা ঘোঁট চলিতেছে। রবীন্দ্রনাথের যশঃ-সূর্য্যের কালমেঘরূপে দ্বিজেন্দ্রলাল 'সাহিত্য'-আকাশে উদিত।*

জড়জগতে চন্দ্র-সূর্য্য একত্র প্রকাশ পায় না। উভয়ের বিরোধ ঘটিবে আশঙ্কা করিয়াই বোধ হয় বিধাতা কালবিভাগ করিয়া দিয়াছেন। 'The greater light to rule the day and the lesser light to rule the night' এই বিধানে সংসার সুশৃঙ্খলায় চলিতেছে। কিন্তু কাব্য-জগতে এ বিধান না থাকাতে রবি-শশী [রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র] এক সঙ্গেই উদিত : ফল, ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এখন উপায় কি? সাহিত্যসালিশীগণ যদি বিধাতার বিধানের নজীরে নিষ্পত্তি করিয়া দেন যে, একজন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে উপাসনায় প্রভাতকাল, ছাত্রমণ্ডলীকে শিক্ষাদানে দিবামানের অধিকাংশ

* এই প্রবন্ধপাঠের পূর্ব্বে পাঠক মহাশয়কে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-লিখিত 'কাব্যে নীতি' (সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬), শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার-লিখিত 'কাব্যে সমালোচনা' (সাহিত্য, শ্রাবণ ১৩১৬), ও শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন-লিখিত 'চিত্রাঙ্গদা' (সাহিত্য, কার্ত্তিক ১৩১৬), এই প্রবন্ধত্রয় পাঠ করিতে অনুরোধ করি। নতুবা অনেকস্থলে রসভঙ্গ হইবে।

সময়, এবং সভাসমিতিতে প্রবন্ধপাঠে অপরাহ্নকাল কাটাইয়া to rule the day নিযুক্ত থাকুন, এবং অপর জন ঈভ্‌নিং-ক্লাবে সান্ধ্য মজলিস করিয়া স্বরচিত গান গাহিয়া, এবং রাত্রিকালে স্বরচিত নাটকের অভিনয় দেখিয়া to rule the night নিযুক্ত থাকুন, সে নিষ্পত্তিও যে বাদী প্রতিবাদী গ্রাহ্য করিবেন, এমন ত বোধ হয় না।

তবে কি বিবাদ-মীমাংসার কোনও পথ নাই? আছে। অশ্লীলতার 'চার্জ্জ' আমাদের সাহিত্যে নূতন নহে। ইহা অতি পুরাতন, সনাতন বলিলেও চলে। অনেক ইংরেজী-নবীশ ত ঐ অজুহাতে বাঙ্গালা-সাহিত্যের নামেই নাক তোলেন ও কাণে আঙ্গুল দেন। রুচিবাগীশ-দিগের মতে সমগ্র বৈষ্ণবসাহিত্য তথা শাক্তশৈবগণের তন্ত্রশাস্ত্রাদি এই অশ্লীলতাবিষে জর্জ্জরিত। রুচিবায়ু অনেকটা শুচিবায়ুর মত। একবার আক্রমণ করিলে আর নিস্তার নাই, ক্রমে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতে হয়। শুচিবায়ুর প্রাবল্য ঘটিলে গঙ্গাজল ছিটান ভিন্ন উপায় নাই। রুচিবায়ুর প্রাবল্য ঘটিলে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার আশ্রয় লইলে সব ল্যাঠা চুকিয়া যায়। উভয়ই পতিতপাবনী। এই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার কল্যাণে পঞ্চ-মকার, পরকীয়া-প্রীতি, রাসলীলা সকলই উদ্ধার লাভ করিয়াছে। এই 'saving sprinkle with the holy water of allegory' প্রয়োগ করিয়া 'চিত্রাঙ্গদা'র কাব্যসৌন্দর্য্য পুনরুজ্জীবিত করা যায় না কি? চেষ্টা করিয়া দেখা যা'ক্। 'যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ?'

বাস্তবিক, ভাবুকের চোখে দেখিলে কাব্যখানি ('সোণার তরী'র ন্যায়) একটা বিরাট্ (হেঁয়ালি নহে) রূপক, যাহাকে ইংরেজীতে বলে allegory। কাব্যের ঘটনাস্থল 'মণিপুর'—টীকেন্দ্রজিতের লীলাভূমি আসামের সন্নিহিত স্থানবিশেষ নহে, ইহা বহুরত্নরাজিশোভিত বিশাল জগৎ, যাহাকে সংস্কৃতভাষায় 'বসুধা' বা 'বসুন্ধরা' বলে। অর্জ্জুন ও

চিত্রাঙ্গদা উনবিংশ শতাব্দীর সাধারণ বাঙ্গালী-দম্পতী। বাল্যবিবাহের পর কিরূপ ক্রম অবলম্বন করিয়া দাম্পত্যপ্রেম পূর্ণপরিণতি লাভ করে, তাহাই কাব্যের প্রতিপাদ্য বিষয়। অল্পে-অল্পে বুঝাইতেছি।

প্রথমেই দেখুন,—চিত্রাঙ্গদা চিত্রবাহনের কন্যা। চিত্রবাহন বাঙ্গালী পিতা; কখনও গরুর গাড়ী, কখনও পাল্কী, কখনও কেরাঞ্চি, কখনও ট্র্যাম, কখনও রেলগাড়ী, কখনও ষ্টীমার, কখনও (রেঙ্গুন যাইতে) জাহাজ চড়েন। চাকুরে বাঙ্গালী সৌখীন, কেরাণীগিরি বা মাষ্টারী করিলেও এক পা হাঁটেন না; এইখানে 'চিত্র-বাহন' নামের সার্থকতা। কন্যাকে আঁতুড়ঘর হইতে রঙ্গবেরঙ্গের ছিটের বা সিল্কের ফ্রক, বডিস্, জ্যাকেট, শেমিজ, গাউন, পার্শী শাড়ী, বোম্বাই শাড়ী, বেণারসী শাড়ী, আনারসী শাড়ী প্রভৃতি পরাইয়া সৌখীন করিয়া তোলেন। সুতরাং তাঁহারও 'চিত্রাঙ্গদা' নাম সার্থক।

তাহার পর, চিত্রাঙ্গদা চিত্রবাহনের একমাত্র সন্তান। চিত্রবাহনের পুত্র নাই। আজকাল বাঙ্গালীর ঘরে প্রায়ই সুপুত্র দেখা যায় না। অনেক পিতাই পুত্রের দুঃশীলতায় মরমে মরিয়া প্রার্থনা করেন, পুত্রে কায নাই, কন্যাই ভাল। কন্যার মায়াদয়া থাকে; পুত্র বিবাহ করিলেই পর হইয়া যায়। সেই জন্য আদর্শ (ideal) পিতা চিত্রবাহন অপুত্রক। 'অজাত-মৃত-মূর্খাণাং বরমাদ্যৌ ন চান্তিমঃ।' ইহা অপেক্ষা দৌহিত্রের হাতে পিণ্ডের আশা করাই ভাল।

চিত্রবাহন চিত্রাঙ্গদাকে পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন করিয়াছেন। করিবেন না? মনুর উপদেশই যে 'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।' অস্যার্থঃ, কাশীদাস,—'পুত্রবৎ করি কন্যা করিবে পালন।' আদর্শ বাঙ্গালী পিতা কন্যাকে স্কুলে পাঠান, পুঁতুলখেলা ছাড়াইয়া স্বাস্থ্যের জন্য ছেলেদের সঙ্গে ছুটাছুটি খেলান, ইতিহাস-ভূগোল পড়ান, বিশ্ববিদ্যালয়ের

পরীক্ষা দেওয়াইয়া তাহার প্রকৃতি পুরুষের ন্যায় পরুষ করিয়া তোলেন। সবই কাব্যে বর্ণিত চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে ঠিক-ঠিক মিলিতেছে।

অর্জ্জুন আদর্শ বাঙ্গালী বর (বীর নহেন)। অর্জ্জনের জন্যই তাঁহার জীবনধারণ ও বিবাহবন্ধন, অতএব তিনিও সার্থকনামা।

তাহার পর কাব্যের প্রথম স্তর, অরণ্যে চিত্রাঙ্গদার অর্জ্জুনের দর্শন-লাভ ও অর্জ্জুনকর্ত্তৃক তাঁহার প্রত্যাখ্যান। এ স্থলে বাল্যে শুভব্রাহ্ম-বিবাহবদ্ধ বর-বধূর প্রথম আলাপ রূপকরূপে (allegorically) বর্ণিত। বঙ্গীয় বর ছাত্র অর্থাৎ ব্রহ্মচারি-অবস্থায় বিবাহ করে, তখন সে অনাসক্ত-চিত্তে স্কুলের পড়া মুখস্থ করিতেছে, বালিকাবধূর আত্মসমর্পণ তখন তাহার নিকট 'অরণ্যে রোদন'। [কবি কেমন সুকৌশলে অরণ্যে এই দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছেন!] তখন সেই চেলীর পুঁটুলির ভিতর এমন কিছুই রূপরসগন্ধ থাকে না যে, যোগিবর তাহা দ্বারা আকৃষ্ট হইবেন। তখন তাহার অবয়বে কোনও স্ত্রীচিহ্ন প্রকটিত হয় নাই; কাযেই কবির কথায় সে 'বালকমূর্ত্তি।' শরীরতত্ত্বও নাকি এ কথায় সায় দেয়।

বালিকা হইলেও তাহার পক্ষে এরূপ আত্মসমর্পণ স্বাভাবিক ও শোভন। চিত্রাঙ্গদা যে পার্থকে বাল্যাবধি ধ্যানজ্ঞান করিয়াছেন, তিনিই, সেই মানসদেবতাই, আদর্শপুরুষরূপে সম্মুখে উপস্থিত। হিন্দুকন্যা বাল্যকাল হইতেই পতিলাভের জন্য শিবপূজা করে; বাল্যকাল হইতেই পতির মানসী মূর্ত্তি পূজা করে, পতিকে পরমদেবতা বলিয়া জানে; তাহার শিক্ষাই এইরূপ, সে হিন্দুর মেয়ে। শুভদৃষ্টির সময়েই সে আত্ম-সমর্পণ করিয়া ফেলে; [বর কিন্তু—'শুধু ক্ষণেকের তরে চাহিলা মুখপানে, নাচিল অধরপ্রান্তে স্নিগ্ধ গুপ্ত কৌতুকের মৃদু হাস্যরেখা, বুঝি সে বালকমূর্ত্তি হেরিয়া'।] ইহা যদি নির্লজ্জার ব্যবহার হয়, তবে ভগবান্ করুন, যেন এই নির্লজ্জতা হিন্দুকন্যার চিরভূষণ হয়। আদর্শ সতী

সাবিত্রী-দময়ন্তী যাহা করিয়াছিলেন, তাহাই আর্য্যাচার। তদতিরিক্ত যাহা, তাহাই ম্লেচ্ছাচার। [এটুকু প্রবন্ধলেখকের উচ্ছ্বাস, আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার অঙ্গ নহে।]

তাহার পর, কাব্যের দ্বিতীয় স্তর। বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই কন্যার নারীভাব জাগিয়া উঠে, বরের মন না পাইয়া সে মরমে মরিয়া যায়, আর আকুলহৃদয়ে প্রার্থনা করে, 'ঠাকুর, রূপ দাও যেন বরকে আপন করিয়া নারীজন্ম সার্থক করিতে পারি'। ঘরে ঘরে এই লীলা; কবির উদ্ভট সৃষ্টি নহে, তবে রূপকটা কবি-প্রতিভা-প্রসূত। মদন ও বসন্ত প্রার্থনা পূর্ণ করেন। যথাসময়ে শেলী-বায়রন্-পড়া বঙ্গীয় বরের কাছে বধূর যৌবন রূপের ডালি ধরে, নারীর নব-যৌবনের সেই স্বপ্নময় মোহময় আকর্ষণে অর্জ্জুনরূপী ছাত্রের ব্রহ্মচর্য্যব্রতভঙ্গ হয়, পাঠাভ্যাসে বিঘ্ন জন্মে, রূপজ প্রীতির বন্যায় তাঁহার হৃদয়-নদীর দুই কূল ভাঙ্গিয়া যায় এবং সেই স্রোতে তাঁহার সংযম, জিতেন্দ্রিয়তা ভাসিয়া যায়। (ও তিনি যথাসময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ফেল হইতে আরম্ভ করেন—অতি প্রত্যক্ষ ঘটনা!) নারীর এই বয়ঃসন্ধিকাল, 'শৈশব যৌবন দুঁহু মিলি গেল' লইয়া সমগ্র বৈষ্ণব-সাহিত্য মস্‌গুল। * কুরূপা চিত্রাঙ্গদাকেও তখন সুরূপা দেখায়। অবশ্য মদনের এই দান দিবামানস্থায়ী বা বর্ষস্থায়ী নহে। ইহাও একটা রূপক—যতক্ষণ ভোগকাল, ততক্ষণ ইহার স্থিতি। [বাস্তবিক, কাল একটা নির্দ্দিষ্ট জিনিশ নহে, ইহা মানসিক অবস্থা দ্বারা পরিমিত; প্রেমিকের চক্ষে কখনও বা 'in a minute

* আধুনিক কাব্যে বৈষ্ণব-সাহিত্যের লালসা আছে, ভক্তিটুকু নাই। ইহাও একটা 'চার্জ্জ'। কিন্তু দোষ কি একা রবীন্দ্রনাথের? 'এই সেই নবদ্বীপে'র কবি কি নেড়ানেড়ীর আখ্‌ড়ায়ও সেই দশা ঘটিতে দেখেন নাই?

there are many days', কখনও বা 'অবিদিতগতযামা রাত্রিরেবং ব্যরংসীৎ', 'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্' ইত্যাদি ইত্যাদি।]

এই মিলনের স্থান শিবমন্দির। শিবমন্দির অবশ্য একটা রূপক। হিন্দুবিবাহে যে একটা নিরাবিল পবিত্রতা, একটা নিষ্কলঙ্ক শুভ্রতা, একটা শান্ত মঙ্গলজ্যোতিঃ আছে, শিবমন্দির তাহাই সূচিত করিতেছে। দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার পূর্ব্বরাগ ও প্রথম মিলন পবিত্র তপোবনে, আবার শেষ মিলনও পবিত্র তপোবনে। দুর্গেশনন্দিনী ও জগৎসিংহের প্রথম সাক্ষাৎকার শিবমন্দিরে। [পক্ষান্তরে ইংরেজ-নারীর প্রথম প্রেমসঞ্চার বল্-রুমে ঘটিয়া থাকে, টীকা অনাবশ্যক।] শিবমন্দিরে মিলন, বিষ্ণুমন্দিরে নহে; কেননা, শিবপূজা করিয়াই বালিকারা অভীষ্ট বর পায়। (বিয়েপাগলা বুড়া-শিব যে বিবাহের প্রকৃত মর্ম্মজ্ঞ!)

তাহার পর, কাব্যের তৃতীয় স্তর। যুবতীর রূপযৌবন চিরদিন থাকে না, রূপতৃষ্ণার নেশা ছুটিলে অতৃপ্তি আসে। অর্জ্জুনের সেই দশা ঘটিল। ইহারই ঝঙ্কার পুরুষকবি হেমচন্দ্রের 'এই কি আমার সেই জীবনতোষিণী?' তে শুনিতে পাই। যদি স্ত্রীকবি কনকতারা, রজত-ধারা বা ঐরূপ আর কেহ নারীর আত্মধিক্কার লিখিয়া যাইতেন, তাহা হইলে চিত্রের অন্য দিক্‌টাও দেখিতে পাইতাম। [সুরেন্দ্রনাথ হয় ত বলিবেন, hermaphrodite কবি হইলে দোতরফাই গাহিতে পারেন।] অর্জ্জুন এখন বুঝিয়াছেন, রূপের অতিরিক্ত একটা কিছু চাই, নতুবা মনকে বাঁধা যায় না, 'বুকে রাখিবার ধন দাও তারে', 'শুধু শোভা, শুধু আলো, শুধু ভালবাসা'য় পেট ভরে না। চিত্রাঙ্গদাও বুঝিয়াছে, রূপের রজ্জুতে বাঁধিয়া সুখ নাই, সেও রূপের অতিরিক্ত একটা কিছুর জোরে পতির হৃদয় বাঁধিতে চাহে। এই আত্মধিক্কার সকল বুদ্ধিমতী বঙ্গনারীই অনুভব করেন—আমার রূপযৌবন যতদিন, পতির ভালবাসাও

ততদিন; তিনি আমাকে ভালবাসেন না, আমার রূপযৌবনকে ভালবাসেন। কবে তিনি 'আমাকে' ভালবাসিবেন?—ইহাই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা। ইহাই প্রকৃত আত্মার মিলন। দেহের মিলন ইহার নিম্ন সোপান। পীরিতি-লতা অন্যান্য লতার ন্যায় রূপকাঠি-অবলম্বনে বাড়িতে থাকে, তখন সেই রূপকাঠিই তাহার মরণকাঠি জীবনকাঠি; কিন্তু তাহার পর মাচায় বা গৃহের চালে ছড়াইয়া পড়ে, তখন সেই ফলফুল-শোভিতা শাখাপ্রশাখাযুক্তা লতা প্রৌঢ়া সন্তানবতী গৃহিণীর বেশে গৃহ আলোকিত করে। মূল গল্পে (মহাভারতে) চিত্রাঙ্গদার সন্তান-জন্মের পরেই অর্জ্জুন তাঁহাকে ছাড়িয়া যান; কেননা, সচরাচর দেখা যায়, সন্তান-লাভের পরই বাঙ্গালীরমণীর রূপ ঝরিয়া যায় (সুরুচির খাতিরে গ্রাম্যপ্রবাদবাক্য উল্লেখ করিতে পারিলাম না), রেশমের গুটী কাটিয়া শুঁয়াপোকা বাহির হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কল্পনা অনেক উচ্চে। তিনি রূপজ মোহের উর্দ্ধে যে আর একটা গাঢ়তর দাম্পত্য-প্রেম আছে, তাহা দেখাইয়াছেন। ইহাই কাব্যের চতুর্থ স্তর।

কিছু দিন হইতেই অর্জ্জুন রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার গুণের ব্যাখ্যান লোকমুখে শুনিতেছেন। 'স্নেহে তিনি রাজমাতা বীর্য্যে যুবরাজ।' 'কর্ম্মকীর্ত্তি বীর্য্যবল শিক্ষা দীক্ষা তাঁর।' 'বীর্য্যসিংহ 'পরে চড়ি জগদ্ধাত্রী দয়া।' অর্জ্জুন এই গুণবতী নারীর প্রতি আগ্রহান্বিত, তিনি জানেন না যে ইনিই তাঁহার সহচরী। রূপে তৃপ্তি হয় নাই, তিনি আজ গুণের কাঙ্গালী। তাঁহার হৃদয় রূপরজ্জুর বন্ধনে বাঁধা না থাকিয়া গুণের বন্ধন চাহে। সমস্তটাই রূপক। ক্রমে বুঝাইতেছি।

জনশ্রুতি = পাড়াপড়সীর প্রশংসা, পুরনারীগণের ব্যাখ্যান। 'আহা বৌটি যেন লক্ষ্মী, মুখে কথা নাই, যেন দশ হাতে গৃহস্থালীর কাযকর্ম্ম করে, এমন কর্ম্মিষ্ঠা বধূ আজকালকার দিনে দেখা যায় না' ইত্যাদি।

বাঙ্গালীর মেয়ের বীর্য্য কিছু আর প্রমীলা বা নৃমুণ্ডমালিনীর মত লড়াই ফতে করিতে ধাবিত হইবে না। তাঁহার অশ্রান্ত শ্রমশীলতাই 'কর্ম্মকীর্ত্তি বীর্যাবল।' তিনি হিন্দুর আরাধ্যা শক্তিরূপিণী জগদ্ধাত্রী দেবী। এই গৃহ-'রাজ্যের রক্ষক রমণী।' একাধারে পুরুষের বীর্য্য, নারীর কোমলতা, ইহাই হিন্দু স্ত্রীতে দেখিতে পাই। (বঙ্কিমচন্দ্রের প্রফুল্লকে দেখুন)। কিন্তু অর্জ্জুন (বর) প্রথমে বুঝিতে পারেন না যে, এই বিচিত্র-কর্ম্মকুশলা চিত্রাঙ্গদা তাঁহার সহচরী হইতে অভিন্ন। একান্নবর্ত্তী হিন্দু-পরিবারে যে প্রেম-প্রতিমা 'অর্দ্ধরাত্রে স্তিমিতপ্রদীপে সুপ্তজনে শয্যাগৃহে' আসিয়া স্বামীর সহিত মিলিত হয়েন, যাঁহার রূপরশ্মি কেবল নিশাকালেই চন্দ্রতারার ন্যায়, মল্লিকা-শেফালিকার ন্যায়, ফুটিয়া উঠিয়া 'শুধু আলো, শুধু শোভা, 'শুধু ভালবাসা' ঢালিয়া দেয়, তাহার ভিতরে যে এত গুণ আছে, তাহা নবীনবয়সে যুবক পতি কিছুতেই বুঝিতে পারেন না। এসেন্স দেলখোসের সৌরভে যে ক্ষার-গোময়ের গন্ধ ঢাকা আছে, খস্‌খস্ সাবানের কৃপায় যে হাঁড়ীর কালী ধুইয়া গিয়াছে, চম্পককলি অঙ্গুলি-গুলি যে সারাদিন সংসারের যাঁতা ঘোরাইয়াছে, তাহা তিনি কিছুতেই বুঝিতে পারেন না। তাহার পর, যখন রূপতৃষ্ণার ঘোর কাটিয়া যায়, গুণের জন্য আকুলতা আসে—তখন বুঝেন যে, উভয় মূর্ত্তিই এক। এইখানেই সমাপ্তি। তখন কোর্টশিপের পালা সমাপ্ত। সেই দিন হইতে বর-বধূ গৃহী ও গৃহিণী হইলেন। এই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার অবসানে আমিও অর্জ্জুনের কণ্ঠে কণ্ঠ মিশাইয়া বলি,—'আহ ধন্য আমি!'

সমালোচনার পূর্ব্বে সমালোচ্য পুস্তকখানি একবার পাঠ করা আবশ্যক, এরূপ একটা কুসংস্কার (superstition) অনেকের আছে। কিন্তু আশা করি, আমার পাঠকবর্গ মার্জ্জিতরুচি

তাঁহাদের এরূপ কুসংস্কার নাই। গ্রন্থপাঠ না করিয়াও উৎকৃষ্ট সমালোচনা লিখিতে পারেন, বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে এরূপ তীক্ষ্ণবুদ্ধি সমালোচকের অভাব নাই। বিশেষতঃ যখন শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন মহাশয়ের প্রবন্ধে জানিলাম, দ্বিজেন্দ্রলাল কাব্যখানি পাঠ করিয়াও ভুল করিয়াছেন বা ভুলিয়া গিয়াছেন, তখন কাব্যপাঠ না করাই নিরাপদ্, ভুল হইবার সম্ভাবনা একেবারেই থাকিবে না। তবে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, পাকা সমালোচক সেন মহাশয় সমালোচনা-ব্যপদেশে যেরূপ নিপুণতার সহিত প্রায় সমস্ত কাব্যখানিই পুনর্মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে কাব্য-পাঠের পরিশ্রম-স্বীকার আর আবশ্যক হইতেছে না। উপসংহারে বলিয়া রাখি, এই প্রবন্ধের উৎকট মৌলিকতার জন্য কাব্যপ্রণেতা ও পূর্ব্ববর্ত্তী সমালোচকগণ দায়ী নহেন। ইহা নিরবচ্ছিন্ন খেয়াল কি ইহাতে সত্যের কোন ভিত্তি আছে, সে বিচারের ভার ভাবুক পাঠকবর্গের উপর।

বিরহ

(সাহিত্য, চৈত্র ১৩১৩)

চারি যুগে শুনি, গাহে জ্ঞানী মুনি,
গাহে কবি গুণী, বিরহের করুণ-কাহিনী।
কত হা হতাশ, কত দীর্ঘশ্বাস,
তীব্র জ্বালারাশ, তপ্তঅশ্রু নিরাশা-বাহিনী॥
সদা চারিধারে, ঘিরে' সারে সারে,
আছে বিরহেরে, স্মৃতি জাগে অন্তরদাহিনী।
কঠোরবচনে, কবিতারচনে,
শাপে জনে-জনে, নিঠুর সে পীরিতি-ডাহিনী॥

(লেখকের স্বহস্তপ্রস্তুত কবিতা !)

বাল্মীকীয় রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে, ভবভূতির উত্তররামচরিতে, হনূমদ্-বিরচিত মহানাটকে, কালিদাসের মেঘদূতে ও বৈষ্ণবকবি বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতির মধুরকান্তকোমল-পদাবলীতে বিরহব্যথার ব্যাখ্যান শুনিতে পাই। সত্য সত্যই কি বিরহ অসহ্যযন্ত্রণাময়? ইহাতে কি নাহি সুখলেশ, নাহিক উল্লাস, নাহিক আবেশ?

আমি ত দেখি, বিরহেই প্রেমিকের প্রকৃত শান্তিসুখ, বিরহেই মাধুর্য্য ও পবিত্রতা বিরাজ করিতেছে। মিলনে কেবল আকাঙ্ক্ষা, ভোগলিপ্সা, কেবল অতৃপ্তি উৎকণ্ঠা, 'সদা মনে হারাই হারাই।' বৈষ্ণবকবিরা ত প্রেমতত্ত্বের বিশেষজ্ঞ, অথচ তাঁহারাই মিলনসুখের কথা বলিতে গিয়া

কবুল করিয়া বসিয়াছেন, 'জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু, নয়ন না তিরপিত ভেল'। এ ত দারুণ অতৃপ্তি, অনন্ত পিয়াসের কথা। তবে আর মিলনে সুখ কোথায়?

কিন্তু প্রেমিক যদি রূপকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ না করিয়া, প্রিয় পদার্থকে দূরে রাখিয়া, মানসচক্ষে সেই রূপ 'নেহারি নেহারি লাখ যুগ ধরি' ধ্যান করেন, তবে আর এ অতৃপ্তি আসে না; বিমল শান্তি ও পরিপূর্ণ প্রীতিতে হৃদয়-মন ভরিয়া যায়। বিরহে আবেগ নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই, সন্তোষ নাই, উৎকণ্ঠা নাই, আশা ও নৈরাশ্যের ঘাত-প্রতিঘাতে হৃদয়-সমুদ্রের বীচিমালার আলোড়ন-বিলোড়ন উত্থান-পতন নাই; ইহা অচল-প্রতিষ্ঠ বিশালসমুদ্রের ন্যায়, নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায়, সর্ব্বংসহা ভগবতী বিশ্বম্ভরার ন্যায়, স্থির ধীর গম্ভীর।

অবশ্য যে-সে বিরহের কথা বলিতেছি না, প্রিয়জনের সহিত একবেলা আধবেলা দেখা না হইলে যে অধৈর্য্য হয়, সেই ক্ষণিক অদর্শনকে, সেই 'পলকে প্রলয়'কে বিরহ বলি না। বিদেশী কবি 'For in a minute there are many days' বলিয়া বাড়াবাড়ি করিলেও তাহাকে বিরহ বলি না। কুবেরকিঙ্কর যক্ষের বর্ষভোগ্য বিচ্ছেদকেও বিরহ বলিয়া এই বিরাট্ অনুভূতির অবমাননা করিব না। যে বিরহে মিলনের আশা নাই, যে বিরহে সারাজীবন ধরিয়া প্রিয়জনের অদর্শন ঘটিবে, তাহাকেই বলি বিরহ। সে বিরহ যোগীর সমাধির ন্যায় শান্তি-প্রীতি-পবিত্রতায় পরিপূর্ণ। সমস্ত দৈহিক সম্বন্ধ কাটাইয়া সর্ব্বেন্দ্রিয় নিরোধ করিয়া প্রিয়ার রূপগুণ ধ্যান করিতে করিতে ব্রহ্মাণ্ড তন্ময় হইয়া উঠে, অন্তরে বাহিরে সেই বিশ্বব্যাপিনী প্রেমময়ী দেশকাল ছাড়াইয়া অনন্তের সহিত মিলিত হইয়া যায়। ইহার কাছে মিলনের সুখ কি ছার! সার্দ্ধত্রিহস্তপরিমিত দেব-প্রতিমার উপাসনায় নিম্নস্তরের সাধকের উপকার দর্শিতে পারে, কিন্তু উচ্চ

অঙ্গের সাধক বিশ্বরূপদর্শন ব্যতিরেকে সুখ পান না। ব্রহ্মতত্ত্বে যে কথা প্রেমতত্ত্বেও সেই কথা। তাই বিরহী আধুনিক কবি অনন্তে লীনা প্রিয়াকে আবাহন করিয়া গাহিয়াছেন,—'গৃহলক্ষ্মী দেখা দাও বিশ্বলক্ষ্মী-রূপে'।

আর এক কথা। মিলনে স্থূল সূক্ষ্ম, আলো আঁধার, দুইই থাকে। তখন প্রিয়ার রূপগুণে মুগ্ধ হই বটে; কিন্তু মানুষমাত্রই দোষে-গুণে জড়িত; দোষটুকু 'গুণসন্নিপাতে' ঢাকা পড়ে না, তা কবি যত ছড়াই কাটুন। তাই আলোয় ছায়া আসিয়া পড়ে, পূর্ণচন্দ্রে কালিমার রেখা দেখা দেয়, প্রেমপ্রতিমার অসম্পূর্ণতা ধরা পড়ে; তাহাতে প্রকৃত উপাসনার অঙ্গহানি হয়। হয় ত ক্ষণিক মান-অভিমান বিরাগ-বিদ্বেষের কাল-মেঘে হৃদয়-আকাশের বিমল শুভ্রতা মলিন হইয়া যায়, চিত্তশুদ্ধির অভাবে আরাধ্য দেবতার সহিত অখণ্ডযোগ সংস্থাপিত হয় না। কিন্তু যখন প্রেমের আস্পদ দূরে, নেত্রগোচর নহে, তখন আঁধারটুকু কাটিয়া যায়, স্থূলটা উপিয়া যায়, আদর্শজ্যোতিঃ ও আদর্শপ্রীতিতে হৃৎপদ্ম মুকুলিত হয়, জ্যোতির্ম্ময়ীর জ্যোতিতে চিদাকাশ আলোকিত হয়, বিশ্ব মধুময় হইয়া উঠে। তখন কবির উক্তি সার্থক হয়—

'ব্যথা দিয়ে কবে কথা কয়েছিলে পড়ে না মনে।
দূরে হ'তে কবে চলে' গিয়েছিলে নাই স্মরণে॥'

তখন 'সেই ধ্যান, সেই জ্ঞান, সেই মান অপমান'। তখন 'একমনে একপ্রাণে ব'সে ব'সে ভাবি সেই হৃদয়ের ভাবনা'।

মিলনের কবি একটা আসর-জমান কথা বলিয়াছেন বটে,—'বহুদিন পরে,পাইনু তোমারে, চাহিয়া রহিব শুধু'। পারিলে উত্তম! কিন্তু ফলে ঘটে কি? শুধু অন্তশ্চক্ষুঃ ও বহিশ্চক্ষুঃ ভরিয়া চাহিয়া চাহিয়াই কি পর্য্যবসান হয়? চাহিতে চাহিতে নয়নে বিদ্যুৎ খেলিতে থাকে, হৃদয়তটে

ঢেউ উঠিতে থাকে, প্রেমসাগরে জোয়ার দেখা দেয়। বিমলপ্রণয়ের উৎস কামের কূপে পরিণত হয়, সম্ভোগের কর্দ্দমে প্রীতির নির্ঝর আবিল হইয়া পড়ে, অনুরাগের মলয়মারুতে আবেশের ঘূর্ণবাত্যার সৃষ্টি হয়, অনন্ত সাস্ত হইয়া পড়ে, অনঙ্গ সাঙ্গ হইয়া যায়, প্রেম কামে ডুবিয়া যায়। ছিঃ! সে কি প্রেম? সে যে রূপতৃষ্ণা, ভোগলিপ্সা; তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী রতি বা (Venus) ভীনাস্,—দেহদ্বয়াদ্ধঘটিতরচনা হরগৌরী নহেন।

তাই বলি, মিলনে সুখ নাই, শান্তি নাই, মাধুর্য্য নাই, স্থৈর্য্য ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য ঔদার্য্য কিছুই নাই; বিরহই প্রেমিকের যথার্থ কাম্যবস্তু। আমরা সূক্ষ্মদর্শী প্রাচীন কবির কথায় সায় দিয়া বলি—

'সঙ্গমবিরহবিকল্পে বরমপি বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যাঃ।
সঙ্গে সৈব তথৈকা ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে॥'

পাত্নীতত্ত্ব *

(বঙ্গদর্শন, অগ্রহায়ণ ১৩১৬)

(বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকাবলি-অবলম্বনে)

সংযমশিক্ষক চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় রাগই করুন আর যাই করুন, আমি খোলসা বলিতেছি, আমি একটু ভোজনবিলাসী। ব্রাহ্মণের উপবাসাদি কৃচ্ছ্রসাধন অভ্যস্ত বটে, কিন্তু সময়বিশেষে ব্রাহ্মণের পারণ সংযমের বাঁধন ছিন্ন করে ইহাও স্বাভাবিক। জড়জগতের ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার অমোঘ নিয়ম জীবজগতেও খাটে। হিন্দু বিধবাদিগের নির্জলা একাদশী জগদ্‌বিখ্যাত, কিন্তু তাঁহাদের দশমী-দ্বাদশীর ব্যাপারটা একটু মাত্রা অতিক্রম করে না কি? বশিষ্ঠ ঋষি জঠরজ্বালায় নরমাংস খাইয়াছিলেন, অগস্ত্যমুনি আর কিছু না পাইয়া সমুদ্রের লোণা জলে উদর পূরাইয়াছিলেন, জহ্নুমুনি ভাগীরথীর সদ্যোনিঃসৃত সলিলরাশি এক নিশ্বাসে নিঃশেষ করিয়াছিলেন,—এ সব শাস্ত্রের কথা, অবিশ্বাস করিবার যো নাই! আর এখনও অনেক 'কলির ব্রাহ্মণ' মুখপ্রিয় নিষিদ্ধ মাংস, এবং লবণাম্বু অপেক্ষাও তৃষ্ণানিবারক ও গঙ্গাজল অপেক্ষাও পবিত্র পেয় ([illegible] পাত্রকে পাত্র উদরস্থ করেন ইহাও দেখিতে পাই। অতএব নজীরের যখন অভাব নাই, আর অন্ধকার রাত্রিতে মিলনের ঘটক—লেখকের সহিত অভিন্ননামা †—মিত্র মহাশয়ের গৃহে যখন কৃষ্ণনগরের সরপুরিয়া-সরভাজার

* পূর্ণিমামিলনে 'দীনধামে' (৺দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের ভবনে) পঠিত।

† ৺দীনবন্ধু মিত্রের অন্যতম পুত্র শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ।

ন-সরঞ্জাম সমাবেশ, তখন দেশকালপাত্র-বিবেচনায় ভোজনতত্ত্ব আলোচনা নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না। যে প্রতিভাশালী লেখক মৃত্যুশয্যায় শয়িত থাকিয়াও বক্রেশ্বরের মুখ দিয়া

'ভুবনে ভোজনে ভক্তি কর ভবজন।
ভয়াবহ ভবভয় হবে নিবারণ॥'

এই অভয়বাণী বাহির করাইয়াছেন, তাঁহার 'দীনধামে' এরূপ আলোচনা করিব না ত কোথায় করিব? এই আলোচনায় কিঞ্চিৎ কটুতিক্তকষায় রস থাকিলেও তাহা পাঁচ রকমের মিষ্টান্নের সঙ্গে উদরস্থ করিতে বিশেষ অসুবিধা হইবে না, পরন্তু এত মিষ্টান্নের সঙ্গে উদরস্থ করিলে হরীতকীর ন্যায় হিতকারিণী ভিন্ন অহিতকারিণী হইবে না।

বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকাগুলির ভিতরে কি গূঢ়তত্ত্ব নিহিত আছে? মনস্বী লেখক কি কেবলমাত্র পাঠকপাঠিকার ক্ষণিক চিত্তবিনোদনের জন্য এতগুলি আখ্যায়িকা লিখিয়া গিয়াছেন? না। উদপেক্ষা অন্য কোন মহত্তর উদ্দেশ্য ছিল? এ সম্বন্ধে আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে কখনও রীতিমত আলোচনা হয় নাই। আমার পরম বন্ধু ত্রিবেদী মহাশয় একবার তাঁহার বিজ্ঞানের দূরবীণ কষিয়া দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, এই সমস্ত বিচিত্র প্রেমের কাহিনীতে ডারউইন্, হাক্স্লী ও হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তত্ত্বগুলি সুপরিস্ফুট। 'ভাবনা যাদৃশী যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।' আবার আজকাল এক শ্রেণীর সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক অণুবীক্ষণের সাহায্যে আখ্যায়িকাগুলির ভিতর রাজদ্রোহের জীবাণু বা বীজাণু দেখিতে পাইতেছেন। 'ভিন্নরুচির্হি লোকঃ।'

আমি কিন্তু গ্রন্থগুলি যখনই পড়ি তখনই তাহার ভিতর এই পরমতত্ত্ব দিব্যচক্ষে দেখিতে পাই যে, পরিবারমধ্যে পত্নীর প্রকৃত স্থান কোথায় কি ভাবে স্ত্রী স্বামীর প্রকৃত সহায় হইতে পারেন, এই গভীর প্রশ্নের

বিচার করিবার উদ্দেশ্যেই আখ্যায়িকাগুলি লিখিত। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও বলিয়াছেন—'বাঙ্গালীর স্ত্রী অনেক অবস্থাতেই বাঙ্গালীর প্রধান সহায়।' (আনন্দমঠ, প্রথমবারের বিজ্ঞাপন।) (কোন কোন ইংরেজ সমালোচক টেনিসনের Idylls of the King নামক কাব্যমালারও এইরূপ উদ্দেশ্য পরিকল্পনা করেন।) আমার প্রকৃতির দোষে কি কবির প্রতিভার গুণে এরূপ প্রতীয়মান হয় বলিতে পারি না। যাহা হউক, আমি যেরূপ বুঝিয়াছি যথাজ্ঞান নিবেদন করিতেছি। আপনারা শ্রবণকালে 'আত্মবৎ মন্যতে জগৎ' এই প্রবাদবাক্যটি স্মরণ রাখিবেন।

অজ রাজা যখন পত্নীর মৃত্যুতে বিকলচিত্ত, তখন 'গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ' এই বলিয়া আদর্শপত্নীর গুণগান করিয়াছেন। তাঁহার উপযুক্ত পুত্র দশরথও 'দাসীবচ্চ সখীব চ। ভার্য্যাবদ্ ভগিনীবচ্চোপতিষ্ঠতে॥ সততং প্রিয়কামা মে প্রিয়ংবদা।' বলিয়া বড়রাণী কৌশল্যাকে সার্টিফিকেট্ দিয়াছেন। আবার তাঁহার পুত্র শ্রীরামচন্দ্রও বাপ-ঠাকুরদাদার ওই কথাটাই আরও একটু ঘোরালো করিয়া 'কার্য্যেষু মন্ত্রী করণেষু দাসী, ধর্ম্মেষু পত্নী, ক্ষময়া ধরিত্রী, স্নেহেষু মাতা, রঙ্গে সখী', বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন। এই প্রাচীন নজীর-দৃষ্টে নগেন্দ্রনাথ দত্ত সূর্য্যমুখীর শোকে বলিয়াছেন—'সম্বন্ধে স্ত্রী, সৌহার্দ্দে ভ্রাতা, যত্নে ভগিনী, আপ্যায়িতে কুটুম্বিনী, স্নেহে মাতা, ভক্তিতে কন্যা, প্রমোদে বন্ধু, পরামর্শে শিক্ষক, পরিচর্য্যায় দাসী।'

কিন্তু এ সব ত ভাবপ্রবণতা (sentiment), ইহাতে প্রকৃত কাযের কথা পাওয়া যায় না। পত্নীর পত্নীত্ব কোথায়? ইহার পাকা মীমাংসা যদি চাহেন, তবে পাকাপোক্ত (practical) ইংরেজ জাতির সাহিত্য অনুসন্ধান করুন। ইংরেজীতে একটা কথা আছে—'The best way to a man's heart is through the stomach'; অর্থাৎ,

পুরুষের মন পাইবার সোজা পথ পেটের ভিতর দিয়া ; কথাটা ডাক্তারী-শাস্ত্রসম্মত কিনা জানি না, কিন্তু কথাটা বড় পাকা। কার্য্যকুশল ইংরেজের অন্তর্ভেদী বিশ্লেষণে পত্নীর প্রকৃত পত্নীত্ব কোথায় তাহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। দেখুন, ('neat cookery') পরিপাটী রন্ধনের গুণে, শ্রেষ্ঠ ইংরেজ জাতির শ্রেষ্ঠ কবি শেক্‌স্‌পীয়ারের মানসী কন্যাদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা আইমোজেনের প্রশংসায় ইংরেজ কবি ও সমালোচক সুইন্‌বার্ন্ পঞ্চমুখ। * ইংরেজের সেরা আখ্যায়িকা-কার জর্জ্জ মেরিডিথ্ও একজন গিন্নীধন্নীর মুখ দিয়া পুরুষ-বশীকরণ সম্বন্ধে বলাইয়াছেন—'No use in having their hearts if you don't have their stomachs··· kissing don't last, cookery do.' (The Ordeal of Richard Feverel ch 28.) আবার নামজাদা আখ্যায়িকা-কার থ্যাকারের 'ভ্যানিটি ফেয়ারে' দেখা যায় যে বেকি শার্প, দুশ্চরিত্রা হইয়াও, রন্ধনের গুণে ভুবনবিজয়িনী। তাই সুকবি টেনিসন্ গাহিয়াছেন—"Man for the field and Woman for the hearth" অর্থাৎ 'পুরুষ খাটবে মাঠের চাষে। নারী থাক্‌বে উনান-পাশে॥' আর এই কথাই পরম-জ্ঞানী রাস্‌কিন্ আরও বিশদভাবে বুঝাইয়াছেন—

'Lady means loaf-giver or breadgiver ; she should see that every body has something nice to eat ; she should be a cook combining English thoroughness, French art and Arabian hospitality.'

---

* 'The very crown and flower of all her father's daughters...... the woman above all Shakespeare's women......the woman best beloved in all the world of song and all the tide of time.'—*Swinburne.*

অস্যার্থঃ—লোফ' (রুটি) শব্দ হইতে 'লেডি' (মহিলা) শব্দের ব্যুৎপত্তি। তিনি পরিবারস্থ সকলের অন্নদাত্রী। তিনি পাকা রাঁধুনী হইবেন; তাঁহার রন্ধনকার্য্যে ইংরেজসুলভ সম্পূর্ণতা, ফরাশী কলাকুশলতা ও আরবদেশীয় আতিথেয়তা এই তিনের একত্র সমাবেশ থাকিবে।

এ ত দেখিতেছি আমাদেরই হিন্দু আদর্শ। জানি না ম্লেচ্ছ জ্ঞানী রাস্‌কিন্ কখনও এই মূর্ত্তি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন কিনা; তবে আমি মুক্তকণ্ঠে বলিব এই সোণার অন্নপূর্ণা ও মহালক্ষ্মী মূর্ত্তি, রন্ধনে ও পরিবেষণে সিদ্ধবিদ্যা এই দশভুজামূর্ত্তি, হিন্দুগৃহে বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এই আদর্শ, প্রকৃত গৃহিণীর আদর্শ। হিন্দুপত্নীর প্রকৃত পত্নীত্ব এইখানে। এই জন্যই পাকস্পর্শ না করিলে জ্ঞাতিকুটুম্ব বশ হয় না। এই গুণে দ্রৌপদী পঞ্চস্বামী বশ করিয়াছিলেন। শাক্তই হউন আর বৈষ্ণবই হউন, ইহা মানিতেই হইবে। দেখুন, দুর্ব্বাসার বরে শ্রীরাধার অমৃতসমান রন্ধন, তাই শ্রীকৃষ্ণ সেই অন্নব্যঞ্জন ভোজন করিয়া রাধার প্রেমে বিভোর। ভক্তমালের ভক্ত কবি বলিয়াছেন—

'রূপে গুণে শীলে কর্ম্মে কুশল রন্ধনে।
এমন বালিকা আর না দেখি ভুবনে॥'

আবার বুড়াশিব ভগবতীর রন্ধন খাইয়া পাগল।

'প্রেয়সীকে প্রশংসিয়া বলে ভূতনাথ।
সত্য সতী পুণ্যবতী ধন্য দুটি হাত॥
অল্প রান্ধি এত অন্ন কোথা হইতে আন।
কেমন হস্তের গুণ কিবা মন্ত্র জান॥"

(রামেশ্বরের 'শিবায়ন'।)

এই মন্ত্রের প্রভাবে কবিকঙ্কণের ফুল্লরা-খুল্লনা স্বামিসোহাগিনী, এই মন্ত্রবলে ভারতচন্দ্রের হাস্যমুখী পদ্মমুখী সপত্নীসত্বেও পতির আদরিণী গরবিণী

স্বয়ংরাণী। নলরাজা যদি বাঁকুড়াবাসী ব্রাহ্মণের ন্যায় নিজে রন্ধনপটু না হইয়া বিদ্যাটা দময়ন্তীকে শিখাইতেন, তাহা হইলে কি আর রাজ্যভ্রষ্ট হইতেন, না দময়ন্তীকে হারাইয়া কষ্ট পাইতেন? 'স্বচ্ছন্দবনজাতেন শাকেনাপি প্রপূর্য্যতে' যে একটা প্রবাদ আছে, সে কাহার রান্নার গুণে তাহা বিষ্ণু-শর্ম্মা হইতে 'বুনো রামনাথ' পর্য্যন্ত বিলক্ষণ জানিতেন। বাস্তবিক, দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারের সঙ্গে বামাঙ্গিনী বামার নিত্যসম্বন্ধ। তবে শাস্ত্রে একটা কথা আছে বটে—'মাতরঞ্চ মহানসে'। কিন্তু আমার বোধ হয় ওটা প্রক্ষিপ্ত। কোনও 'রসিকো নব্য যুবা' নবোঢ়া প্রণয়িনীর সঙ্গে দু'দণ্ড বিশ্রম্ভালাপের সুবিধার জন্য Coast clear (উচ্চারণসাম্যে কোষ্ঠ খোলসা বুঝিবেন না!)—পণ্ডিতীভাষায় স্থানটি নির্মক্ষিক—করিবার উদ্দেশ্যে, একটু নিরিবিলি পাইবার জন্য, মাতাঠাকুরাণীর উপর ঐরূপ বরাত চালাইয়াছেন। রন্ধনশালার ভার প্রকৃতপক্ষে পত্নীর।

এখন দেখা যাউক, বঙ্কিমচন্দ্র কি ভাবে কি কৌশলে এই শিক্ষা দিয়াছেন। সার্থকনামা অমৃতলালের অমৃতময়ী 'বৌমা' বলিয়াছেন, "উপন্যাসের নায়িকারা কখনও ভাত রাঁধেন না।" সে কথাটাও পরখ করা যাক্।

'দুর্গেশনন্দিনী'। এই গ্রন্থে বিদ্যাদিগ্‌গজের স্বপাক আহার ও তাঁহার মুখে 'মুরগীর পালো' ছাড়া আর রান্নাবান্নার কথা বড় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। প্রেমবিহ্বলা নায়িকা তিলোত্তমা আনমনে হিজিবিজি লিখিতেছেন, কেননা শাস্ত্রে বলে—'কিঞ্চিল্লিখনং বিবাহ-কারণম্'। তাহার পর, বিমলা? তিনি ঘটা করিয়া চুল বাঁধিতেছেন, সপত্নীকন্যার প্রণয়দূতী সাজিবেন আর প্রতিনিধি সাজিয়া ভাবী জামাতার নিকট অভিসারে যাইবেন, এই সব লইয়াই ব্যস্ত। আসমানি দুধও দিবে না, ভাঁড়ও ভাঙ্গবে; সে নিজে রাঁধিয়া দিতে পারে না, কিন্তু

ব্রাহ্মণের তৈয়ারী ভাত নষ্ট করিয়া দিতে পারে। আর নবাবনন্দিনী আয়েষা ত সেবাধর্ম্মনিরতা মানবীবেশে দেবী, ministering angel ; য়িহুদিকন্যা রেবেকা ও ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের কনিষ্ঠা এবং 'কুরুক্ষেত্রে'র সুভদ্রার জ্যেষ্ঠা ভগিনী। তিনি অবশ্য রান্নাবান্নার অতীত। পুস্তকখানি পড়িতে পড়িতে কতবার মনে হইয়াছে, আহা, আয়েষা যদি স্বহস্তে একটু সুরুয়া প্রস্তুত করিয়া জগৎসিংহকে খাওয়াইতেন, তবে মোগল-সেনাপতিপুত্রের পরকাল ও নবাব-পুত্রীর ইহকাল সমকালেই ঝরঝরে হইত। প্রেমময়ী তিলোত্তমা দুর্গাভ্যন্তরে স্বীয় কক্ষমধ্যে জগৎসিংহকে পাইয়া প্রেমালাপে বাহ্যজ্ঞানশূন্য না হইয়া যদি চট্ করিয়া কেরোসিন ষ্টোভে বা ইক্‌মিক্ কুকারে গোটা দুই বেগুন ও খানকয়েক ফুল্‌কা লুচি ভাজিয়া দিতেন, তবে কি আর কারাগারে কুমার জগৎসিংহ তাঁহাকে দেখিয়া সরিয়া দাঁড়াইতেন? আর আস্‌মানির হাতে বিদ্যাদিগ্‌গজ বেচারার জাত গেল, পেট ভরল না। যদি সে একদিন স্বহস্তে 'কালিয়া কাবাব রেঁধে দেমাকে অজ্ঞান' না হইয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইত, তবে সেই মহাব্রাহ্মণের শুধু শুধু কল্‌মা পড়াই সার হইত না, অভিরামস্বামীর উপযুক্ত শিষ্যের 'শিষ্যাবিদ্যা গরীয়সী' হইত। আমাদিগকেও আর "যবনী-মুখপদ্মানাম্" এর ব্যাখ্যার জন্য এমন সুপণ্ডিতকে ছাড়িয়া মল্লিনাথসূরির বাড়ী ছুটিতে হইত না।

'মৃণালিনী'। মৃণালিনীর প্রথম-সাক্ষাতে দেখি, তিনি অলঙ্কারশাস্ত্রের মামুলি ব্যবস্থামত চিত্র আঁকিতেছেন, সখী মণিমালিনী সেই কার্য্যে সহায়তা করিতেছেন, আর দু'জনে মনের কথা বলিতেছেন। ক্রমে জানিলাম, তিনি কাব্যের নায়িকার মত ফুলের মালা গাঁথিতে জানেন, কাপড়ের উপর ফুল তুলিতে জানেন, প্রণয়লিপি লিখিতে পারেন এবং প্রয়োজন হইলে মূর্চ্ছা যাইতেও পারেন; তিনি হৃষীকেশ ব্রাহ্মণের

বাড়ী পরের অন্নে উদর পোষণ করেন, রন্ধনের কোন ধার ধারেন না। এরূপ নারীর দাম্পত্যজীবনের পথ কণ্টকাবৃত হইবে বই আর কি? সখী মণিমালিনীরও চিত্রবিদ্যায় অনুরাগ ছিল, রন্ধনের যোগ্যতা ছিল না, কাযেই অদৃষ্টে দাম্পত্য-সুখ ঘটে নাই। ভিখারীর মেয়ে গিরিজায়া গান গায়, কবরীতে যূথিকার মালা পরে, সে দূতীগিরিতে দড়, সম্মার্জ্জনী-চালনে ক্ষিপ্রহস্ত, কিন্তু হাতাবেড়ী নাড়িতে নারাজ। সম্ভবতঃ চা'ল চিবাইয়া বা চিড়া ভিজাইয়া জঠরজ্বালা জুড়াইত। কুসুমনির্ম্মিতা মনোরমা 'ভ্রাতা' হেমচন্দ্রের নিকট প্রেমসম্বন্ধে লেক্‌চার ঝাড়েন ও ফুলের মালা গাঁথিয়া বিড়ালের গলায় পরান। তিনি সারাজীবন প্রেমাগ্নিতে ও অন্তিমে পতির চিতাগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছিলেন, আগুনের সঙ্গে তাঁহার এইমাত্র কারবার। পশুপতির প্রেমেই তাঁর পেট ভরিত। রত্নময়ী জেলেনী, সে রাঁধিতে জানিত কি না জানিত জানিয়া আমাদের ফল নাই। কথায় বলে, বেল পাকিলে কাকের কি?

'কপালকুণ্ডলা'। কপালকুণ্ডলার ত কাঁচাখেগো দেবতার কাছে তরিবৎ, সুতরাং তিনি রান্নাবান্নার ধার ধারিতেন না। ফল-মূলাশী কাপালিকের পালিতা কন্যা—'নাহি জানে রাঁধাবাড়া নাহি পাড়ে ফুঁ। পরের রাঁধনা খেয়ে চাঁদপানা মু।' তাই গ্রন্থকার খুব ঘোরালো করিয়া তাহার রূপবর্ণনার অবকাশ পাইয়াছেন। উড়িষ্যা-প্রত্যাগতা মতিবিবি যদি শুধু রূপের ডালি না খুলিয়া রাতারাতি চটিতে ভুনী-খিঁচুড়ি চড়াইয়া দিতেন আর 'মুই হ্যাদু' বলিয়া পরিচয় দিয়া সেই দেবদুর্লভ আহার্য্য বলরামের ভোগ বলিয়া চালাইতেন, তবে কি আর নবকুমার শর্ম্মা টটিতে পারিতেন, না আখ্যায়িকাখানি বিয়োগান্ত হইত? সপ্তগ্রামের অরণ্যে আসিয়াও মতিবিবির রোদন সার হইল, এ বুদ্ধিটা তাহার ঘটে আসিল না। নতুবা নবকুমারের 'পদ্মাবতীচরণ-চারণ-

চক্রবর্ত্তী' হইতে বাকী থাকিত কি? শ্যামা স্বামিবশীকরণের ঔষধ খুঁজিতে গিয়া আপনিও মজিল, কপালকুণ্ডলাকেও মজাইল। হায়! সে পুরুষ বশ করার সহজ ঔষধটা জানিত না। মোগলযুবরাজপ্রণয়িনী ভুবনসুন্দরী মেহেরউন্নিসা (নুরজাহান), মগধরাজকুমারপ্রণয়িনী মৃণালিনীর ন্যায়, খাসকামরায় বসিয়া তস্বীর লিখিতেছেন, আর মতিবিবি, সখি মণিমালিনীর ন্যায়, তাঁহার পাশে বসিয়া চিত্রলিখন দেখিতেছেন এবং তাম্বূল চর্ব্বণ করিতেছেন। সুতরাং 'সেলিম ভারতবর্ষের সিংহাসনে, আমি কোথায়?'—এই আক্ষেপই মেহেরের সার হইল। বাঁদী পেষ্‌মন্ ত আস্‌মানির ছোট বোন, তাহার কথা তোলা একেবারেই অপ্রয়োজন।

'রজনী'। রজনী 'ফুল বিছাইয়া ফুল স্তূপীকৃত করিয়া, ফুল ছড়াইয়া,' ফুলের মালা গাঁথে। কাব্যের প্রকৃত নায়িকা বটে, ফুলের স্পর্শ ও ঘ্রাণ তাহার জীবনকে একখানি কাব্যে পরিণত করিয়াছে, তাহাতেই তাহার পেট ভরে, প্রাণ পুরে, তবে সে কি জন্য রাঁধিবে? আহা, বেচারা জন্মান্ধ, ভিতরে বাহিরে 'ঘোরা তিমিরা রজনী'। সে রাঁধিবেই বা কিরূপে? যাক্, সে শচীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পক্ষ, তাহাতে আবার অগাধ বিষয়সম্পত্তির অধিকারিণী; সোণায় সোহাগা। তবে এক ভরসা, শচীন্দ্রনাথের আদর্শ-স্ত্রীর বর্ণনায় 'রন্ধনে দ্রৌপদী' কথাটা আছে। তিনি 'বিষবৃক্ষে'র নগেন্দ্রনাথের মত ঠিকে ভুল করেন নাই। ললিত-লবঙ্গলতাও দ্বিতীয় পক্ষ, কিন্তু অমরনাথের একটী কথায় জানিতে পারি যে তিনি 'স্বহস্তে রাঁধিয়া সতীনকে খাওয়াইতেন।' এই গুণেই সতীন, সতীনপো ও খোদ মিত্রজা বশীভূত। ভুবনেশ্বরী চিররুগ্‌ণা অতএব রন্ধনে অশক্তা; কাযেই, স্বামী ত স্বামী, আপন, পেটের ছেলেও পর হইয়া গিয়াছে। ফুলবাগানের চাঁপা উগ্রগন্ধা; গোপালের প্রথম পক্ষ চাঁপাও উগ্রচণ্ডা। কেমন রাঁধিত জানি না, তবে স্বভাব দেখিয়া অনুমান

হয়, ব্যঞ্জনে লবণের ভাগ কম ও ঝালের ভাগ বেশী পড়িত। নতুবা "শিশুশিক্ষা"র সুপরিচিত সুবোধ ও সুশীল গোপাল কেন নিমকহারাম হইয়া দ্বিতীয় পক্ষ করিতে চাহিবে? 'পুত্রার্থং ক্রিয়তে ভার্য্যা' ওটা ত একটা ছল; অনেক বাবুই ওরূপ ক্ষেত্রে হঠাৎ মনুর পরম গোঁড়া হইয়া পড়েন। প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি, এই আখ্যায়িকাখানি দ্বিতীয় পক্ষের গৃহিণীরা সাদরে পড়িবেন।

'চন্দ্রশেখর'। গ্রন্থারম্ভে ত দেখিতেছি, শৈবলিনী, মনোরমা ও রজনীর মতই ফুলের মালা গাঁথেন, নিজে পরেন, দ্বিপদ চতুষ্পদ সব জীবকেই পরান। তবে তিনি রজনীর মত কাণা না হইলেও চক্ষুঃ থাকিতে কাণী; যখন দিব্যচক্ষুঃ পাইয়াছিলেন তখন সে কথা বুঝিয়াছিলেন। চন্দ্রশেখর মাতৃবিয়োগের পর স্বপাক খাইতেন, শৈবলিনীকে ঘরে আনিয়া সে কষ্ট ঘুচিয়াছিল কি না ঠিক জানা যায় না। এক রাত্রিতে শৈবলিনী স্বামীর অন্ন-ব্যঞ্জন বাড়িয়া রাখিয়া আপনি আহারাদি করিলেন এ কথা স্মরণ হয় বটে, কিন্তু অন্নব্যঞ্জন যে তিনি স্বয়ং রাঁধিয়াছিলেন তাহার কোন স্পষ্ট প্রমাণ পাই না। আমার বিশ্বাস, চন্দ্রশেখর তখনও হাত পোড়াইয়া রাঁধিতেন; কেননা, বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী। তাই শৈবলিনী-শৈবাল চন্দ্রশেখরের পদপ্রান্তে ভালরূপে জড়াইতে পারে নাই। শৈব জাতিরক্ষার জন্য লরেন্স ফষ্টারের নৌকায় স্বহস্তে রাঁধিতেন বটে কিন্তু জোবানবন্দীতে প্রকাশ, সে কেবল চাউল সিদ্ধ করা ও দুধ। বোধ হয় তখন সবে হাতেখড়ি হইতেছে, তাও দায়ে পড়িয়া; পাচক ব্রাহ্মণের হাতে খাওয়ার কথাও শুনা যায়। তখনও তিনি হাতাবেড়ী অপেক্ষা ছুরি-তরবারি নাড়িতেই বেশী মজবুত। পার্ব্বতী কুলসম করিমন—বাঁদী, ধর্তব্যের মধ্যেই নহে। সুন্দরী রূপেও সুন্দরী, গুণেও সুন্দরী, কিন্তু তাঁহারও

রন্ধনের কথা পুঁথিতে কোথাও লেখে না। যে দিন 'নাপিতানী' সাজিয়াছিলেন, সে দিন ত স্বামীকে সারাদিন উপবাসী রাখিয়াছিলেন। তিনি রন্ধনপটু হইলে শ্রীনাথ নিশ্চয় প্রকৃত ঘরজামাই হইয়া থাকিত ও পোষ মানিত। সুন্দরীর ন্যায় রূপসীরও রূপ ছিল, নামে মালুম হয়, কিন্তু রন্ধনে অজ্ঞতাবশতঃ বোধ হয় প্রতাপকে দাম্পত্যবন্ধনে বাঁধিতে পারেন নাই। আর দলনী বেগম—তিলোত্তমা ও মৃণালিনীর মুসলমানী সংস্করণ—'সুগন্ধ কুসুমদামের ঘ্রাণে পরিপূরিত গৃহে' গুলেস্তাঁ পড়েন, বীণায় ঝঙ্কার দেন, বেহালা বাজান, সঙ্গীত আলাপ করেন, চিড়িয়া নাচান, প্রেমের বুলি বলান ও বলেন, এবং যথাসময়ে—বিষপান করেন। যে স্ত্রী স্বামীকে স্বহস্তপ্রস্তুত অন্নব্যঞ্জন খাওয়াইতে না পারিল, তাহার বিষপানই উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত।

'কমলাকান্ত'। প্রসন্ন গোয়ালিনী কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তীকে সময়-অসময়ে বিনামূল্যে দুধ-দই যোগাইত, কখন কখন বোধ করি দুই একটা সিধাও দিত, বড়জোর ঘরের পিঁড়ায় বসাইয়া বিদ্যাসাগর-জীবনের সুপরিচিত স্নেহময়ী রাইমণির মত আঙ্গট কলার পাতায় চিড়ামুড়কির ফলার করাইত; কিন্তু যদি এক দিন কপাল ঠুকিয়া গোয়াল-ঘরের কোণে বসাইয়া স্বহস্তপ্রস্তুত ভিজা ভাত বেগুন-পোড়া খাঁটি সর্ষপ তৈল ও করকচ লবণ-সংযোগে খাওয়াইত, তাহা হইলে আফিংখোর তৈলতরুণীবর্জ্জিত কমলাকান্ত কি আর জোবানবন্দীতে নিমকহারামী করিত? কমলাকান্ত সেই মুহূর্ত্তেই অভিরামস্বামীর দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়া বসিত, বইখানিও খাঁটি নভেল হইত, আর নীরবে একটা বড় রকমের সমাজসংস্কার সম্পন্ন হইত।

'কৃষ্ণকান্তের উইল'। 'রোহিণী রন্ধনে দ্রৌপদী-বিশেষ'। 'ঝোল, অম্ল, চড়চড়ি, সড়সাড়ি, ঘণ্ট, দালনা, ইত্যাদিতে সিদ্ধহস্ত।'

হরলাল সেই রন্ধন দেখিয়াই পাগল, কেননা ঘ্রাণেই অর্দ্ধ-ভোজন। তাই সে ঝোঁকের মাথায় একেবারে বিধবাবিবাহের প্রস্তাব করিয়া বসিল! আবার গোবিন্দলাল রোহিণীকে রন্ধনের জল আনিতে দেখিয়াই গলিয়া গেলেন, যেমন বৈষ্ণব বাবাজী 'এই মাটীতে মৃদং হয়' বলিয়া ভাবে বিভোর! আর সেই রান্নার কাপড়ে হলুদবাঁটার গন্ধ পাইয়াই আফিংখোর বুড়া খোদ কৃষ্ণকান্ত রায় (ঠাকুরদাদা) 'অশ্বিনী ভরণী কৃত্তিকা রোহিণী' বলিয়াই অজ্ঞান! কিন্তু এত গুণ থাকিয়াও রোহিণীর ভাগ্যে সুখ ঘটিল না। যখন শুনিলাম, সে আগের মত 'ঠন্ ঠন্ করিয়া দালের হাঁড়িতে কাঠি' না দিয়া নারীর প্রকৃত কার্য্য ছাড়িয়া দানেশ খাঁর পাশে বসিয়া তবলায় চাঁটি দিতেছে, তখনই বুঝিলাম তাহার কপাল ভাঙ্গিতে আর দেরী নাই! (তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়!) কথায় বলে 'যার কর্ম্ম তা'রে সাজে।' তা'র পর ভ্রমর। ভ্রমরের করুণকাহিনী-সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই বলিয়াছেন—'গোবিন্দলালের মাতা যদি পাকা গৃহিণী হইতেন, তবে ফুৎকার-মাত্রে এ কাল মেঘ উড়িয়া যাইত।' ফুৎকার অর্থাৎ উনানে ফুঁ। এক দিন যদি ছুতা করিয়া বৌমার হাতের রান্না পাঁচ ব্যঞ্জন ভাত দিয়া গোবিন্দের ভোগ লাগাইতেন, তাহা হইলেই সব গোল মিটিয়া যাইত।

'বিষবৃক্ষ'। 'বিষবৃক্ষে' ফুল ধরিয়াছে অনেকগুলি। প্রধান পঞ্চপুষ্প—(১) সূর্য্যমুখী, (২) কমল, (৩) কুন্দ, —চতুর্থটি হীরা, পঞ্চমটি হৈম। আবার 'মালতী, মালতী, মালতী ফুল'ও আছে। কুন্দর বাল্যসঙ্গিনী চাঁপা আছে, তবে সে একেবারেই চাপা পড়িয়াছে। আর তারাচরণের মাতা শ্রীমতীকে যদি মতিয়া বলেন, তবে আর একটি বিষফুল বাড়িল। শেষ তিনটির রান্নার ত প্রসঙ্গই নাই। প্রথম দুইটি অমৃত, আর কয়টি বিষ; মাঝেরটি অমৃত হইয়াও বিষ। "বিষমপ্যমৃতং

ক্বচিদ্ভবেৎ অমৃতং বা বিষমীশ্বরেচ্ছয়া।" হৈমবতীর যে 'কোন গুণ নাই, তা'র কপালে আগুন', সে পরিচয় গ্রন্থকার নিজেই দিয়াছেন। নহিলে আর দেবেন্দ্র দত্ত অধঃপাতে যায়!" সূর্য্যমুখীর রজনী ও শৈবলিনীর মত ফুলখেলা দেখিয়াছি, সুভদ্রা সাজিয়া 'বশী' হাঁকাইয়াছেন তাহাও দেখিয়াছি, তাঁহার ঘরসাজান কুসুমময়ী সাজা আবীর-কুঙ্কুম ছড়ানরও পরিচয় পাইয়াছি, কিন্তু তাঁহার রন্ধনপটুতার কথা নগেন্দ্রনাথ তাঁহার গুণের যে লম্বা ফর্দ্দ দাখিল করিয়াছেন তাহার ভিতরে ত পাই না। কুন্দসম্বন্ধে দেবেন্দ্র দত্ত নেশার ঝোঁকে একবার বলিয়াছিল বটে, 'বিধবা হ'য়ে ওগাঁয়ের দত্তবাড়ী রেঁধে খায়'; কিন্তু সে মাতালের কথা, বিশ্বাসযোগ্য নহে। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও দেবেন্দ্র-দত্ত সম্বন্ধে বার বার বলিয়াছেন, মাতালের কথায় বিশ্বাস করিতে নাই। (কুন্দর এক রা 'না', ইহা হইতে 'রান্না' হয় কিনা বৈয়াকরণ বিচার করুন।) কুন্দ যদি পাকা রাঁধুনী হইত; তাহা হইলে নগেন্দ্রনাথের প্রীতি অচলা থাকিত। 'সংসারে'র সুধার সঙ্গে তুলনা করুন; কচি আমের অম্বলের গুণে শরৎবাবু মুগ্ধ—আর নগেন্দ্রনাথ! একই বিধবাবিবাহকাণ্ডে এক স্থলে বিষ ও অন্য স্থলে সুধা ফলিল কেন? বঙ্কিমচন্দ্রের স্থিতিশীলতা ও রমেশচন্দ্রের সমাজসংস্কারপ্রিয়তার দোহাই দিয়া আসল কথাটা চাপা দিবেন না। খগেন্দ্রনাথের নহে, নগেন্দ্রনাথের—'ভগিনী কমলে'র প্রতি আমার বড় পক্ষপাত; নগেন্দ্র দত্তের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক পাতাইবার লালসায় নহে, (নগেন্দ্র দত্তের যেরূপ আক্কেল, তাহাতে তাঁহাকে ঐরূপ আখ্যায় আপ্যায়িত করিতে ইচ্ছা করে বটে!)—কমলমণির গুণে। কমল শ্রীশ বাবুকে জল খাওয়াইয়া তবে মানে বসেন। এমন নারীর বশীভূত না হইয়া কি থাকা যায় গা? পোড়ালোকে বলে, কিনা শ্রীশবাবু স্ত্রৈণ! এমন সোণার কমল পাইলে জন্ম-জন্ম এ অপবাদ সহ করিতে

প্রস্তুত আছি। হীরা নব্যাদিগের ন্যায় হিষ্টিরিয়ার বশ, কাযেই বুড়ী আয়ীমার উপর রান্নার ভার। সে কেবল 'দত্তগ্রহেষু ঝাঁটাহস্তেন সংস্থিতা'; নগেন্দ্রনাথের রূপজ মোহ, কুন্দের অতৃপ্ত বাসনা, সূর্য্যমুখীর অভিমান, দেবেন্দ্রনাথের পৈশাচিক প্রণয়, মালতী গোয়ালিনীর কুৎসিত প্রস্তাব ও নিজ হৃদয়ের হিংসাদ্বেষ ও লালসা—এই সমস্ত আবর্জ্জনা জড় করিয়া রাশীকৃত করিতেছে।

'রাজসিংহ'। রূপের নাগরী রূপনগরী, মৃণালিনী বা মেহের-উন্নিসার মত চিত্র আঁকিতেছেন না বটে, কিন্তু চিত্র দেখিতেছেন, কিনিতেছেন, ভাঙ্গিতেছেন। কাব্যের নায়িকাদিগের যাহা ঘটিয়া থাকে, 'চিত্রে দর্শনাৎ' তাঁহারও তাহা যথানিয়মে ঘটিল। নির্ম্মলকুমারী সখী মণি-মালিনীর চেয়ে দড়, ঘটকালীতে বিমলার বা গিরিজায়ার কাছাকাছি না গেলেও অনসূয়া-প্রিয়ংবদার দোয়ার। উভয়ের রন্ধনের প্রসঙ্গ কোথাও দেখি না, চঞ্চলকুমারী লড়াই করিতে ও নির্ম্মলকুমারী ঘোড়ায় চড়িতে খুব মজবুত। জেব্উন্নিসা ফুলের কুকুর গড়েন, আসব পান করেন ও সুখ লুঠেন। দরিয়া আতর-সুর্ম্মা বেচে, খবর বেচে, নাচে গায়, প্রয়োজন হইলে সওয়ার সাজে ও বন্দুক ছুড়ে। ভাগ্যে মাণিকলাল কন্যার জন্য রাঁধিতে শিখিয়াছিলেন, তাই নির্ম্মল তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষ সাজিয়া কোনও দিন ভাতে কাঠি দিল না, মাণিকলাল তাঁহার কেনা গোলাম হইল। ফলতঃ চঞ্চলকুমারী-নির্ম্মলকুমারীই বলুন, জেব্উন্নিসা-দরিয়াই বলুন, আর যোধপুরী-উদিপুরীই বলুন, সকলেই দেখি বিষম অগ্নিকাণ্ডের ভিতর আছেন, কেহ জ্বলিতেছেন, কেহ জ্বালিতেছেন, কেহ পুড়িতেছেন, কেহ পোড়াইতেছেন, কিন্তু কোথাও রন্ধনের কোনও উদ্‌যোগ দেখি না। ইতর পাত্রীগণের মধ্যে পাণওয়ালীকেও রাঁধিতে দেখি না, সে চিত্র-শোভিত দীপালোকিত দোকানঘরে কোমল গালিচায় বসিয়া মিঠে খিলির

সঙ্গে মিঠে কথা বেচে।' বাস্তবিক পাণওয়ালীরা কখন্ রাঁধে কখন্ খায়, ইহা হালের কলিকাতায় ও একটা (mystery) প্রহেলিকা। দেখিতেছি সেকালেও তাই ছিল। তস্বীরওয়ালী কাবাব রাঁধে উত্তম," খিজির শেখের বাপের সংসারে সুখ ছিল; তবে বেশী দিন সহিল না। তাহার কিস্মৎ খারাপ।

'যুগলাঙ্গুরীয়'—ত মূর্তিমান্ ফলিত-জ্যোতিষ। ইহা হইতে কাব্যরস বা খাদ্যরস আশা করা যায় না।

'রাধারাণী'। রাধারাণীর সঙ্গে আমাদের যখন প্রথম পরিচয়, তখন তাহার বয়স একাদশ পূর্ণ হয় নাই। সেও অবশ্য কাব্যের নায়িকাদের মত মালা গাঁথে, কিন্তু তাহা রজনীর ন্যায় পেটের দায়ে, বিক্রয়ের জন্য। সেই বয়সেই সে মা-কে পথ্য রাঁধিয়া দেয়। এমন গুণবতী কন্যার যে ভাল ঘর-বর হইবে ইহা ত স্বতঃসিদ্ধ। তবে সেই রাতেই যদি নিমন্ত্রণ করিয়া রুক্মিণীকুমারকে রাঁধিয়া বাড়িয়া খাওয়াইত তাহা হইলে মিলনে এত বিলম্ব হইত না। যখন রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ আপনি আসিয়া ধরা দিলেন, তখন রাধারাণী 'স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে ভোজন করাইলেন।' ধনবতী হইয়াও তিনি শৈশবে অভ্যস্ত রন্ধনবিদ্যাটা ভুলেন নাই ভরসা করা যায়; অতএব অন্নব্যঞ্জন যে তাঁহার স্বহস্ত-প্রস্তুত এরূপ অনুমান বোধ করি অসঙ্গত হইবে না।

'ইন্দিরা'। রমণবাবুর রমণী সুভাষিণীর কথায় জানিতে পাই:—'আমাদের বাড়ীতে আমরা সকলেই রাঁধি তবে কলিকাতার রেওয়াজমত একটা পাচিকাও আছে'। এখন সহজেই বুঝিলাম কেন রমণ বাবু সুভাষিণীর আজ্ঞাকারী, কেনই বা খোদ-কর্ত্তা রামরাম দত্ত 'কালীর বোতল'টার বশ। তবে সোণার মার রান্নায় কোনও ফল দর্শায় নাই; তাহার কবুল জবাব সে নিজেই করিয়াছে, "এখনকার

দিয়ে রাঁধিতে গেলে রূপযৌবন চাই।" আর ইন্দিরা? সে ত রন্ধনের গুণে হারাধন ফিরিয়া পাইল। তবে কাঁচা বয়েস বলিয়া একটু বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলিয়াছিল। কাব্যের নায়িকার মত, প্রয়োজন হইলে, সেও মল্লিকাফুলের চেয়ে সুন্দর অঙ্গে মল্লিকাফুলের অলঙ্কার পরিয়া প্রিয়জনের কাছে যায়। কবির কথায় 'রাঁধ বেশ, বাঁধ কেশ, বকুল ফুলের মালা; রাঙ্গাশাড়ী হাতে হাঁড়ী রাঁধে কায়েতের বালা।'

'আনন্দমঠ'। নিমাই রাঁধে বাড়ে, কাযেই দুটিতে সুখে থাকে, এমন লক্ষ্মীর সংসারে অকালের বৎসরেও মন্বন্তর থাকে না। 'নিমি পিঁড়ি পাতিয়া জলছড়া দিয়া জায়গা মুছিয়া মল্লিকাফুলের মত পরিষ্কার অন্ন, কাঁচা কলাইএর দাল, জঙ্গুলে ডুমুরের ডালনা, পুকুরের রুইমাছের অম্বল এবং দুগ্ধ আনিয়া জীবানন্দকে খাইতে দিল।' বলা বাহুল্য, এ সমস্তই তাহার স্বহস্তপ্রস্তুত। তাহার এই ভ্রাতৃসেবা যেন হিন্দুগৃহের ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার উজ্জ্বল চিত্র। আহা! জীবানন্দ তুমিই ধন্য! শ্রী ও প্রফুল্লের প্রথম খসড়া শান্তি, মুগ্ধবোধ পড়িয়া, ব্যায়াম শিখিয়া, এক কিম্ভুতকিমাকার পদার্থ হইয়াছিল। নতুবা সে যদি ননদ নিমাইএর মত স্বহস্তপ্রস্তুত অন্নব্যঞ্জন বাড়িয়া আনিয়া জীবানন্দের সম্মুখে ধরিত, তাহা হইলে কি আর তাহার শিকলি কাটিয়া পাখী পালায়, না নিমাইএর ঘটকালি নিষ্ফল হয়? বিশেষ জীবানন্দ ঠাকুরের যেরূপ ভোজনে অনুরাগ। কল্যাণী পুনর্জীবনলাভের পর যদি গীতাপাঠ না করিয়া গৌরীদেবীর কাছ হইতে হাঁড়ী-বেড়ী কাড়িয়া লইয়া একবার রন্ধনে মন দিত, তাহা হইলে ভবানন্দ ঠাকুরের জীবন্তে সমাধি হইত। গৌরীদেবীর অবস্থা সোণার মার মত, ভাগ্যে রূপযৌবন নাই, সেই রক্ষা। কল্যাণী আনন্দমঠে আশ্রয় পাইলে স্বামীকে রাঁধিয়া খাওয়াইতে পারে নাই, বনফলে সারিয়াছিল, তাহারই কি প্রায়শ্চিত্ত বিষভোজন?

'সীতারাম'। তপ্তকাঞ্চনশ্যামাঙ্গী নন্দাই বলুন আর হিমরশ্মি-প্রতিফলিত-কৌমুদীরূপিণী রমাই বলুন—দুজনেই পটের বিবি।' কাযের মধ্যে পাশা খেলেন আর রাণীগিরির আখ্‌ড়াই দেন। রমার আবার একগুণ বেশী, ঘ্যান্ ঘ্যান্ প্যান্ প্যান্ করেন, আর দলনীর মত সহোদর ভাইয়ের অভাবে সতীনের ভাইয়ের সঙ্গে সলা-পরামর্শ করিয়া দুধের তৃষ্ণা ঘোলে মিটান। নন্দাকে লক্ষ্মীর ন্যায় স্বামিনারায়ণের পদসেবা করিতে দেখিয়াছি, কিন্তু নাম-হিসাবে সেটা রমারই কর্ত্তব্য। জয়ন্তীর শিষ্যা শ্রী—গীতা আওড়াইতে মজবুত; যখন স্বামিকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়াছিল তখন 'পরিপাটী করিয়া রন্ধন করিয়া নদীর জলে ভাসাইয়া দিয়া মনে করিত, স্বামীকে খাইতে দিলাম'; কিন্তু স্বামীর কাছে আসিয়া সে বিদ্যার কোন পরিচয় দিল না। সে যদি প্রফুল্লর মত রাঁধিতে পারিত, তবে কি আর অত বড় রাজ্যটা ছারেখারে যায়! 'যে রাজার রন্ধনপটু গৃহিণী নাই তাঁহার অধঃপতন সুনিশ্চিত,'—গ্রন্থের এই শিক্ষা। ঐতিহাসিক মৈত্রেয় মহাশয় বা নিখিল বাবু এ তত্ত্বটা বুঝিয়াছেন কি? গ্রন্থকার 'দেবী চৌধুরাণী'তে অন্বয়মুখে এই তত্ত্বটা সপ্রমাণ করিয়া 'সীতারামে' ব্যতিরেকমুখে সপ্রমাণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

'দেবী চৌধুরাণী'। হরবল্লভ রায়ের গৃহিণী ঠাকুরাণী রাঁধেন না বটে, তবে নারীধর্ম্মপালনার্থ 'ব্যজনহস্তে স্বামীর ভোজন-পাত্রের নিকট শোভমানা—ভাতে মাছি নাই—তবু নারীধর্ম্মের পালনার্থ মাছি তাড়াইতে হইবে।' অর্থাৎ তিনি ছাইতে জানেন না, তবে গোড় চেনেন। এই সম্বন্ধে গ্রন্থকারের উচ্ছ্বাস বড় পাকা কথা। "হায়! কোন্ পাপিষ্ঠ নরাধমেরা এ পরম রমণীয় ধর্ম্ম লোপ করিতেছে? গৃহিণীর পাঁচজন দাসী আছে—কিন্তু স্বামি-সেবা—আর কার সাধ্য করিতে আসে! যে পাপিষ্ঠেরা এ ধর্ম্মের লোপ

কাঁপিতেছে হে আকাশ! তাহাদের মাথার জন্য কি তোমার বজ্র নাই?" শনৈঃ পন্থাঃ; এ পুরুষে এই পর্য্যন্ত দেখিলেন, আর এক পুরুষ পরে দেখিবেন, কতদূর উন্নতি হইয়াছে; ইহাই হইল কাব্যে অভিব্যক্তিবাদের দৃষ্টান্ত। ব্রহ্মঠাকুরাণী রন্ধন করেন, জীবদ্দশায় ঠাকুরদাদা মহাশয় কত আদর করিতেন তাহা ত জানিয়াছেন—'তোর ঠাকুরদাদা এমন বারো মাস ত্রিশ দিন আমায় তাড়িয়ে দিয়েছে, আবার তখনই ডেকেছে।' তা ডাক্‌বে না? রান্নার কথা মনে পড়্‌লেই যে কান্না পেত! তবে সময়বিশেষে ব্রজেশ্বরের মুখে ভাল লাগে নাই; তা' অমন হয়। আমরা সকলেই এক এক ব্রজেশ্বর, গৃহিণী পিত্রালয়ে গেলে অমন দশা সকলেরই হয়, 'গরুগুলার দুধ পর্য্যন্ত বিগ্‌ড়ে যায়।'

কুলমণি হীরার যুড়ি, তবে তাহা অপেক্ষা কিছু বেশী দিলদরিয়া। (সে-ই বরঞ্চ 'বিষবৃক্ষে'র মালতীর 'গঙ্গাজল' হইবার যোগ্য।) তাহার ভগিনী অলকমণি ত ঢাকের বাঁয়া। নয়ান বৌএর যে রূপ, রাঁধিয়া কি করিবে? সোণার মার সেই কথাটা মনে আছে ত? সাগরের দৌড় পাণ সাজা পর্য্যন্ত, আর রান্না 'ধূলা চড়্‌চড়ি, কাদার সুক্ত, ইটের ঘণ্ট,' তা'র ভালবাসা তা'র ঘরকন্না রান্নাবান্না সবই যে ছেলেখেলা। জয়ন্তীর আদিম সংস্করণ নিশি ঠাকুরাণীর হস্ত শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত, কাযেই তাহা হরবল্লভ রায়ের জন্য 'ক্ষীর ছানা মাখন' প্রভৃতি বালগোপালের ভোগ সাজাইতে পারে, রাঁধিতে পারে না, সুতরাং তাহার শ্বাশুড়ীগিরির আখ্‌ড়াই দেওয়াই সার হইল। আর দিবা—তিনি ত কেবল নিশির সানাইএর পোঁ ধরেন।

তাহার পর—প্রফুল্ল। এই প্রফুল্ল-ব্রজেশ্বরই আদর্শ-দম্পতী ব্রজেশ্বরের ন্যায় এ অধম লেখকও স্বভাবকুলীন, পক্ষপাতটা স্বাভাবিক

ব্রজেশ্বরের ন্যায়, লেখকের তিন পক্ষ না হইলেও পূর্ব্বপুরুষদিগের মধ্যে দৃষ্টান্তের অভাব নাই। পক্ষপাতের আরও একটু কারণ আছে। দক্ষিণ বঙ্গের ত্রিস্রোতা পবিত্রসলিলা হইলেও উত্তর বঙ্গের ত্রিস্রোতা লেখকের প্রিয়তর; কারণ ব্রজেশ্বরের ন্যায় লেখকেরও রঙ্গপুরের প্রতি প্রাণের টান আছে। যাক্ বর্ত্তমান লেখকের ব্যক্তিগত পক্ষপাতের কথা ছাড়িয়া দিলেও, প্রফুল্লই যে গ্রন্থকারের আদর্শপত্নী তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রফুল্ল স্বামিগৃহে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীর মত ভুল করিল না। তা'র রান্নার সুখ্যাতি এমনি যে তাহাতে স্বামী ত স্বামী, শ্বশুর শাশুড়ী ও পরিজনবর্গ, এমন কি সপত্নীরা পর্য্যন্ত, সকলেই বশ। 'যে দিন প্রফুল্ল দুই একখানা না রাঁধিত, সে দিন কাহারও অন্নব্যঞ্জন ভাল লাগিত না।' প্রফুল্ল কি বলিতেছেন শুনুন—'এই ধর্ম্মই স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম।' ব্রজেশ্বরের মাতা গোবিন্দলালের মাতার মত নহেন, তিনি গিন্নীপনা জানেন, তাঁহার সোণার সংসার হইল।

আর একটি রহস্য দেখিবেন। রন্ধনের উদ্যোগেই গ্রন্থখানির আরম্ভ; উপকরণের অভাবে রন্ধন তখন বন্ধ ছিল। আবার রন্ধনের সম্পাদনেই শেষ। প্রথম পরিচ্ছেদেই the keynote is struck অর্থাৎ গ্রন্থকার সুরটা ভাঁজিয়া রাখিয়াছেন। এখন বোধ হয় কাহারও বুঝিতে বাকী থাকিল না যে, এই 'নারীধর্ম্ম'ই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। শেষবয়সে বঙ্কিমচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন, পত্নীর রন্ধনপটুতার উপর কতটা নির্ভর করে; তখন যে খাওয়া দাওয়ায় একটু নিট্‌পিটে স্বভাব হয়।

ফলশ্রুতি।

ব্রতকথার ন্যায়, অর্দ্ধাঙ্গপুরাণোক্ত এই পত্নীতত্ত্ব যে গৃহে পঠিত হইবে, তথায় দোবে চোবে মিশির পাঁড়ে প্রভৃতি বিশ্রীনামধারী ও ততোধিক বিশ্রী আকৃতি-প্রকৃতিধারী বামুন ঠাকুরের স্থান শ্রীমতী সুমতি মধুমতীরা দখল করিবেন, অধিকারী চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি মেদিনীপুর-বাঁকুড়াবাসীর পরিবর্ত্তে আমাদের হৃদয়াধিকারিণীরা চক্রবর্ত্তিনী হইয়া বসিবেন; রন্ধনের গুণে দাম্পত্যবন্ধন দৃঢ় অথচ কোমল হইবে; শৌণ্ডিকালয়, গণিকালয় জনশূন্য হইবে, অস্বাস্থ্যকর খাবারের দোকান উঠিয়া যাইবে, মিউনিসিপালিটির সুতরাং আমাদের অন্তকার নিমন্ত্রণকর্ত্তার * জয়জয়কার। এই অপূর্ব্ব কথা পাঠ বা শ্রবণ করিলে, কুমারীরা রাধারাণীর মত ভাল বর-বর পাইবেন, সধবারা ইন্দিরার মত হারাধন পতিপ্রেম ফিরিয়া পাইবেন, সপত্নাবতীরা ললিতলবঙ্গলতা ও প্রফুল্লর মত সপত্নীযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া সুখে ঘরকন্না করিবেন, ঘরে ঘরে প্রফুল্ল ইন্দিরা ললিতলবঙ্গলতা কমলমণি সুভাষিণী রাধারাণীর মত গৃহিণীরা পতির অঁচলা অঙ্কলক্ষ্মী হইবেন—আর তাহার ফলে ব্রজেশ্বর উপেন্দ্রবাবু রামসদয় মিত্র শ্রীশবাবু রমণবাবু ও কুমার দেবেন্দ্রনারায়ণের মত পত্নীগতপ্রাণ পতি গৃহিণীর মনোরঞ্জন করিবেন; হিন্দুর ঘরে ঘরে আবার জীবন্ত লক্ষ্মী-নারায়ণ বিরাজ করিবেন। ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ।

পাণ *
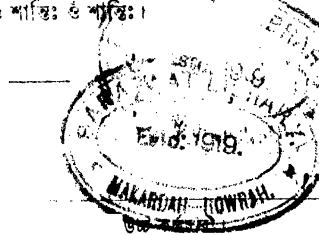
(মানসী, আশ্বিন ১৩১৭)

প্রত্নতত্ত্ব

পাণ কতকাল হইতে ভারতে আছে? এই আকস্মিক প্রশ্নের সমাধান করিতে হইলে প্রাচীন সভ্যতার জন্মভূমি গ্রীস্ দেশের ইতিহাস খুঁজিতে হয়। কেহ কেহ হয়ত সদম্ভে বলিবেন যে, প্রাচ্যজগতের ভারতবর্ষ, চীন, মিশর প্রভৃতি দেশই মানব-সভ্যতার আদি জন্মস্থান। কিন্তু এ অন্ধ বিশ্বাসের কোন ভিত্তি নাই। আর্য্যজাতির আদিবাস যে ইউরোপ-খণ্ডে, বল্‌টিক্ সাগরের তীরভূমিতে, বা ঐরূপ কোন একটা স্থানে ছিল, ইহা অভ্রান্ত সত্য। 'অন্যে পরে কা কথা,' ব্রাহ্মণকুলতিলক বালগঙ্গাধর তিলক মহাশয় পর্য্যন্ত ঐ দিকে ঢলিয়াছেন। সুতরাং সভ্যতার প্রথম বিকাশ যে প্রতীচীতে হইয়াছিল এই সারতত্ত্ব অনার্য্য ভিন্ন কেহই অস্বীকার করিবে না। এ অবস্থায় পাণের জন্মকথা আলোচনা করিতে হইলে প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্রস্থল গ্রীস্ দেশের ভাষা ও ইতিহাস অনু-সন্ধান করিয়া দেখিতে হয়, এ কথা কি আর বার বার বলিতে হইবে?

এই অনুসন্ধানকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ার পথে একটি সামান্য বাধা আছে,—

* কৈফিয়ত—আহারের পর মুখশুদ্ধির প্রয়োজন। 'পত্নীতত্ত্বে' ভোজন-ব্যাপারের যেরূপ ব্যবস্থা আছে তাহাতে উহার পর পাণ-পরিবেষণ প্রশস্ত। আর পত্নীতত্ত্বের পর প্রত্নতত্ত্বও অনুপ্রাস-হিসাবে প্রাসঙ্গিক; তাই প্রথমেই প্রত্নতত্ত্ব ধরিলাম।

লেখক গ্রীক্‌ভাষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। কিন্তু তত্ত্বানুসন্ধানের ক্ষেত্রে ইহাতে কড় আসিয়া যায় না। সকলেই জানেন, ভাষাতত্ত্ববিচারে ভাষায় অধিকারের আদৌ প্রয়োজন নাই! এ ক্ষেত্রে অভিধানই আমাদের পরম সহায়; শব্দচয়নকার্য্য অভিধানের সাহায্যে সহজে ও সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। মহাজনপ্রদর্শিত এই সুগম পন্থার অনুসরণ করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহা পাঠকসমাজকে উপহার দিতেছি।

গ্রীক্ ভাষায় প্যাণিক্ (panic) শব্দটি দেখা যায়। এই শব্দের অর্থ অকারণ আতঙ্ক। বৈষ্ণবধর্ম্মে যেমন অহেতুকী প্রীতি, তেমনই একটা অহেতুকী ভীতিও আছে। দিনমানের সমস্ত বিচিত্র কোলাহল স্তব্ধ হইলে 'অর্দ্ধরাত্রে শয্যাগৃহে' প্রদীপ নির্ব্বাণলাভ করিলে যখন সেই সূচিভেদ্য অন্ধকারে একমাত্র জ্ঞানচক্ষুঃ উন্মীলিত থাকে, তখন সকলেই এই অহেতুকী ভীতির সত্তা অনুভব করিয়াছেন। ইহাই গ্রীক্ ভাষায় প্যাণিক্। ভাষাকর্থায় ইহাকে 'ভূতের ভয়' কহে।

এক্ষণে, শব্দের অর্থবিচারে বৃথা বাগাড়ম্বর না করিয়া, প্রণিধান করিয়া দেখা যাউক, শব্দটি হইতে আমরা কি ঐতিহাসিক তথ্য লাভ করিতে পারি। বাস্তবিক, শব্দের অর্থ বুঝিবার চেষ্টায় অনর্থক সময়ক্ষেপ না করিয়া, একটিমাত্র শব্দ অবলম্বন করিয়া ভূরি ভূরি ঐতিহাসিক তথ্যের আবিষ্কার করাই (modern method) আধুনিক-প্রণালী-সম্মত গবেষণা।

কথায় বলে, ইতিহাস নিজেকে পুনরাবৃত্ত করে (history repeats itself)। এই গ্রীক্ প্যাণিক্ শব্দ হইতে বেশ বুঝা যায় যে আজকাল আমাদের মধ্যে যে পাণাতঙ্ক দেখা দিয়াছে, বহুকাল পূর্ব্বে এইরূপ একটা পাণাতঙ্ক গ্রীস্‌দেশে দেখা দিয়াছিল। তাহার ফলে প্যাণিক্ শব্দের উদ্ভব। খুব সম্ভব সেই সময় হইতেই প্রতীচীতে পাণ খাওয়ার আর

চলন নাই। আমরাও এই সুযোগে পাশ্চাত্য সুসভ্য জাতিগণের অনুসরণ করিতে পারিব না কি? কালক্রমে এই প্যানিক শব্দের অর্থের ব্যাপ্তি ঘটিয়া সকল প্রকার অমূলক আতঙ্ক বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়াছিল। অর্থের এরূপ পরিণতি ভাষাতত্ত্বে একটা মোটা কথা।

এইবারে কথাটা ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখা যাউক। গ্রীস্ দেশে পাণাতঙ্ক যখন ঘটিয়াছিল, তখন তথায় যে পাণ খাওয়ার প্রথার পূর্ব্বাবধি প্রচলন ছিল ইহা ত স্বতঃসিদ্ধ। Pantheon, pancratium, panathenaic প্রভৃতি গ্রীক্ শব্দেও একথার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, পাণ (গ্রীক্ উচ্চারণ প্যাণ) একটা উপসর্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। শরীরবিজ্ঞানের pancreatic juice এরও এই পাণ হইতে উদ্ভব; এই কারণেই পাকস্থালীতে ভুক্ত দ্রব্য সহজে জীর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে আহারান্তে পাণ চিবানর ব্যবস্থা, ইহাতে pancreatic juice অর্থাৎ পাণদ্বারা সৃষ্ট রস বহুল পরিমাণে নিঃসৃত হয়। *

কেহ কেহ বলিবেন, গ্রীক্দিগের মধ্যে Pan নামক এক অরণ্যচারী দেবযোনি ছিলেন, তাঁহারই নাম হইতে panic শব্দ নিষ্পন্ন। ইহাকেই বলে পুঁথিগত বিদ্যা! এই জন্যই 'অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী' একটা প্রবাদ আছে! এই পল্লবগ্রাহী পণ্ডিতগণ জানেন না যে উক্ত Pan দেব আদিতে পাণের অধিষ্ঠাতা দেব, এবং তাঁহার নিবাসারণ্য ব্যাঘ্রতরক্ষুসঙ্কুল কণ্টকারণ্য নহে, পানের বরজ। কল্পনাকুশল সৌন্দর্য্যপ্রিয় কবিত্বপ্রবণ গ্রীক্ জাতি প্রকৃতির প্রতি বৃক্ষে, প্রতি লতায়, প্রতি পুষ্পে দেবতার

* বিজ্ঞ ও বহুদর্শী ডাক্তার চুণী বাবু তাঁহার 'শারীরস্বাস্থ্যবিধানে' ইহা স্পষ্টবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন।—(দ্বিতীয় সংস্করণের টিপ্পনী।)

সম্বন্ধ দেখিতেন, তাঁহারা কবিত্বরসাভিষিক্ত প্রেমিক-প্রেমিকার রসালাপের নিত্যসহচর পানের বেলায় সে ভাবটি বিস্মৃত হইয়াছিলেন; ইহা কি সম্ভবপর? ক্রমে গ্রীক্ জাতির মন বিস্তারলাভ করিলে প্যাণ (রোমীয় ফণস্) এই পাণপত্র হইতে সমস্ত উদ্ভিদ্-প্রকৃতির দেবতা হইয়া পড়িলেন। পল্লবগ্রাহী পণ্ডিতগণ শুধু 'প্যাণ্ অরণ্যের দেবতা' এই শেষ কথাটাই জানেন!

এতক্ষণে সপ্রমাণ হইল পাণ 'কোথায় ছিল'; এক্ষণে ভারতবর্ষে 'কে আনিল এ মধুর পাণ' ইহার বিচার করিতে হইবে।

সকলেই জানেন, পুরাকালে ফিনীশীয় জাতির বাণিজ্যের বিলক্ষণ প্রসার ছিল। এই বণিগ্‌বৃত্তি জাতির নাম হইতেই সংস্কৃত বণিক্ (বণিজ্), আপণ, বিপণি, পণ, পণ্য প্রভৃতি বাণিজ্যব্যবসায়ের শব্দগুলির উদ্ভব! সংস্কৃতে এরূপ বিদেশজাত শব্দের অভাব নাই, ইহা বৈয়াকরণেরা স্বীকার করেন। উচ্চারণবৈষম্যে ফিনীক্ বণিক্ হইয়াছে! এই ফিনীশীয় জাতির নিকট হইতে গ্রীস্ ও ভারতবর্ষ বর্ণমালা, সংখ্যালিখন-প্রণালী প্রভৃতি গ্রহণ করিয়াছে, বড় বড় পণ্ডিতেরা ইহা বলিয়া গিয়াছেন। গ্রীস্ ও ভারতবর্ষ উভয় দেশের সঙ্গেই এই জাতির বাণিজ্যসম্বন্ধ ছিল। তাহা হইলেই দাঁড়াইতেছে, এই জাতি গ্রীস্ হইতে ভারতবর্ষে পাণের প্রথম আমদানী করেন! গ্রীসে পাণাতঙ্ক (panic) আরম্ভ হওয়াতে অন্যদেশে পাণ চালান দেওয়ার ব্যবস্থা হইবার সম্ভাবনা।

বেদে এই জাতি পণিনামে উল্লিখিত। আর্য্যেরা অল্পস্বর ভাল বাসিতেন, সেইজন্য ফিনীশ্যান্ বা পিউনিক্ (Punic) পণি হইয়াছে। এই পণি হইতেই পাণ! পরে যখন পৌরাণিক কালে বৈদিক কালের আচাররীতি সকলে ভুলিয়া গেল, তখন প্রকৃত ব্যুৎপত্তির স্মৃতিলোপ হইয়া পর্ণ হইতে পাণ এই নূতন ব্যুৎপত্তি দাঁড়াইল। অর্থাৎ খাঁটি

বিদেশী শব্দ পাণকে সংস্কৃত করিয়া পর্ণ শব্দের উদ্ভাবন করা হইল। (এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের গবেষণাত্মক প্রবন্ধগুলি দ্রষ্টব্য।) 'পুত্র' 'অসুর' প্রভৃতি শব্দের ব্যুৎপত্তির বেলায়ও এইরূপ ঘটিয়াছে। বিদেশ হইতে আনীত বলিয়া কপি-শালগমের ন্যায় পাণও অদ্যাপি অনেক শুদ্ধাচার ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারিণী বিধবা ব্যবহার করেন না। কিছুকাল বিদেশ হইতে আমদানী হওয়ার পর, উদ্যমশীল ব্যবসায়িগণ এদেশেই ইহার চাষ আরম্ভ করিলেন। অবশ্য প্রথম প্রথম বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল গঙ্গাতীরবর্ত্তী স্থানে ইহার চাষ হয়, সেইজন্য আজও নৈহাটী অঞ্চলে উৎকৃষ্ট পাণ জন্মে।

পাণব্যবসায়ীদিগকে বারুই বলে। অনুমান হয়, স্মরণাতীত কালে এক সম্প্রদায় লোক গ্রীস্ দেশের Pherae নামক স্থান হইতে আসিয়া পাণের ব্যবসায়সূত্রে ভারতবর্ষে চাষ আবাদ করে ও ক্রমে এদেশের বাসিন্দা হইয়া পড়ে। আজকাল ঠিক এইভাবেই অনেক হিন্দু ব্যবসায়ী আফ্রিকা ও আমেরিকায় বসবাস করিতেছে। স্বদেশের নামে এই জাতি 'বারুই' ও ইহাদের আবাদ 'বরজ' বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। হিন্দু-সমাজের স্বভাবসিদ্ধ সঙ্কীর্ণতার দোষে এই বিদেশ হইতে আগত জাতি, শাকলদ্বীপীয় ব্রাহ্মণদিগের ন্যায়, হিন্দুসমাজের সঙ্গে ভালরূপ মিশিতে পারে নাই!

পাণের আর এক নাম তাম্বূল, পাণব্যবসায়ী আর এক সম্প্রদায়ের নাম তাম্বূলী বা তামুলি। তাম্বূল (Stamboul) ইস্তাম্বুল হইতে আসিয়াছিল বলিয়া ইহার এইরূপ নামকরণ হয়, অথবা প্রাচীন তাম্রলিপ্তি বর্ত্তমান তমলুকে ইহার প্রথম আবাদ হয়, অথবা দাক্ষিণাত্যের তামিল জাতির সঙ্গে ইহার কোন সংস্রব আছে, এই জটিল প্রশ্নসম্বন্ধে (সময়াভাবে) কোনও স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি নাই। অনুমান হয় প্রথমটিই সত্য, কেননা ইস্তাম্বুলবাসীরা চিরদিনই সৌখীন।

এই অনুমান সত্য হইলে, বাজারে যাহা ছাঁচি পাণ বলিয়া বিক্রীত হয় তাহাই বোধ হয় ইস্তাম্বুলের আমদানী। মুসলমান ভ্রাতারা কথাটা সমজাইবেন। একই জিনিশের একই দেশে ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে ভিন্ন ভিন্ন কালে আমদানী হওয়া মানবেতিহাসে বিচিত্র ঘটনা নহে। ইংলণ্ডে তথা ভারতবর্ষে খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মের আমদানী, ইংরেজী ভাষায় ল্যাটিন্ শব্দের আমদানী ইত্যাদি ঐতিহাসিক উদাহরণের অভাব নাই

ভাষাতত্ত্ব

আপাততঃ ভাষাতত্ত্ববিচারের একটু প্রয়োজন আছে। 'পাণ' শব্দের বাণান লইয়া কিঞ্চিৎ গোলযোগের সম্ভাবনা। কেহ কেহ এ শব্দটিতে দন্ত্য 'ন' চালাইতে চাহেন। তাঁহারা বোধ হয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যেহেতু জল খাইলেই পাণ খাইতে হয়, অতএব 'পান' শব্দের লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা তাম্বূল অর্থ দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু আমি পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, বেদের 'পণি' শব্দ হইতে 'পাণ' শব্দ সিদ্ধ! অতএব মূর্দ্ধন্য 'ণ' এস্থলে অপরিহার্য্য। বৈদিকভাষা ছাড়িয়া দিলেও লৌকিক ব্যাকরণের মতেও 'পর্ণ' শব্দের অপভ্রংশ পাণ, যেমন চূর্ণ=চূণ, স্বর্ণ=সোণা, কর্ণ=কাণ, বর্ণন=বাণান। [পাণ সকল পর্ণ বা পাতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ; সুতরাং ইহা একাই নামটি দখল করিয়া লইয়াছে। যেমন সম্বন্ধের মধ্যে যাঁহার সহিত সকলের অপেক্ষা অন্তরঙ্গ সম্পর্ক, তিনিই সম্বন্ধী par excellence হইয়া দাঁড়াইয়াছেন! রঘুবংশের সিংহ এই জন্যই 'সম্বন্ধিনো মে প্রণয়ম্' বলিয়া শ্রেষ্ঠ প্রণয়ের দোহাই দিয়াছেন ইতি সুধীভির্বিভাব্যম্!]

অতএব দেখা গেল, এ হিসাবেও মূর্দ্ধন্য 'ণ' সঙ্গত প্রয়োগ। তবে হয় ত কেহ ব্যাকরণের সূত্র তুলিয়া তর্ক করিবেন যে, অপভ্রংশে যখন রেফের অভাব ঘটিয়াছে তখন ণত্ববিধানের আর অবসর নাই। কারণ

'নিমিত্তস্তাপায়ে নৈমিত্তিকস্তাপ্যপায়ো ভবতি।' কিন্তু ইহা বিজ্ঞানসম্মত কথা নহে। পূর্ব্বে যেস্থান দ্বীপ ছিল তাহার দ্বীপত্ব লোপ পাইলেও দ্বীপনামের লোপ হয় না—যথা নবদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ। তালগাছের ধ্বংসাভাব ঘটিলেও তালপুকুর তালপুকুরই থাকে। মনোবিজ্ঞান ও শরীর-বিজ্ঞানে বলে, কোনও অঙ্গের অভাব হইলেও সে অঙ্গের অনুভূতির অভাব ঘটে না। 'মাথা নাই তা'র মাথাব্যথা' বৈজ্ঞানিক সত্য। মনোবিজ্ঞানের গ্রন্থে পড়িয়াছি, একজন সৈনিকের পায়ের বুড়া আঙ্গুল কাটিয়া ফেলিতে হইয়াছিল, কিন্তু তথাপি ঐ অঙ্গে কণ্ডূয়নপ্রবৃত্তি মধ্যে মধ্যে বিলক্ষণ সজাগ হইত। জীবিত ভাষারও, জীবিত দেহের ন্যায় স্নায়ু-মণ্ডলী আছে, অঙ্গচ্ছেদ হইলেও স্নায়ুর কার্য্য চলিতে থাকে। অতএব রেফের অভাব হইলেই যে শব্দের ণত্ব লোপ পাইবে ইহা সঙ্গত যুক্তি নহে। বরং এরূপ বর্ণবিন্যাসে ব্যুৎপত্তিজ্ঞানের সহায়তা করে। 'পান' ও 'পাণ' উভয়ের প্রভেদের জন্যও ইহার প্রয়োজন।

বিজ্ঞান

এক্ষণে ব্যাকরণের কচ্‌কচি ছাড়িয়া এই দেশব্যাপী আতঙ্কের নিদান-নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হওয়া যাক্। পাণে কিরূপে ও কেন পোকা ধরিল? কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরার কথা জানা আছে। 'কদ্দু কুম্‌ড়ো ছেড়ে আল্লা সর্‌ষির মধ্যি তেল,' মাণিকপীরের গানে একথাও শুনিয়াছি। কিন্তু এ যে তাহা অপেক্ষাও বিস্ময়কর। 'কৈভবাটী' অর্থাৎ কুম্‌ড়া মূলা বেগুনে পোকা হইলে ত কোন ক্ষতি ছিল না, মিউনিসিপ্যাল মার্কেট হইতে মটন্ আনিয়া খাইলেই চলিত। বাল্যকালে একবার মাছে পোকা হইয়াছিল অল্প অল্প মনে পড়ে; কিন্তু সে সময়ে কেহ বা চাতুর্ম্মাস্য করিয়াছিলেন, কেহ বা অতি সুবিবেচনার সহিত মৎস্য ত্যাগ করিয়া অনুকল্পে মাংস-

ভোজন করিয়া 'কথমপি পরিত্যাগদুঃখং বিষেহে।' রঙ্গপুর অঞ্চলে পাকা আমে পোকা দেখা যায়। কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না, কেননা সে দেশে অজস্র কাঁঠাল মেলে। কিন্তু পাণে পোকা, এ যে অসহ্য অকথ্য অবাঙ্মনসগোচর! যাক্ বৈজ্ঞানিক-তত্ত্ব-নির্ণয়ক্ষেত্রে মিছামিছি প্রলাপ-বাক্য-প্রয়োগে কোন ফল নাই।

কোন কোন বৈজ্ঞানিক বলেন, হেলির ধূমকেতু যখন পৃথিবীর সহিত সঙ্ঘর্ষে আসে তখন অজস্র উল্কাবৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু সেই উল্কাপিণ্ডের ধ্বংসাবশেষ তাঁহারা বহু অনুসন্ধানেও জলে স্থলে অন্তরীক্ষে কোথাও পান নাই। এমন কি সম্ভব নহে যে, ঐ উল্কাসমূহের সূক্ষ্ম অণুগুলি পাণের বরজে পতিত হইয়াছিল এবং ভাদ্রমাসের প্রচণ্ড রৌদ্রে ডিম্বাকৃতি অণু-গুলি ফুটিয়া কীট-আকারে দেখা দিয়াছে? একজন সংবাদপত্রের পত্র-প্রেরক নীল পীত হরিদ্রা প্রভৃতি নানানবর্ণী পোকা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। 'ইন্দ্রধনু চূর্ণ হ'য়ে' এরূপ বর্ণ-বৈচিত্র্য ঘটাইয়াছে কিনা কে জানে? যাঁহারা আকাশতত্ত্বে অভিজ্ঞ তাঁহারা এই সকল (hypothesis) অনুমানের সত্যতাসম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিতে পারেন। পক্ষান্তরে এরূপও হইতে পারে যে ভারতবর্ষের বাহিরে, নীলনদের তীরে বা দক্ষিণ আমেরিকার অরণ্যপ্রদেশে, এমন কোন ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে যাহার দরুণ এই অত্যাহিত। কেননা সম্প্রতি একজন বৈজ্ঞানিক বহু গবেষণায় ও বিস্তর নূতন উদ্ভাবিত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টির প্রাকৃতিক কারণ দক্ষিণ আমেরিকার অরণ্যপ্রদেশে নিহিত রহিয়াছে। 'অপরং কিং ভবিষ্যতি?'

পাণের পোকার নিদাননির্ণয় একটু সময়সাপেক্ষ। কিন্তু ইহার মধ্যেই রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর সংবাদপত্রে ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন যে পাণে তিনি অণুবীক্ষণযোগেও কোন পোকা দেখিতে পান নাই :—

যদিও অনেকে শাদা চোখেই দেখিতে পাইতেছেন ও বৈজ্ঞানিক-প্রবর গ্যালিলিওর স্বরে বলিতেছেন "Still it moves"! রায় বাহাদুরের এই অভয়বাণী যদি সত্য হয়, তবে বলি চূণী বাবুর মুখে ফুলচন্দন—শ্রীবিষ্ণুঃ—পাণসুপারি পড়ুক্। তিনি আতঙ্কনিগ্রহ করিয়া হিন্দুসমাজের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। এক্ষণে মুসলমানসমাজ হইতে কোন খয়েরখাঁ হকিম মুস্কিল-আসান করিলেই সোণায় সোহাগা হয় অর্থাৎ পাণে চূণখয়ের সমান হয়, এবং বাঙ্গালা মায়ের উভয় সন্তান মায়ের দুই গালের চর্ব্বিত পাণ খাইয়া ধন্য হয়। [শেষ কথাটিতে কেহ হিন্দু-মুসলমানের ভ্রাতৃভাবের আভাস পাইয়া আঁতকাইয়া উঠিবেন না ত ?]

সমাজ ও সাহিত্য

যাহা হউক, এই হুজুগ বেশিদিন থাকিলে বাঙ্গালীর ধর্ম্মকর্ম্ম, বাঙ্গালীর সামাজিক জীবন, বাঙ্গালীর কাব্যসাহিত্য, সব রসাতলে যাইবে, বাঙ্গালীর উন্নতিবৃক্ষে পোকা ধরিবে। এই হুজুগ চলিলে, বাঙ্গালীর আসরে আর ঘন ঘন তামাক-পাণ ও পরনিন্দার অনুপান চলিবে না, বাঙ্গালী গৃহিণী আর স্বামিবশীকরণের অভিপ্রায়ে পাণের সঙ্গে শিকড় খাওয়াইতে পারিবে না, বাঙ্গালী বীর আর পাণের থেকে চূণ খসিলে অন্দরের সমরাঙ্গণে কুরুক্ষেত্র-কাণ্ড বাধাইতে পারিবে না, বিবাহের স্ত্রী-আচারে আর হাঁইআমলা বাঁটিয়া বাঙ্গালী বরের দুই গালে পাণ দিয়া মার্কা মারা চলিবে না, শুভদৃষ্টিকালে আর কনের শরমমাখা ঢল্‌ঢলে মুখখানি পাণ দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া চলিবে না, বাঙ্গালীর ঘরের কচি মেয়ে আর 'পাণ, পাণ, পাণ, কোথাও না যান,' বলিয়া সাঁজপূজনী ও যাচাপাণের ব্রত করিবে না, আর পাণ দিয়া ঠাকুরাণীবরণ হইবে না, পাণের পাট উঠিয়া যাওয়ায় ৺সত্যনারায়ণের পূজাপাঠ চলিবে না, কবিরাজ

মহাশয় আর পাণের সত্তের অনুপান দিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন না, ব্রাহ্মণভোজনের রজতখণ্ড দক্ষিণার সঙ্গে আর পাণ দেখা দিবে না, খেম্‌টার আসরে আর পাণ দিয়া খেম্‌টাওয়ালীর বরণ হইবে না, চাপ্‌রাশী সাহেবের আর 'পাণ খা'বার জন্য' শিকি বক্‌শীশ মিলিবে না।

তাহার পর কাব্যসাহিত্যের কথা। কাব্যের দিক্ হইতে দেখিতে গেলে আপাততঃ মনে হয় বটে, পাণে পোকা হইয়া ভালই হইল, কবিদের একটা নূতন উপমা যুটিল। এতদিন সেই মামুলি ব্যবস্থা ছিল :—চন্দ্রে কলঙ্ক, বসন্তবায়ুতে গরল, কুসুমে কণ্টক, যুবতীর মুখে ব্রণ, রমণীহৃদয়ে কপটতা, ইলিশমাছে কাঁটা—এখন হইল পাণে পোকা, অর্থাৎ জগতে কিছুই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নহে। কিন্তু এই নূতন উপমা আপাতমনোরম পরিণামবিষম। আমি দিবাচক্ষে দেখিতে পাইতেছি, তাম্বূলরসের অভাবে অচিরে বাঙ্গালীর জীবনে ও বাঙ্গালীর সাহিত্যে কাব্যরসের নিদারুণ অভাব ঘটিবে। সাহিত্যপরিষদের বিজ্ঞানপিপাসু সম্পাদক ও সভ্যগণ একবার এ সর্ব্বনাশের কথাটা ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি ?

প্রথমেই দেখুন, কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় যে ডানাঝরা পরীরা 'মিঠাপাণের খিলির সঙ্গে মিঠা কথা' বেচিত তাহারা দুর্লভদর্শন হইল। হায়! আর আমরা সেই 'কাব্যের উপেক্ষিতা' তাম্বূলকরঙ্কবাহিনী পত্রলেখার সুলভ সংস্করণগুলিকে দেখিতে পাইব না; স্ত্রীস্বাধীনতার সেই জলন্ত চিত্রগুলি না দেখিতে পাইয়া সমাজসংস্কার ও ধর্ম্মসংস্কারে আর আমাদের তাদৃশ নিঃস্বার্থ অনুরাগ ও উৎসাহ জন্মিবে না; (aesthetic culture) সৌন্দর্য্যচর্চ্চার এমন সুগম পন্থাঃ, এমন সুলভ সহায়, আর থাকিবে না। হায়! 'ইংলিশ্‌ম্যান' তথা 'প্রবাসী' পত্রের প্রচণ্ড আন্দোলনে যে ফল ফলিল না, সামান্য একটি পোকায় সে বিভ্রাট্ ঘটাইল!

'অথবা মৃদু বস্তু হিংসিতুং
মৃদুনৈবারভতে প্রজান্তকঃ।'

পাণওয়ালীদের সংহারের জন্য ইংলিশ্‌ম্যানের অশনি ও প্রবাসীর কষাঘাত কাযে লাগিল না, ক্ষুদ্র একটি কীটে প্রমাদ ঘটাইল। হায়! এ যে ক্লিওপেট্রার অপেক্ষাও সাঙ্ঘাতিক অবস্থা!

শুধু ইহাই নহে।* আর দুরন্ত শিশুকে 'ঘুমপাড়ানিয়া মাসি-পিসি' 'বাটা ভরা পাণ গাল ভ'রে' খাইবার লোভে ঘুম পাড়াইতে আসিবে না,—সুতরাং নবীনা জননীদিগের কাব্যচর্চ্চার তথা প্রণয়চর্চ্চার অবসর হইবে না ('খোকা যে ঘুমায় না')। ইংরেজীনবীশ কবি আর বাঙ্গালীর মেয়ের রূপবর্ণনায় 'তাম্বূলে তামাকুরস রাঙ্গা রাঙ্গা ঠোঁট' পাঠকের সমক্ষে ধরিয়া আসর জমাইতে পারিবেন না। ভাবুক কবি আর "পাণ কিন্‌লাম চূণ কিন্‌লাম ননদভাজে খেলাম। একটি পাণ হারা'ল দাদাকে ব'লে দিলাম।" ইত্যাকার মেয়েলী ছড়ার কবিত্ববিশ্লেষণ করিতে পারিবেন না। রসিক সমালোচক আর 'বঁধু একটা পাণ খেয়ে যাও' গানের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা শুনাইয়া ভক্তহৃদয় পুলকিত করিতে পারিবেন না। ললিত আর তেমন করিয়া লীলাবতীর চিবুক ধরিয়া—"লীলাবতী ক'রেছ কি হেরে হাসি পায়। রক্তগঙ্গাতরঙ্গিণী চিবুক তোমার।"—বলিয়া আদর করিবে না। আর আমরা বিলাসভবনে সে পাণের সঙ্গে প্রাণের বিনিময় দেখিতে পাইব না। নবীন-নবীনার দাম্পত্যলীলায় সে কাড়া-কাড়ি ছোড়াছুড়ি, সে মিঠাখিলির grapeshot, সে পাণের দোনার

---

* এই সঙ্গে আমার ছাত্রপ্রতিম শ্রীমান্ বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ কর্ত্তৃক বিবৃত 'পাণ-প্রসঙ্গ' (ভারতবর্ষ, শ্রাবণ ১৩২৬) পাঠ করিলে পাঠকবর্গ আরও অনেক নূতন কথা পাইবেন।—(তৃতীয় সংস্করণের টিপ্পনী।)

হরির লুঠ, সে 'রাধাধরসুধাপান', সে 'দেবাসুরে সদা দ্বন্দ্ব সুধার লাগিয়া', আর দেখিতে পাইব না। কলেজের ফেরতা ঘরে আসিয়া আর তেমন করিয়া পাণের বাটা সাম্নে লইয়া চুণখয়েরে রঞ্জিতাঙ্গুলি তাম্বূলরসে রঞ্জিতাধরা 'ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলা' কুট্টিমাসীনা স্রস্তবসনা মনোহারিণী নারীমূর্ত্তি দেখিতে পাইব না—

(পতন ও মূর্চ্ছা)

পটক্ষেপণ।

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক।

পাগলা ঝোরা *	১।০
কাব্যসুধা (ননদ-ভাজ, শাশুড়ী-বৌ ইত্যাদি) ...	১৲
কপালকুণ্ডলা-তত্ত্ব (২য় সংস্করণ) ...	॥০
অনুপ্রাস (চারিবর্ণে মুদ্রিত হর-গৌরীর চিত্র-সমেত) ...	॥০
ককারের অহঙ্কার ...	।/০
ব্যাকরণ-বিভীষিকা (২য় সংস্করণ) ...	।৵০
বাণান-সমস্যা	৶০
সাধুভাষা বনাম চলিতভাষা	৵০
ছড়া ও গল্প (৪র্থ সংস্করণ) শিশুপাঠ্য ...	।৵০
আহ্লাদে আটখানা (২য় সংস্করণ) ...	।৵০

* আকারে পরিবর্দ্ধিত 'ফোয়ারা' অপেক্ষাও বড়। তামাকুতত্ত্ব, শ্যামের বাঁশী, বিবাহে বিবিধ বাধা, বিষবৃক্ষের উপবৃক্ষ, বঙ্কিম-চর্চ্চরী, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য, ভর্ত্তার উত্তর (বিখ্যাত 'স্ত্রীর পত্রে'র জবাব), ধর্ম্মে মতি, কাশীবাস, প্রভৃতি আঠারোটি প্রবন্ধ আছে। কয়েকটি পূর্ব্বে আমোদর শর্ম্মার বেনামীতে ছিল। ইহা 'ফোয়ারা'র ন্যায়ই হাস্যরসের ফোয়ারা; কেবল শেষ তিনটি প্রবন্ধে করুণরসের সমাবেশ।

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্
৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।